মন্দিরময় ভারত

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

অপূর্ব্বরত্ন ভাদুড়ী

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : কার্তিক ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

মূল্য : ছয় টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস : ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

শ্রীশ্রীকালীপূজা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

অপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

নিবেদন

দেশের ও জাতির সভ্যতার মাপকাঠি, তার স্থাপত্য, তার ভাস্কর্য, তার চিত্রশিল্প—তার মূর্ত বিকাশ, পরিচায়ক তার অগ্রগতির, তার সাফল্যের, তার শ্রেষ্টত্বেরও। বর্ধিত হয় দেশের ও জাতির সভ্যতা, বাড়ে সংস্কৃতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, উন্নততর হয় তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্প, লাভ করে সুন্দরতর রূপ।

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ভারত যুগে যুগে, পরিণত হয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম রূপ পরিগ্রহ করে তার স্থাপত্য, তার ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্প, হয় বিশ্বজিৎ।

বিভক্ত বৈদিক ঋষিদের রচিত শিল্প শাস্ত্রে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তিনটি ভাগে—নাগর, দ্রাবিড় ও বেসরে। তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন মনীষী ফারগুসানও ভারতের স্থাপত্যকে—ইণ্ডো-এরিয়ান বা আর্যাবর্ত, চালুক্যিয়ান ও ড্র্যাভেডিয়ানে।

ছড়িয়ে আছে নাগর স্থাপত্য আর ভাস্কর্য ভারতের তিন চতুর্থাংশ ভূভাগে, বুকে নিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, বিস্তৃত হয়ে আছে পাঞ্জাবে, মালবে, রাজস্থানে, পশ্চিম ভারতে—সৌরাষ্ট্রে, গঙ্গার উপত্যকায়, মধ্যপ্রদেশে—খাজুরাহতে, কলিঙ্গে—ভুবনেশ্বরে, পুরীতে, কোণারকে, বাংলায়—বিষ্ণুপুরে, বাহুলাড়ায় আর সোনাতপনে। বুকে নিয়ে আছে নাগর স্থাপত্যের নিদর্শন কাঙড়া, কুলু, কুমায়ুন আর হিমালয়ের শীর্ষদেশও।

নিবদ্ধ কিন্তু দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শুধু দক্ষিণ ভারতে—দ্রাবিড়স্থানে, মহাবলীপুরমে, কাঞ্চীপুরমে, কুম্ভকোনামে, তাঞ্জোরে, চিদাম্বরমে, শ্রীরঙ্গমে, জম্বুকেশ্বরে, ভেলুরে, মাদুরাতে, সুচিন্দ্রমে, ত্রিবাঙ্কুরে, বিজয়নগরে আর রামেশ্বরমে।

আবদ্ধ বেসর স্থাপত্য আর ভাস্কর্য, দাক্ষিণাত্যে চালুক্যভূমে, ধারোয়ারে, আইহোলে, পট্টদকলে, বাদামী বা বাতাপিতে, আর ভেঙ্গিতে মহীশূরে—সোমনাথপুরে, দ্বারসমুদ্রতে বা হলেবীদে আর বেলুড়ে।

বুকে নিয়ে আছে নাগর মন্দির রেখ দেউল—ক্রম শীর্ণায়মান হয়ে ওঠে তার গর্ভগৃহের সুউচ্চ ছাদ, শীর্ষে নিয়ে আমলক শীলা আর কলস। সবার উপরে চক্র অথবা ত্রিশূল, বিষ্ণু অথবা শিবের প্রতীক। সঙ্গে নিয়ে আছে দেউল

কোথাও জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির, কোথাও নাটমন্দির, কোথাও মণ্ডপ, কোথাও বা শুধুই স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। অঙ্গে নিয়ে আছে তারা অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, বিভিন্ন লতাপুষ্প আর সুষ্ঠুগঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তার স্থপতির আর ভাস্করের, তাঁদের পরমাশ্চর্য, সুন্দরতম দান।

বুকে নিয়ে আছে দ্রাবিড় মন্দির বিমান, সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপম, সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ আর কল্যাণ মণ্ডপম। বিমানের শীর্ষদেশে, সুউচ্চ পিরামিডাকৃতি শিখারা। চার প্রবেশ পথে মহামহিমময় গোপুরম, প্রবেশদ্বার মন্দিরের। গোপুরমকেই করেন মধ্যমণি দ্রাবিড় স্থপতি। তার শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে মন্দিরের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই অলঙ্কৃত তারাও কত নিখুঁত, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে, কত জীবন্ত, শোভন গঠন মূর্তি সম্ভার দিয়ে, মূর্তি কত দেবদেবীর, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কত গৌরবময় যুগের।

গড়ে ওঠে বেসর মন্দির নাগর আর দ্রাবিড়ের সংমিশ্রণে, তাদের যুক্ত পদ্ধতিতে, বুকে নিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। যুক্ত হয় কেন্দ্রস্থলের মহামণ্ডপমের সঙ্গে তিনটি গর্ভগৃহ, শীর্ষে নিয়ে বিমান আর পিরামিডাকৃতি শিখারা, অঙ্গে নিয়ে তারকার পদ্ধতি—বৈশিষ্ট্য বেসর মন্দিরের। কিন্তু নয় এই শিখারা দ্রাবিড় মন্দিরের শিখারার মত তল বিশিষ্ট। ভূষিত তাদের সর্বাঙ্গও, অপরূপ সূক্ষ্মতম ভূষণে আর জীবন্ত বৃহৎ মূর্তি সম্ভার দিয়ে। রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে মূর্তি দিয়ে কত কাহিনী, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতের, কাহিনী পুরাণেরও। মহামহিমময় এই মূর্তিগুলি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চালুক্য আর হোয়সল ভাস্করের, তাদের অক্ষয় অমর কীর্তি।

বিভিন্ন কাশ্মীরের মন্দিরের স্থাপত্য আর ভাস্কর্যও। রচিত যদিও গান্ধার পদ্ধতিতে, বুকে নিয়ে আছে তারা মহাসুন্দরের লীলা নিকেতন কাশ্মীরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সুন্দরের পূজারী কাশ্মীর স্থপতির আর ভাস্করের স্বকীয়তা।

এই সমস্ত দেউল, শিখারা, বিমান আর মন্দির ছাড়াও এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গড়ে ওঠে ভারতের বুকে, নির্মিত হয় গুহামন্দির জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে। ভারত সম্রাট মৌর্য অশোকই প্রথম নির্মাণ করেন জৈন আজীবিক সম্প্রদায়ের বাসের জন্য গুহামন্দির, বুদ্ধ গয়ার নিকটে বরাবর ও

নাগার্জুনী শৈলমালার অঙ্গে, প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম ভয়ঙ্কর পরিবেশে। রচিত হয় কর্ণকৌপর আর সুদামা। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গ কেটেও প্রায় বার'শ গুহামন্দির নির্মিত হয়। শোভিত হয় গুহামন্দির দিয়ে কলিঙ্গের মহাপবিত্র খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির অঙ্গও। অলঙ্কৃত হয় গুহামন্দির দিয়ে শিরগুজা আর মালবের পবিত্র আত্মা বিন্ধ্যার অঙ্গে, বাঘও। বুকে নিয়ে আছে তারাও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কত মহা-অভিজ্ঞ বৌদ্ধ, হিন্দু আর জৈন স্থপতির আর সুনিপুণ ভাস্করের — তাদের শ্রেষ্ঠ দান, দান কত বহুশত বৎসরের অক্লান্ত সাধনার। অলঙ্কৃত করেন তাঁরা তাদের সর্বাঙ্গ, ঢেলে দিয়ে হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্য, উজাড় করে দিয়ে মনের অপরিসীম মাধুর্য। ভূষিত করেন মহাপারদর্শী চিত্রশিল্পীও অনুপম চিত্রসম্ভার দিয়ে শিরগুজার, অজন্তার, এলোরার আর বাঘের গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ। রচিত হয় চিত্রে কত কাহিনী—কাহিনী কত জাতকের, বুদ্ধের পূর্বজন্মের, কাহিনী তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাবলীরও। অঙ্কিত করেন দৃশ্য কত প্রান্তরের, কত বন উপবনের, কত রাজসভার, কত রাজ নর্তকীর, কত শোভাযাত্রারও। মহাসমৃদ্ধিশালী করেন তাদের অপরূপ, পরমা রূপবতী নারী মূর্তি দিয়ে। নারীকেই করেন মধ্যমণি। নাই কারও অঙ্গে কোন বসন—বিবসনা, কেউ স্বল্পবসনা, কেউ সূক্ষ্ম—পরিদৃশ্যমান তাদের বসনের অন্তরাল থেকে নারীর যৌবন মদমত্ত, পরিপুষ্ট, পীনোন্নত বক্ষ। তাদের লীলায়িত গ্রীবা, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, মসৃণ কপোল, গুরুভার নিতম্ব বিভ্রম জাগায় মনে। পরিণত হয় এই সব গুহামন্দির এক রহস্যলোকে, এক স্বপ্ন-পুরীতে। রচিত হয় কত ইন্দ্রলোক, কত অমরাবতী, শৈলমালার অন্তরতম প্রদেশে, প্রকৃতির সুন্দরতম লীলা নিকেতনে। লাভ করেন ভারতের স্থপতি, ভাস্কর আর চিত্রশিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের আর চিত্র শিল্পের দরবারে—হন বিশ্বজিৎ।

আমার প্রথম রচনা 'মন্দিরময় ভারত' প্রথম ভাগ, গ্রন্থে দ্রাবিড়, বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরের বিবরণ সন্নিবদ্ধ করেছি। এই ভাগে বর্ণিত হয়েছে প্রায় সমস্ত গুহামন্দিরই। নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত প্রায় সমস্ত মন্দিরের, আছে যাদের খ্যাতি, বিবরণ দিয়ে তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত করবো।

বাসনা আছে "ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন কীর্তি" ও "ভারতে ইসলামের অবদান" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়নেরও। তবেই সফল হবে আমার দুরূহ ও দুঃসাধ্য সংকল্প, সার্থক হবে আমার লেখনী ধারণ। দেওয়াও হবে এই মহা পুণ্যভূমি, বিশাল ভারতের বুকের অগণিত হিন্দুমন্দিরের, জৈন তীর্থ নগরের, বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ও বিহারের আর ইস্‌লামের মসজিদের, সমাধির ও দুর্গের খানিকটা আভাস। ইঙ্গিত তাদের অঙ্গের অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারের, জীবন্ত মূর্তিসম্ভারের আর অনুপম চিত্রসম্ভারের, পরিচয় ভারতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, কীর্তির বহুশত বৎসরের—তার অমূল্য সম্পদের। জানি না সফল হবে কিনা আমার এই স্বপ্ন, সার্থক হবে কিনা আমার অন্তরের অন্তরতম বাসনা।

প্রথম ভাগের মত, এই ভাগেও মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ আর মূর্তির বিবরণ ছাড়াও, উল্লিখিত হয়েছে পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে দেশের ইতিহাস, তাদের সামাজিক রীতি, নীতি ও জীবন যাত্রার প্রণালী ও গুহামন্দির নির্মাণ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ। বর্ণিত হয়েছে তারা ঐতিহাসিক পটভূমিকায়, নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় মন্দিরের বিবরণ। সম্ভব হয় নাই যে সমস্ত মন্দির দর্শন করবার, হয় নাই সৌভাগ্যও, তাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি প্রথম ভাগে স্থাপত্যের ধারায়, এই ভাগে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশে, যাতে পাঠক ভারতের সমস্ত মন্দিরের পরিচয় লাভ থেকে বঞ্চিত না হন, অসম্পূর্ণ না থেকে যায় ভারতের বুকের মন্দিরের বিবরণও।

স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশে মন্দিরের গঠন আর তার নির্মাণ-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি তার অঙ্গের ভাস্কর্যের, বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে তাদের ক্রমোন্নতি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, অগ্রগতি বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহার আর স্তম্ভের, হিন্দু আর জৈন মন্দিরের। বিবৃত হয়েছে কোথায় ও কোন্ মন্দিরে তারা—স্তূপ, চৈত্য, বিহার, মন্দির আর স্তম্ভ লাভ করেছে পূর্ণ পরিণতি, চরম উৎকর্ষ, উপনীত হয়েছে উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। পুস্তকে সন্নিবিষ্ট বিষয়বস্তুতে, বর্ণনা করা হয়েছে মন্দিরের প্রতিটি অঙ্গের অলঙ্করণ, তার প্রাচীরের গাত্রের, ছাদের অঙ্গের, স্তম্ভের অঙ্গের আর বন্ধনীর অঙ্গের নিখুঁত, সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, তার জীবন্ত মূর্তিসম্ভার আর

মহিমময় চিত্রসম্ভারও—বিস্তৃত বিবরণ প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের প্রতিটি চিত্রের। বর্ণিত হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতবাদ, তাদের মূর্তিতত্ত্ব, জাতকের গল্প, বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর কাহিনী, কাহিনী পুরাণেরও। তাই ক্রমবিকাশ পরিপূরক বিষয়বস্তুর পরিবর্ধকও, সহায়ক প্রতিটি মন্দিরের সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহের তার পূর্ণ প্রকাশের।

কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে, প্রবাসী মাসিক পত্রিকায় রচনাটি এক বছরের উপর ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য। জানাই খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী উষা দেবীকে তাঁদের নিরন্তর উৎসাহের জন্য। আর জানাই অগ্রজপ্রতিম শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ী ও শ্রীমতী বিমল বৌদিকে, তাঁদেরই প্রেরণায় ও উৎসাহে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে বাংলা রচনায় লেখনী ধারণ করি।

সহজ নয় কাগজ সংগ্রহ করা, সম্ভবও নয়। সেই দুরূহ ও দুঃসাধ্য কাজে সহায়তা করেছেন আমার ভাগিনেয়, শ্রীমান দেবব্রত তলাপাত্র, নইলে বিলম্ব হত এই পুস্তকের প্রকাশে।

এই ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদ নাসিক, ডি. এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীগোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত "ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে" নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

এই সব হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার বা সঙ্ঘারাম আর জৈন মন্দির নগরগুলিই ছিল ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল ছিল মহা মিলনের এই মহাভারতের এক অখণ্ড বিভিন্ন সভ্যতার, শিক্ষার, সংস্কৃতির আর কৃষ্টির, বুকে নিয়ে তাদের সম্মিলিত, অবিনশ্বর, শাশ্বত, মহাগৌরবময় কীর্তির নিদর্শন। তাই প্রথম ভাগের মত এই ভাগও যদি পাঠকসমাজে আদৃত হয়, বাসনা জাগে তাঁদের অন্তঃকরণে মন্দিরদর্শনের, সন্ধান লাভের সেই অবলুপ্ত, বিস্মৃত, নিখিল ভারতীয়, অবিচ্ছিন্ন মিলনসূত্রের, তবেই সার্থক হবে আমার "মন্দিরময় ভারত" লেখা, সফল হবে প্রচেষ্টা।

শ্রীশ্রীকালীপূজা, ১৩৬৬, বঙ্গাব্দ
২৩।এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

অপূর্বরতন ভাদুড়ী

সূচীপত্র



বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি

অজন্তা



ত্রিমূর্তি
এলিফেণ্টা



রাণীগুম্ফা : উদয়গিরি



এলোরা

প্রথম অধ্যায়

দাক্ষিণাত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাসিক

১। পাণ্ডুলেনা চৈত্য	২। নাহাপনা বিহার
৩। গৌতমী পুত্র বিহার	৪। শ্রীজ্ঞান বিহার

এলিফ্যাণ্টা গুহা-মন্দির দেখতে গিয়ে মন্দিরের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্রমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রায় বছরখানেক পরে তিনি নাসিকে বদলি হন। তাঁরই পুনঃ পুনঃ পত্রাঘাতে ও সনির্বন্ধ অনুরোধে একদিন স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নাসিকে গিয়ে উপস্থিত হই। দর্শন হয় পুণ্যতীর্থ নাসিক, দেখি তার অনুপম মন্দিরগুলিও। পূর্ণ হয় বহু দিনের এক বাসনা যা লুক্কায়িত ছিল মনের মণিকোঠায়। দেখেছি স্বপ্নলোক অজন্তা; পবিত্র তীর্থ বৌদ্ধ শ্রমণের, শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্থল বৌদ্ধ স্থপতির আর চিত্রশিল্পীর, স্বপ্নপুরী ইলোরা—বৌদ্ধ, হিন্দু আর জৈন স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিভূমি। দেখেছি কার্লি, ভাজা, বিদিশা আর কানেরির গুহা-মন্দিরও। নাসিক দেখলে দেখা হবে পশ্চিম-ভারতের প্রায় সবগুলি গুহা-মন্দিরই। তাই এই বাসনা।

নাসিক বোম্বাই-কলিকাতা লাইনে বোম্বাই থেকে একশ' কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা তখন বোম্বাই-প্রবাসী, রওনা হই কলিকাতা মেলে চড়ে রাত্রি ন'টায়। রাত্রি বারটায় ট্রেন নাসিক স্টেশনে এসে থামে। ট্রেন থেকে নেমে দেখি বন্ধুবর স্টেশনে উপস্থিত। একটি ট্যাক্সি ক'রে তাঁর গৃহে উপনীত হই। বন্ধুপত্নী সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান। মুগ্ধ হই তাঁর সৌজন্যে। বাড়ী থেকে খাওয়ার পাট চুকিয়ে রওনা হয়েছিলাম। তাই মুখ-হাত ধুয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ি।

পরের দিন সকালে উঠে চা ও জলযোগ শেষ ক'রে সকলে মিলে গুহা-মন্দির দেখতে রওনা হই। নাসিকের দক্ষিণ-পশ্চিমে বোম্বাই-এর রাস্তায় প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে, আমাদের ট্যাক্সি গুহা-মন্দিরের সামনে এসে থামে।

দেবতারা সমুদ্রমন্থন করেন। ওঠে এক সুধাকুম্ভ, পরিপূর্ণ অমৃতে। অসুরেরা অপহরণ করেন সেই সুধাকুম্ভ। কয়েকবিন্দু সুধা পড়ে ধরিত্রীর অঙ্গে—গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে, শিপ্রা নদীতীরে উজ্জয়িনীতে, আর গোদাবরীতীরে নাসিকে। মহাতীর্থে পরিণত হয় এই সব স্থান। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে সমাগত হন এখানে কত সাধু-মহাত্মা, আসেন কত দর্শনার্থী, উদাসী, বৈরাগী, আর নাগা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। মহাসম্মেলনে পরিণত হয় এই সব স্থান। যদি অমাবস্যা তিথিতে কর্কট রাশিতে অবস্থান করেন সূর্য, চন্দ্র আর বৃহস্পতি, তবে গোদাবরী তীরে—এই নাসিকে, কুম্ভ হয়।

সূর্যবংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু, বৈবস্বত মনুর পুত্র। সেই বংশেরই রাজা দশরথ রাজত্ব করেন পুণ্যতোয়া সরযূর তীরে—অযোধ্যা নগরীতে। তাঁর তিন রাণী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার গর্ভে চার পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। রাম বিদেহ-নৃপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা সীতাদেবীকে বিবাহ করেন।

বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে নির্বাসিত হন রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসরের জন্য, ছেড়ে দেন ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনের অধিকার। তিনি দাক্ষিণাত্যে দণ্ডকারণ্যে যান, তাঁর অনুগমন করেন সীতাদেবী ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ। সেখানে কিছুদিন গোদাবরীতীরে, পুণ্যতীর্থ নাসিকে, পঞ্চবটীতে তাঁরা বাস করেন।

রাক্ষসের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাসিকের অধিবাসীরা। বিঘ্ন হয় মুনি ঋষিদের জপ-তপের। রাম নির্মম হস্তে নিবারণ করেন রাক্ষসের অত্যাচার। লঙ্কার রাক্ষস-রাজা রাবণের ভগ্নী সূর্পনখার নাসিকা কর্তিত হয় এইখানে। খবর পেয়ে লঙ্কাধীশ রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হন। শেষে একদিন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে, রামের অনুপস্থিতিতে, সীতাদেবীকে হরণ ক'রে নিয়ে যান লঙ্কায়। প্রতিশোধ নেন ভগ্নীর অপমানের।

প্রিয়তমার শোকে মুহ্যমান শ্রীরামচন্দ্র। শেষে বেলারী জেলার কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তাঁর অনুগত হন হনুমান ও আরও অনেক বানর সেনানায়ক। তাঁদের সাহায্যে নির্মিত হয় এক সেতু, সেতুবন্ধে। সেই সেতু অতিক্রম ক'রে তাঁরা লঙ্কায় উপনীত হন। যুদ্ধে নিহত হন লঙ্কাধীশ রাবণ।

উদ্ধার করেন সীতাদেবীকে অশোক-কানন থেকে। শেষে পুষ্পক রথে আরোহণ ক'রে রামেশ্বরমে এসে অবতরণ করেন। সেখানে সমুদ্রতীরে পিতৃতর্পণ ক'রে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, সঙ্গে আসেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান।

আবার অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন শ্রীরামচন্দ্র। উৎসবে মুখরিত হয় সারা অযোধ্যা। কিন্তু এক অসন্তোষের আগুন থেকে যায় প্রজাদের অন্তঃকরণে। সীতাদেবী বহুদিন রাক্ষস-রাজার অন্তঃপুরে ছিলেন—সন্দেহ হ'ল তাঁর সতীত্বে। দূতের মুখে রামচন্দ্র শোনেন তাদের অসন্তোষের বাণী। প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য নির্বাসিত হন সীতাদেবী। বাস করেন সরযূতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে। সেখানে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে দুই যমজ পুত্র। লব ও কুশ নামে খ্যাতিলাভ করে সেই পুত্রদ্বয়।

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন লব আর কুশ। বাল্মীকি তাঁদের অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। তাঁরা ফিরে পান তাঁদের পিতৃরাজ্য। রচিত হয় মহাকাব্য—রামায়ণ। রচনা করেন আদিকবি বাল্মীকি।

প্রাচীনতম যুগে রাষ্ট্রিকরা বাস করতেন নাসিকে। যখন স্থাপিত হয় ভারতে চারিটি প্রাচীনতম শক্তিশালী রাষ্ট্র—অবন্তী, বৎস, কোশল আর মগধ, নাসিক অবন্তীর অধিকারে আসে। ভারতসম্রাট অশোক অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন খ্রীষ্টপূর্ব ২৭২ থেকে ২৩২ পর্যন্ত। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মহীশূরের চিতল দুর্গ এবং পূর্বে বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গ আর পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও আরব সাগর পর্যন্ত। নাসিক মগধের অধীনে আসে। গড়ে ওঠে স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, গরাদ (রেল) আর বিহার সারনাথে, বৌদ্ধগয়ায়, কটকে, বরাবরে, উদয়গিরিতে, বিদিশাতে, মথুরাতে, ভারহুতে, দাক্ষিণাত্যে, পশ্চিমঘাটে, ভাজাতে। আজও বুকে নিয়ে আছে তারা শ্রেষ্ঠ মৌর্য-স্থাপত্যের নিদর্শন।

১৮৭ খ্রীষ্টপূর্বে পতন হয় মৌর্যদের। সুঙ্গ পুষ্যমিত্র অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। মগধে সুঙ্গ-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। নাসিক আসে তখন সুঙ্গদের অধিকারে। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্রও, অধিরোহণ করেন পিতৃ-সিংহাসনে পিতার মৃত্যুর পর। রাজত্ব করেন একে একে জ্যেষ্ঠমিত্র, বসুমিত্র আর ভদ্রক। ভদ্রকের রাজসভায় তক্ষশীলার গ্রীক রাজা প্রেরণ

করেন এক গ্রীক দূত—পরিচিত হেলিয়োডোরাস নামে। দীক্ষিত হন তিনি বৈষ্ণবধর্মে। নির্মিত হয় এক গরুড়ধ্বজ। ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় ভারত, উপনীত হয় এক স্বর্ণযুগে—সমপর্যায়ে পড়ে পরবর্তী গুপ্তযুগও। জন্মগ্রহণ করেন গোনার্দে পতঞ্জলি, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই যুগের। রচিত হয় বিদিশাতে গজদন্ত-নির্মিত কত সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, নির্মিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার আর গরাদ (রেল) ভাজাতে, নাসিকে, বিদিশাতে, কার্লিতে, অজন্তাতে আর সাঁচীতে—বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। অমর হন শিল্পীরা, অমর হয় গোনার্দ, সাঁচী আর ভারহুত। অমরত্ব লাভ করেন সুঙ্গরাজারা ইতিহাসের পাতায়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩ অব্দে নিহত হন শেষ সুঙ্গরাজা দেবভূতি। অস্তমিত হয় সুঙ্গ-ক্ষমতা, সেই সঙ্গে সুঙ্গ-কৃষ্টি, সুঙ্গ-সভ্যতা আর সংস্কৃতি।

মগধে কণ্ববংশ স্থাপন করেন বাসুদেব। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। নিহত হন সুশর্মন, শেষ কণ্বরাজা, অন্ধ্র সিমুকের হাতে। অন্ধ্র, প্রাচীনতম জাতি। তাঁরা বাস করতেন কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাঁরাও রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত, দীর্ঘ চারি শত বৎসর। প্রতিষ্ঠিত হয় এক মহাশক্তিশালী সার্বভৌম সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে, বিস্তৃত তার সীমানা—কৃষ্ণা-গোদাবরীর উপত্যকা থেকে নাসিক আর উজ্জয়িনী পর্যন্ত। স্থাপিত হয় রাজধানী গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠানে, দ্বিতীয় রাজধানী বৈজয়ন্তীতে, তৃতীয় অমরাবতীতে। ত্রিশ জন নৃপতি অধিকার করেন সাতবাহন সিংহাসন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীসাতকর্ণী, গৌতমী পুত্র, বশিষ্ঠপুত্র পুলুমায়ী আর যজ্ঞশ্রীসাতকর্ণী। নাসিক আসে সাতবাহনদের অধিকারে। বিস্তৃত হয় দাক্ষিণাত্যে আর্য-সভ্যতা, আর্য-সংস্কৃতি। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও, পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধ-স্থাপত্যের, নির্মাণ করেন অনবদ্য স্তম্ভ, স্তূপ, গরাদ, চৈত্য আর বিহার যজ্ঞপেটাতে, অমরাবতীতে, নাসিকে, বিদিশাতে, কার্লিতে ও কানেরিতে,—অঙ্গে নিয়ে অনুপম শিল্প-সম্ভার, প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের। তাঁরাই রচনা করেন সাঁচীর অপরূপ তোরণ।

কিছুদিনের জন্য নাসিক শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অধিকারে আসে। রাজত্ব করেন তিনি ৩০ থেকে ৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। উজ্জয়িনীতে স্থাপিত হয়

রাজধানী। বিবাহ হয় তাঁর কন্যার সাতবাহন বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ীর সঙ্গে।

সাতবাহনের ক্ষমতা তৃতীয় শত ব্দীতে অস্তমিত হয়। নাসিক অভীররাজ ঈশ্বর সেনের অধিকারে আসে। অভীরদের পতন হলে নাসিক বাকাটকদের অধিকারে আসে। বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা নাসিকে কয়েকপুরুষ ধরে রাজত্ব করেন। হরি সেন শেষ রাজা বাকাটক বংশের। তাঁর মন্ত্রী বরাহদেব অজন্তাতে নির্মাণ করেন ষোড়শ আর সপ্তদশ বিহার ৪৭০ থেকে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে নাসিক মালবের কলচুরীদের অধিকারে আসে। নাই তাঁদের কোন দান ভারতীয় স্থাপত্যে।

প্রাচীনতম যুগে এই নাসিককেই কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে পশ্চিম-ভারতের সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার কৃষ্টি। নির্মাণ করেন যখন মৌর্য ও সুঙ্গ রাজারা স্তম্ভ, চৈত্য আর বিহার, বুদ্ধগয়ায়, সাঁচীতে আর ভারহুতে, তীর্থস্থানে পরিণত হয় বুদ্ধগয়া, সাঁচী আর ভারহুত। নির্মিত হয় কত গুহা-মন্দির— নাসিকে আর নাসিকের দু'শ মাইল পরিধি নিয়ে। নির্মিত হয় একে একে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গে, ভাজাতে, কনডেনে, পিটলখোরাতে, বিদিশাতে, নাসিকে, কালিতে কানেরিতে আর অজন্তাতে, স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, অঙ্গে নিয়ে অনুপম শিল্প-সম্ভার।

নির্মিত হয় প্রথম চারিটি চৈত্য খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, বাকী তিনটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। কানেরির চৈত্য খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়। সবগুলি চৈত্যই হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা নির্মাণ করেন, তাই নাই এই চৈত্যে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, পূজিত হয় তাঁর স্মৃতি। জুনারেও দুটি হীনযান চৈত্য নির্মিত হয়। নাই অন্য কোন চৈত্য হীনযান সম্প্রদায়ের।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে নির্মিত হয় চারিটি গুহা-মন্দির। নির্মিত হয় কর্ণ কৌপর, সুদামা, লোমশ ঋষি ও বিশ্ব ঝোপড়ি। নির্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি। অতিক্রম করে অর্ধ শতাব্দী, আবার সুরু হয় গুহামন্দির নির্মাণ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গে।

পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালাই গুহা-মন্দির নির্মাণের উপযুক্ত স্থান। তাই বেছে নেন বৌদ্ধ স্থপতি এই পর্বতমালাকেই গুহা-মন্দির নির্মাণের জন্য। পাহাড়ের অঙ্গ কেটে নির্মাণ করেন চৈত্য, বৌদ্ধ উপাসনামন্দির, অনুরূপ খ্রীষ্ট ধর্মমন্দিরের। নির্মিত হয় খিলান-সংযুক্ত প্রশস্ত কক্ষ (হল), বৃত্তাকারে রচিত হয় তার প্রান্তদেশ। দুই সারি দীর্ঘচ্ছেদ অনুপম স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয় দু' পাশের গলি-পথকে ঘরের প্রশস্ত কেন্দ্রস্থল থেকে। বৃত্তাংশে রচিত হয় একটি স্তূপ।

নির্মিত হয় চৈত্যের সংলগ্ন একটি সঙ্ঘারাম বা বিহার,—বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। দাগোবার অনুরূপ বিহার কথাটিও সিংহল থেকে আমদানি হয়েছে। কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় একটি প্রশস্ত সভাগৃহ (হলঘর)। রচিত হয় একটি বা একাধিক প্রবেশ-দ্বার, তার সম্মুখে একটি আচ্ছাদিত অপরূপ তোরণ অথবা অলিন্দ। রচিত হয় চতুষ্কোণ-প্রকোষ্ঠ পাহাড়ের অন্তরতম প্রদেশে, সভাগৃহের চতুর্দিকে। প্রবেশ-পথ দিয়ে সভাগৃহের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেই প্রকোষ্ঠগুলি। এই সব প্রকোষ্ঠেই বাস করেন বৌদ্ধ শ্রমণেরা। ক্রমে বাড়ে বৌদ্ধ শ্রমণের সংখ্যা, নির্মিত হয় একাধিক বিহার। হয় বোধিসত্ত্বদের জন্য পৃথক বিহারও। সোপানের শ্রেণী দিয়ে যুক্ত হয় বিহারগুলি। নির্মিত হয় গুহা-মন্দির কাঠের তৈরী অট্টালিকার অনুকরণে। ত্রুটীহীন সেই অনুকরণ।

প্রথমে নির্বাচিত হয় মন্দির-নির্মাণের স্থান। নির্ভর করে সেই নির্বাচন পাহাড়ের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর। নির্বাচন করেন সঙ্ঘের অধিকর্তা, তিনিই প্রস্তুত করেন মন্দিরের পরিকল্পনা। নিযুক্ত হন স্থপতি, সুনিপুণ স্থাপত্যের ও পর্বত খননের কাজে। ঋজু ক'রে কাটা হয় চূড়ার নীচের পাহাড়ের খাড়া দিক, রচিত হয় মন্দিরের সম্মুখভাগ সেই লম্বতলে। কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় একটি বৃহৎ গবাক্ষ, প্রবেশ-পথ, মন্দিরের আলো-বাতাসের, পথ পাহাড়ের ভিতরের কাজের আর রাবিশ ও ধ্বংসাবশেষ নির্গমনেরও। এই ধ্বংসাবশেষ দিয়েই রচিত হয় মন্দিরের সম্মুখের প্রাকার আর প্রাঙ্গণ।

সুরুতে, নির্মিত হয় একটি ক্ষুদ্র চৈত্য, সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ, বাসস্থান মন্দির নির্মাণের কর্মাধ্যক্ষের, মন্দিরের স্থপতির, মন্দির নির্মাতাদের, বাসস্থান-পরিদর্শকেরও। আছে তার নিদর্শন ভাজাতে, আছে নাসিকেও। চিহ্নিত হয় পাহাড়ের অঙ্গে মন্দিরের সম্মুখভাগের পরিকল্পনা। সুরু হয় উপর

থেকে নির্মাণের কাজ, নীচের প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে। প্রথমে সম্পূর্ণ হয় উপরের কাজ, শেষে নীচের। উপর থেকে সুরু হয় মন্দিরের ভিতরের কাজও। রচিত হয় প্রথমে মন্দিরের ছাদ। অপরূপ শিল্প-সম্ভার দিয়ে সাজান শ্রেষ্ঠ স্থপতি আর ভাস্কর সেই ছাদের অঙ্গ। ক্ষোদিত করেন কত সুন্দরতম, আর সূক্ষ্মতম লতা পল্লব, কত রাজহংস, কত প্রস্ফুটিত পদ্ম।

নির্মিত হয় স্তম্ভের বন্ধনী, ক্ষোদিত হয় তার অঙ্গেও কত মূর্তি। মূর্তি কত বুদ্ধের, মূর্তি কত দেবদেবীরও। কোথাও রচিত হয় স্তম্ভের শীর্ষদেশে গরুড় মূর্তি—কোথাও জোড়া, কোথাও বা তিনটি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কোথাও এক বা একাধিক সিংহ। কোথাও স্তম্ভের শীর্ষদেশে এক বা একাধিক হস্তী, অনবদ্য তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। জীবন্ত, প্রতীক তারা,—আছে তাদের পৌরাণিক অর্থ। হস্তী পূর্বদিকের রক্ষাকারী, অশ্ব দক্ষিণের, ষণ্ড পশ্চিমের আর সিংহ উত্তরের, তারা অভিভাবকত্ব করে চারিদিকে। ঋক্‌বেদে কিন্তু সিংহই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন। দ্রুতগামী অশ্ব সূর্যের প্রতীক, হস্তী দেবরাজ ইন্দ্রের। রচিত হয় স্তম্ভ দণ্ড, বিভিন্ন তাদের আকৃতি—কেউ চতুষ্কোণ, কেউ অষ্ট, কেউ ষোল-কোণ বিশিষ্ট। কারুর অঙ্গ মসৃণ, নাই কোন শিল্পসম্ভার। কারও অঙ্গে খোদিত লতা, পল্লব, কারও অঙ্গে মূর্তি। মূর্তি কত জন্তুর, কত মানুষের—অপরূপ তাদের গঠন-ভঙ্গিমা!

প্রাচীরের গাত্রে কার্নিশের নীচেও সারি সারি মূর্তি আর লতা। তার নীচে কত বুদ্ধের মূর্তি। মূর্তি কত বোধিসত্ত্বের। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিভিন্ন তাদের ভঙ্গী—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ পদ্মাসনে বসে, কার হাতে অভয়-মুদ্রা, কারও বরদা, সবগুলিই জীবন্ত। রচিত হয় প্রবেশ পথ, তার দুই পাশের শীর্ষদেশ অনবদ্য লতা-পল্লবে আর মূর্তি-সম্ভারে সাজান। তারপর অলিন্দ, তার ছাদে আর প্রাচীরের অঙ্গেও ক্ষোদিত হয় অপরূপ লতা-পল্লব আর মূর্তি। প্রবেশ পথের সম্মুখে একটি আচ্ছাদিত তোরণ, তার ছাদের আর স্তম্ভের অঙ্গেও কত সুন্দর, আর সূক্ষ্ম লতা-পল্লব। মূর্তি আর লতা-পল্লব দিয়ে শোভিত হয় মন্দিরের সম্মুখভাগও।

বড় ভারী কুঠার দিয়ে প্রথমে খনিত হয় পাহাড়ের অঙ্গ। কুঠার দিয়েই বিচূর্ণ আর বিচ্ছিন্ন হয় বাড়তি প্রস্তরখণ্ড। প্রশস্ত ফলাযুক্ত বাটালি দিয়ে

বিন্যস্ত হয় মন্দিরের তলদেশ। বিভিন্ন আকারের ফলাযুক্ত বাটালি, তীক্ষ্ণাগ্রযন্ত্র আর হাতুড়ি দিয়ে রচিত হয় মন্দির। ক্ষোদিত হয় তার ছাদের, প্রাচীরের আর স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের অনবদ্য, অনুপম শিল্প সম্ভার। ব্যবহৃত হয় সিকি ইঞ্চি ফলাযুক্ত শাণিত বাটালি শেষ রূপদানে। তাই তুলনাহীন এই রূপ, —নিখুঁত, মসৃণ, অম্লান। ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয় এই যন্ত্রগুলি। আবিষ্কৃত হয়েছে কতকগুলি সূক্ষ্মাগ্র বাটালি, বিদিশাতে, হেলিয়োডোরাসের ভগ্ন স্তম্ভের নীচে।

পাহাড়ের অঙ্গ কেটে, পাহাড়ের অন্তরতম প্রদেশে চৈত্য আর বিহার, যেন স্বপ্নলোক। রচনা করেন শ্রেষ্ঠ স্থপতি, সঙ্গে নিয়ে সুনিপুণ শিল্পী, মহাপারদর্শী স্থাপত্য-বিদ্যায়। রচনা করেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী। তাই প্রতিটি মন্দিরই বুকে নিয়ে আছে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। হয় বিশ্বজিৎ।

চৈত্য আর বিহারের মধ্যে চৈত্যই পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন। নির্মিত হয় নাসিকে একটি চৈত্য, পরিচিত পাণ্ডুলেনা নামে। রচিত হয় বাইশটি বিহারও, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে নাহাপনা (অষ্টম), গৌতমী পুত্র (তৃতীয়), আর শ্রীজ্ঞান (পঞ্চদশ গুহা-মন্দির)। দশম, একাদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও এক-বিংশতি বিহারও আছে অক্ষত অবস্থায়। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে অবশিষ্ট বিহারগুলি। এই বিহারগুলি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। সবগুলি মন্দিরই হীনযান সম্প্রদায়ের তৈরি।

আমরা প্রথমে পাণ্ডুলেনা, উনবিংশ গুহামন্দির দেখতে যাই। এই চৈত্যের সম্মুখে কোন কাঠের কাজ নাই। অজন্তার নবম গুহা-মন্দিরের সম্মুখভাগেও কোন কাঠের কাজ নাই! তাই তাদের বৈশিষ্ট্য। ব্যতিক্রম অন্য প্রাচীনতম চৈত্যের সঙ্গেও। পাণ্ডুলেনা ত্রিম্বক পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত, আছে এই পর্বতের শিখরে তিনটি চূড়া। দু' হাজার বছর আগের তৈরি এক চৈত্যের সম্মুখভাগের অপরূপ শিল্প-সম্ভার দেখে মুগ্ধ হই। এই চৈত্যটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত হয়—নির্মাণ করেন সুঙ্গ-রাজারা।

সম্মুখভাগে দুটি তল, নীচের তলের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি প্রবেশ-পথ,

অর্ধচন্দ্রাকারে রচিত তার শীর্ষদেশ। অর্ধচন্দ্রাকারে রচিত হয়েছে দ্বিতলের কেন্দ্রস্থলের চৈত্যর বিশাল বাতায়নটিও। দেখি, অনেকগুলি অর্ধগোলাকৃতি চন্দ্রাতপ, চৈত্যের শীর্ষদেশে আর বাতায়নের দুই পাশের প্রাচীরের গাত্রে। দুই দিকের উদ্গত স্তম্ভের কেন্দ্রস্থলেও। তার নীচেই ঘণ্টার প্রতীক।

আমরা সম্মুখভাগ দেখে চৈত্যের ভিতরে প্রবেশ করি। দেখি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটি যক্ষ প্রতিহারী। দেখি প্রাচীরের গাত্রে উৎকীর্ণ একটি ক্ষোদিত লিপিও, লেখা আছে, তাতে "ধাম্বিকা গ্রামবাসী প্রবেশ-পথের উপরের ক্ষোদিত শিল্প-সম্ভারের ব্যয় বহন করেছিলেন।" মুগ্ধবিস্ময়ে এই শিল্পসম্ভার দেখি।

ভিতরে প্রবেশ করে, দেখে বিস্মিত হই স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের কারুকার্য। হাঁড়ির আকারে নির্মিত হয় স্তম্ভের তলদেশ, হয় শীর্ষদেশের বন্ধনীর নীচেও। নাই কোন কারুকার্য স্তম্ভের অঙ্গে। কারও শীর্ষদেশে চতুষ্কোণ মঞ্চের উপর শোভা পায় জোড়া হস্তী, কারও জোড়া গরু, অপরূপ তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। দীর্ঘ ও সরু এই স্তম্ভগুলি, ব্যাস তাদের উচ্চতার অষ্টমাংশ, তাই শোভন, সুন্দর গঠন। সমপর্যায়ে পড়ে সুন্দরতম গ্রীক ও রোমান স্তম্ভের।

চৈত্যের প্রান্তদেশে, বৃত্তাংশে দেখি, রচিত হয়েছে পাহাড় কেটে একটি বৃহৎ স্তূপ, বৃত্তাকার তার তলদেশ।

আমরা চৈত্য দেখে অষ্টাদশ গুহা-মন্দির দেখি। প্রাচীনতম বিহার নাসিকের, সমসাময়িক পাণ্ডুলেনা চৈত্যের এই বিহারটি।

তারপর নাহাপনা বিহার। এই বিহারটি ১০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। অন্ধ্র সাতবাহনেরা নির্মাণ করেন। প্রাচীনতম তিনটি শ্রেষ্ঠ বিহারের মধ্যে, প্রাচীনতর গৌতমীপুত্র আর শ্রীজ্ঞানের, দাঁড়িয়ে আছে নাহাপনা এক সুন্দর শোভন মূর্তিতে। অনুপম তার অলিন্দটি, বুকে নিয়ে আছে চারিটি স্তম্ভ, আকৃতি তার পিরামিডের মত। তাদের শীর্ষদেশে আছে একটি ক'রে ঘণ্টা, তার উপর উল্টো করে রক্ষিত আর একটি ঘণ্টা। তার উপর বসে আছে জোড়া ষণ্ড অথবা জোড়া হস্তী। তাদের পাদদেশে পদ্ম, দুই প্রান্তে দুইটি অর্ধ স্তম্ভ। অনুরূপ এই স্তম্ভগুলি জুনারের গনেশলেনা চৈত্যের ভিতরের স্তম্ভের। সুষ্ঠু অনুকরণ বিদিশার অলিন্দের স্তম্ভের। অলিন্দ অতিক্রম ক'রে

ভিতরের কেন্দ্রস্থলের প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করি। নাই কোন স্তম্ভ এই সভাগৃহে। দেখি, অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ সভাগৃহের সংলগ্ন। তারা পরস্পর সংযুক্ত প্রবেশ-পথ দিয়ে। নাই কোন কারুকার্য এই সব প্রকোষ্ঠে, আছে শুধু এক-একটি প্রস্তর-শয্যা প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে।

নাহাপনা দেখে আমরা গৌতমী পুত্র (তৃতীয়) দেখতে যাই। শ্রেষ্ঠ গুহা-মন্দির নাসিকের, অন্ধ্র সাতবাহনেরাই ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিহারটি নির্মাণ করেন।

অলিন্দের সম্মুখভাগে একটি নীচু প্রাচীর। অনবদ্য সুন্দরতম গরাদে দিয়ে তৈরী সেই প্রাচীর। তার নীচে ক্ষোদিত এক সারি বৃহৎ মূর্তি, স্কন্ধে নিয়ে বিশালকায় চন্দ্রাতপ। দানব তারা, ভূগর্ভ থেকে উঠে এসেছে, এই চন্দ্রাতপ দিয়ে ধারণ ক'রে আছে সমস্ত বিহারটিকে। মন্দিরের ভারে বিস্তৃত তাদের চক্ষুর তারকা, স্ফীত বাহুর পেশী, কম্পিত সারা অঙ্গ। তারা শাশ্বত, নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের বুদ্ধের কাজে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

গরাদের (রেলের) অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছে অলিন্দের স্তম্ভগুলি, অদৃশ্য হয়ে আছে তাদের নীচের অংশ। অলিন্দের শীর্ষদেশে একটি প্রশস্ত খিলান—বিস্তৃত হয়ে আছে অলিন্দের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। দাঁড়িয়ে আছে খিলানটি সারি সারি স্তম্ভের উপর, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভ জোড়া হস্তী, জোড়া ষণ্ড আর জোড়া সিংহ। অনবদ্য তাদের গঠন। অনুরূপ এই স্তম্ভগুলি নাহাপনা বিহারের স্তম্ভের। কিন্তু সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, উন্নততর রূপদান। রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে একটি পাড়ও, শোভিত বিভিন্ন জন্তু, লতাপল্লব আর পুষ্পস্তবক দিয়ে।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখি অলিন্দের শোভা। দরজার সামনে এসে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই, দেখে দ্বারের শীর্ষদেশের আর তার পাশের মূর্তি-সম্ভার!

গৌতমী পুত্র দেখে আমরা শ্রীজ্ঞানে (পঞ্চদশ) বিহারে উপনীত হই। এই বিহারটি ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা নির্মাণ করেন। অন্যতম তিনটি শ্রেষ্ঠ বিহারের, নির্মিত হয় সবার শেষে। অনুরূপ গৌতমীপুত্রের, এই বিহারটিতেও আছে একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার। একটি প্রবেশ পথ, সজ্জিত অনুপম মূর্তি-সম্ভার দিয়ে। একটি স্তম্ভহীন প্রশস্ত

সভাগৃহ, বেষ্টিত হয়ে আছে তার তিন দিক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। নাই অলিন্দের সম্মুখের গরাদের তৈরী নীচু প্রাচীর, বুকে নিয়ে প্রকৃষ্ট শিল্পসম্পদ। নাই তার নীচের দানবের মূর্তিও।

বহুশত বৎসর অতিক্রম করে, প্রবল হন মহাযান সম্প্রদায়, হীনবল হন হীনযান। প্রবর্তিত হয় মূর্তির পূজা বৌদ্ধ চৈত্যে। অন্তর্হিত হয় স্মৃতির পূজা, তাই দাগোবার (স্তূপের) পরিবর্তে চৈত্য আর বিহারের প্রান্তদেশে, মন্দিরে রচিত হয় বুদ্ধমূর্তি, মূর্তি বোধিসত্ত্বেরও, মূর্তি পদ্মপাণি আর বজ্রপাণির—অবলোকিতেশ্বর আর মৈত্রেয়ীর, পূজিত হন বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব। তাই যখন এই মন্দিরগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের অধীনে আসে, পরিবর্তিত হয় এই বিহারটির আকৃতি তাঁদের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে। রচিত হয় সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে একটি বেদি, শেষ প্রান্তে একটি অনুপম গর্ভগৃহ বা ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে একটি তোরণ। অনুপম, সুন্দরতম এই তোরণের সামনের স্তম্ভ দুটি। তাদের শীর্ষদেশে শোভা পায় অনুভূমিক অপরূপ শিরাযুক্ত বন্ধনী, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম অনবদ্য শিল্পসম্ভার। অনুরূপ দ্রাবিড় স্থানের পল্লব স্থপতির স্তম্ভের অঙ্গের, সপ্তম শতাব্দীতে রচনা করেন গুপ্ত স্থপতি, গুপ্ত রাজাদের অর্থে। স্থাপিত হয় সেই মন্দিরে এক মহামহিমময় বুদ্ধমূর্তিও।

বেরিয়ে এসে দশম গুহা-মন্দির দেখতে যাই। অন্যতম সুন্দরতম এই বিহারটি সমপর্যায়ে পড়ে গৌতমী পুত্র বিহারের—অলিন্দের শীর্ষদেশের আর স্তম্ভের অঙ্গের শিল্প-সম্ভারে। কিন্তু নাই তার স্তম্ভের অঙ্গের মসৃণতা, নাই স্তম্ভের শীর্ষদেশের হাঁড়ির আকৃতির সৌষ্ঠবতাও।

আমরা একে একে দেখি একাদশ, সপ্তদশ, বিংশতি ও একবিংশতি গুহা-মন্দির, সবগুলিই বিহার বা সঙ্ঘারাম। কিন্তু নাই তাতে গৌতমী পুত্রের সূক্ষ্মতা, নাই সে সৌন্দর্যও তাদের অঙ্গের কারুকার্যে। পড়ে না তারা শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে।

সপ্তদশ ও একবিংশতি গুহা-মন্দিরে রচিত দেখি অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি, রচনা করেন দক্ষিণ-ভারতের চালুক্য রাজারা—৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। দেখি সপ্তদশ মন্দিরে শয়ন ক'রে আছেন একটি বিশালকায় মহিমাময় বুদ্ধ, আছেন

পরিনির্বাণ মূর্তিতে। সমপর্যায়ে পড়ে এই মূর্তিটি অজন্তার ষষ্ঠ বিংশতি গুহা-মন্দিরের বুদ্ধের পরিনির্বাণ মূর্তির সঙ্গে।

শ্রদ্ধা জানাই স্থপতিদের, জানাই শ্রদ্ধা শিল্পীদেরও—অমর তাঁরা, অমর করেছেন ভারতবর্ষকে, দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয় নি ম্লান, আছে উজ্জ্বল হয়ে মনের মণিকোঠায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্লি

কার্লির চৈত্য

বোম্বাই শহর। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। সন্ধ্যাবেলা, আপিস থেকে ফিরে এসে বাসার প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। পাশের টিপয়ের উপর ধূমায়মান চায়ের কাপ। ডাঃ মণি লাহিড়ী এসে হাজির। সঙ্গে আছেন ডাঃ সরকার আর সান্যাল।

মণি বলেন, পুণা যাবেন কাকাবাবু? মোটরে চড়ে যাওয়া যাবে। আছে একটি নয়নাভিরাম রাস্তা, বোম্বাই থেকে পুণা পর্যন্ত। বিস্তৃত সেই পথ একশ' কুড়ি মাইল। মণি আমার ভাইপো। বোম্বাইয়ের এক সরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ডাঃ সরকার আর সান্যাল তাঁর সতীর্থ।

আমি বলি, যেতে পারি, যদি কার্লি, ভাজা ও বিদিশা হয়ে যাওয়া হয়। তা হলে পুণাও দেখা হবে, পথে যেতে যেতে দেখতে পাওয়া যাবে কার্লি, ভাজার ও বিদিশার চৈত্য। দেখা হবে ভাজার ও বিদিশার বিহারও।

সম্মত হন তাঁরা। বলেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে পুণায় থাকবার জায়গার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

রাজী হই তাঁদের প্রস্তাবে। স্বীকৃত হই স্থানের ব্যবস্থা করবার ভার নিতে। স্থির হয়, আসছে শনিবার ভোর বেলাতেই আমরা রওনা হব, যদি ইতিমধ্যে থাকবার স্থান মেলে। শনি ও সোমবার ছুটি নিলেই চলবে। মঙ্গলবারে ফিরে এসে আপিস করা যাবে।

পরের দিন। আপিসে গিয়েই বন্ধুবর ভাণ্ডারীকে ফোন করি, যদি কিছু সুরাহা করতে পারেন। বলেন তিনি, তাঁর একটি গুজরাটী বন্ধু আছেন। অবিলম্বে তাঁকে নিয়ে হাজির হচ্ছেন। হয় ত কিছু সুব্যবস্থা হলেও হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরেই, ভাণ্ডারী তাঁর গুজরাটী বন্ধুকে নিয়ে উপস্থিত। বন্ধুটি

বলেন, তাঁদের একটি ধর্মশালা পুণাতে আছে। স্টেশনের একেবারে বিপরীত দিকে। স্টেশন থেকে দু'মিনিটের রাস্তা। একতলায় ধর্মশালা, দোকান ও রেস্তোঁরা। দোতলায় ডাভে হোটেল, অন্যতম বৃহত্তম হোটেল পুণার। তিন তলায় আর চার তলায় যাত্রীনিবাস আছে, সেই যাত্রীনিবাসে অনেকগুলি পৃথক 'সুইট'। প্রতি সুইটে আছে দুখানি পাশাপাশি ঘর, শোবার আর বসবার, সংযুক্ত দরজা দিয়ে। শোবার ঘরের পিছনে ড্রেসিং রুম, তার পিছনে রান্নার। রান্নাঘরের একদিকে নাইবার ঘর অপর দিকে ফ্লাসড পায়খানা। আসবাবে সজ্জিত এই ঘরগুলি। প্রতি ঘরে আছে গদিসমেত দু'খানি খাট, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি বড় ওয়ার্ডরোব, লিখবার টেবিল ও দু'খানি টিপয়। আছে প্রতি সুইটে পঞ্চাশ জনের রান্নার উপযোগী বাসনপত্রও। সুইটগুলির সামনে একটি টানা বারান্দা আছে। সেখান থেকে দ্রষ্টব্য পুণা শহর। লাগবে না কোন দর্শনী। দিতে হবে শুধু ছ' আনা, দৈনিক বৈদ্যুতিক বাতির খরচের জন্য।

তিনি বলেন, এই সব সুইটে তাঁদের আত্মীয়রা বাস করেন। থাকতে দেওয়া হয় পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও সপরিবারে একাধিক্রমে দুই সপ্তাহ। তার বেশী দিন থাকতে হলে চাই বিশেষ অনুমতি।

আরও বলেন, তিনি আজই টেলিফোনে জেনে নেবেন কোন খালি সুইট আছে কি না। পাকা ব্যবস্থার জন্য কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পরের দিন সকালে আপিসে যেতেই টেলিফোন বেজে ওঠে। সাগ্রহে রিসিভার কানের কাছে তুলে ধরি। শুনি আমাদের বাসের জন্য একটি সুইট সংরক্ষিত হয়েছে।

তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, টেলিফোনেই একে একে ডাঃ লাহিড়ী, সরকার ও সান্যালকে এই সুখবরটি পরিবেশন করি। শুনে সবাই মহাখুশী, বলেন কল্পনাতীত এই ব্যবস্থা।

শনিবারে ভোর বেলাতেই ডাঃ সান্যাল মোটর নিয়ে এসে আমাদের বাসা থেকে তুলে নেন। আমাদের মোটর বিদ্যুৎগতিতে ছোটে। প্রশস্ত সায়ন রোড দিয়ে, আমরা সায়ন অতিক্রম করে, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে রেলের লাইন, পেরিয়ে, এক বিস্তীর্ণ খাঁড়ির সামনে এসে উপস্থিত হই। এই খাঁড়ি আরব

সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। দেখা যায় খাঁড়ি আর সাগরের সংযুক্ত স্থল, মিশছে গিয়ে সাগর দিগন্তে। সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশ, সুন্দর এক লীলানিকেতন।

আমরা ডান দিকে মোড় নিয়ে, কিছুদূর খাঁড়ির কিনারা দিয়ে গিয়ে, কুর্লাতে উপনীত হই। এখানে অনেকগুলি কারখানা এবং কয়েকটি কাপড়ের কলও আছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর উঁচুনীচু পাহাড়ের রাস্তা সুরু হয়। আমরা চলি পশ্চিমঘাট শৈলমালার পাদদেশ দিয়ে। বঙ্কিম-গতিতে যাই। কখনও উঁচুতে উঠি, কখনও নীচে নামি। অতিক্রম করি কত আম্রকুঞ্জ, কত বন, কত উপবন, অবশেষে উপস্থিত হই থানাতে। বোম্বাইয়ের একটি জেলার সদর এই থানা, বোম্বাই থেকে সাতাশ মাইল দূরে অবস্থিত। এইখানে এসেই সমাপ্ত হয় বোম্বাই দ্বীপের এক প্রান্ত। তাই সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে থানা, সংযুক্ত হয়ে আছে ভারতের সঙ্গে একটি দীর্ঘ সেতু দিয়ে। সেই সেতুর উপর দিয়েই যাতায়াত করে লোক, গাড়ী-ঘোড়াও যায়। অনতিদূরে নির্মিত হয় আরও একটি সেতু, নির্মাণ করেন জি. আই. পি. (কেন্দ্র) রেল। সেই সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করে। মাইল তিনেক দূরে বোরিভিলিতে অনুরূপ একটি সেতু বি. বি. সি. আই. (পশ্চিম) রেল নির্মাণ করেন। সেতুর উপর থেকে সেই সেতুটিও দেখা যায়।

সেতুর উপান্তে এসে আমাদের গাড়ী থামে। সামনে নীল সমুদ্র দক্ষিণে বামে বিস্তৃত। পরপারে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, দিকচক্রবালে গিয়ে মিশেছে। তার অন্তরাল থেকে অরুণদেব অতি ধীরে উদয় হন। তাঁর অঙ্গের লাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে শৈলমালার শীর্ষদেশে, প্রতিফলিত হয় সাগরের বুকেও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ। প্রণাম জানাই দিবাকরকে, জানাই "জবাকুসুম সঙ্কাশংকে।" গাড়ী মন্থরগতিতে চলে— অতিক্রম করে সেতু।

বদলে যায় রাস্তার রূপ। লুকোচুরি খেলে রাস্তায়, পর্বতশ্রেণীতে আর খাড়িতে। বামে সুউচ্চ পশ্চিমঘাটের শৈলশ্রেণী। তার পদতল বেষ্টন করে এগিয়ে চলে পথ। দক্ষিণে প্রশস্ত খাড়ি রূপধারণ করে সমুদ্রের। কখনও

এগিয়ে আসে পর্বত, রুদ্ধ করে পথের গতি। মনে হয়, পরিসমাপ্তি হয় বুঝি পথের, বন্ধ হয় যাত্রা। কখনও দক্ষিণের খাঁড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়। হারিয়ে যায় পথ, তার বক্ষের অভ্যন্তরে, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। পরিসমাপ্তি হয় পথের, বুঝি যাত্রারও। কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় না পথের, রুদ্ধ হয় না তার গতি—চলে পথ ঈষৎ বঙ্কিমগতিতে পাহাড়ের চরণ-ছুঁয়ে আর খাঁড়ির অঙ্গ স্পর্শ করে। দেখি খাঁড়ির বুকেও অসংখ্য ডিঙি, বুকে নিয়ে সাদা পাল। দূর থেকে দেখে মনে হয়, বুঝি অসংখ্য বক শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে বসে আছে। এই ডিঙি-নৌকো করেই জেলেরা মাছ ধরে, বিক্রি করে বোম্বাই শহরে।

কিছুদূর এই রকম পথ অতিক্রম করে আমরা আবার উঁচুতে উঠতে থাকি। পথ চলে এঁকে বেঁকে অরণ্যের ভিতর দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে ঘন মহীরুহের শ্রেণী, তার ছায়া এসে পড়ে রাস্তার উপর, পথ হয় ছায়াশীতল। গাড়ী একটি উঁচু পাহাড়ের সানুদেশে এসে থামে।

এই পাহাড়ের শীর্ষদেশেই—হাজার চারেক ফুট উঁচুতে খাণ্ডালা শহর। নিম্নতম প্রদেশে টাটার জল-বিদ্যুতের কারখানা। সেই বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয় বোম্বাই শহর।

আমরা পাহাড় আরোহণ করতে থাকি, কষ্টসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল এই পর্বত-আরোহণ। পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে সর্পিল গতিতে উঠে রাস্তা উপনীত হয় শীর্ষদেশে। যেমন খাড়া, তেমনই গড়ানে। একটু অসাবধান হলেই পিছলে যাবে চাকা, গড়িয়ে পড়বে মোটর পাহাড়ের গহ্বরে, বিচূর্ণ হবে গাড়ী, সঙ্গে আমাদের দেহও। মাঝপথে এসে রুদ্ধ হয় গাড়ীর গতি। প্রচণ্ড জোরে এক্সিলারেটর চাপা হয়, ঘোরে গাড়ীর চাকা, কিন্তু অগ্রসর হয় না গাড়ী। শেষে গাড়ী থেকে নেমে তিন জনে গায়ের জোরে গাড়ী ঠেলি, আবার গাড়ী চলতে সুরু করে।

উপর থেকে অবিরাম সামরিক ট্রাক আসে, পরিপূর্ণ যুদ্ধের উপকরণে। তারা আসে পুণার নিকটের ডেহু-রোড থেকে। সেখানেই স্থাপিত হয় ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সামরিক ডিপো। উপকরণ নিয়ে যায় বোম্বাইতে। সেখান থেকে প্রেরিত হয় সারা ভারতবর্ষে। নীচে থেকেও সামরিক ট্রাক আসে। অতি সন্তর্পণে, এক পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের যাতায়াতের পথ করে

দিতে হয় । নইলে তাদের সংঘাতে বিচূর্ণ হবে গাড়ী। হবে সকলের প্রাণান্ত। আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় আমাদের অন্তকরণ দুরু দুরু করে।

শেষে উপনীত হই পাহাড়ের শীর্ষদেশে খাণ্ডালা শহরে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। রাস্তার দুপাশে দেখা যায় লাল টালিতে ছাওয়া বাড়ী। তাদের প্রাঙ্গণের উদ্যানে ফুটে আছে কত ডালিয়া, কত গোলাপ। বিভিন্ন তাদের রঙ বিভিন্ন আকার। দেখি আরও অনেক টাইলের বাড়ী, বিক্ষিপ্ত তারা পাহাড়ের অঙ্গে। আমাদের গাড়ী রেস্তোঁরার সামনে এসে থামে।

গাড়ী থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা ও কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে, আবার গাড়ীতে উঠে বসি। সুরু হয় পর্বত অবতরণ। সহজ আর সুন্দর এই অবতরণ। দেখতে দেখতে যাই দুপাশের সবুজ বনানী, দেখি এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। পাহাড় অতিক্রম করে উপনীত হই আবার সমতল রাস্তায়, পৌঁছাই কার্লির রাস্তার সংযোগ-স্থলে। পথের পাশে একটি প্রস্তরফলক দাঁড়িয়ে আছে, নির্দেশক কার্লির রাস্তার।

বামদিকে মোড় নিয়ে মোটর কার্লি চৈত্যের সামনে এসে থামে। গাড়ী থেকে নেমে মন্দিরের সামনে এগিয়ে যাই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি ভারতের এই বৃহত্তম চৈত্যটি। বৃহত্তম বৌদ্ধ উপাসনা মন্দির ভারতের। পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এই চৈত্যটি, বিস্তৃত একশ' চব্বিশ ফুট হয়ে আছে দীর্ঘ এবং সাড়ে ছেচল্লিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। শেষ চৈত্য হীনযান সম্প্রদায়ের, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত হয়, নির্মাণ করেন অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা।

সম্মুখভাগের দুই পাশে, কিছু আগে দাঁড়িয়ে আছে দুইটি অতিকায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু ধ্বজ-স্তম্ভ। তাদের শীর্ষদেশে শোভা পায় চারিটি সিংহের মূর্তি। অনবদ্য গঠন-সৌষ্ঠব এই মূর্তিগুলির। কার্লির চৈত্যের বৈশিষ্ট্য এই স্তম্ভ দুটি। অন্য কোন চৈত্যের সামনে এমন শীর্ষে সিংহ নিয়ে ধ্বজ-স্তম্ভ নাই।

ধ্বজ-স্তম্ভ দুইটির পিছনে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গ কেটে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, উপাসনা মন্দিরের বারান্দা। তোরণের সম্মুখ ভাগে পাথরের পর্দা। দুই ভাগে বিভক্ত তার সম্মুখভাগ। নিম্নাংশে তিনটি দ্বার, উপরাংশে স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ। কিছু কাঠের কাজও ছিল। কালের করালে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই কাঠের কাজ, অবশিষ্ট আছে শুধু চিহ্ন, পর্দার অঙ্গে।

একটি দরজা দিয়ে অলিন্দে প্রবেশ করে, ভিতরের সম্মুখভাগের সামনে উপস্থিত হই। দেখি ভিতরের সম্মুখভাগের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, দেখি সূর্য-গবাক্ষ। দেখি এক সুউচ্চ অর্ধচন্দ্রাকার-খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথ, অধিকার করে আছে সম্মুখভাগের এক বিস্তৃত অংশ। আকৃতি তার ঘোড়ার খুরের মত। তার সঙ্গে ততোধিক সুবিশাল এক অর্ধচন্দ্রাকার সূর্য-গবাক্ষ গ্রথিত হয়ে আছে।

এই মহামহিমময় প্রবেশ-পথের দুই পাশে আর অলিন্দের সঙ্কীর্ণতর প্রান্তদেশে প্রাচীরের গাত্রে ক্ষোদিত আছে কত অনবদ্য খিলানযুক্ত চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের চারিপাশে সূক্ষ্মতম গরাদে। এই গরাদে দিয়ে বেষ্টিত চন্দ্রাতপ।

নিম্নাংশে ক্ষোদিত এক মূর্তি প্যানেলের অঙ্গে। মূর্তি দম্পতির, মন্দিরের দাতার আর তার পত্নীর। মূর্তি বুদ্ধের, সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব। এই বুদ্ধ-মূর্তি পরবর্তী কালে গুপ্তযুগে রচিত। রচনা করেন মহাযান সম্প্রদায়। প্রান্তদেশে দেখি মূর্তি হস্তীর, তারা এই চৈত্যের বাহন। দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর, অর্ধপ্রমাণ আকৃতির হস্তীগুলি, লম্বিত তাদের শুণ্ড, স্পর্শ করে মঞ্চের পৃষ্ঠদেশ। অপরূপ গরাদে দিয়ে শোভিত মঞ্চের সম্মুখভাগও। এই হস্তীর মুখে গজদন্ত ছিল। সেই দন্ত অদৃশ্য হয়েছে। মহিমময়, সুন্দর, শোভন এই মূর্তিসম্ভার, অনুপম চন্দ্রাতপ, নিরুপম গরাদে—তাদের নিখুঁত সমন্বয়। রচনা করেন স্থপতি এক কল্পলোক, এক স্বর্গপুরী, উজাড় করে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মনের সবখানি মাধুরী। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এক অলৌকিক প্রবেশ-পথ, দেখে পরিতৃপ্তি হয় না।

কেন্দ্রস্থলের প্রবেশ-পথ দিয়ে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করি। এই পথ দিয়েই প্রবেশ করতেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত—মহাশ্রমণ আর বোধিসত্ত্বেরাও। অন্য সকলে প্রবেশ করতেন দুই প্রান্তের দ্বার দিয়ে, সোপানের সংলগ্ন জলধারায় পদ প্রক্ষালন করে। পবিত্র করে নিতেন নিজেদের দেহ আর মন, মহাপবিত্র এই মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে। ধুয়ে যেত সংসারের কালিমা, দূর হত মোহ, দূর হত মায়া-মমতা, সুলভ হত মোক্ষলাভ।

ভিতরে প্রবেশ করেও স্তব্ধ হয়ে যাই, মূক হয়ে যাই একেবারে মন্দিরের স্তম্ভের শ্রেণী দেখে, তার মহিমময় সূর্য-গবাক্ষ আর অর্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ।

অষ্টআশী ফুট দীর্ঘ, পঁচিশ ফুট প্রস্থ এই মন্দিরের পরিধি। তার উপর পঞ্চাশ ফুট উঁচু ছাদ।

সাঁইত্রিশটি স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয় মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে, দু'পাশের গলিপথ থেকে। ঘন-সন্নিবিষ্ট এই স্তম্ভের সারি। স্থান নাই ভিতরে দ্বিতীয় স্তম্ভ স্থাপনের। সাতটি স্তম্ভ দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে প্রান্তদেশের বৃত্তাকার স্থান। নাই কোন কারুকার্য এই স্তম্ভগুলির অঙ্গে, নাই তাদের শীর্ষদেশেও। অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন কিন্তু দুই পাশের পনরটি করে স্তম্ভের শ্রেণী। অষ্ট কোণ এই সব স্তম্ভের দণ্ড, দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি এক-একটি বৃত্তাকার পাত্রের মধ্যে। ঘণ্টার আকারে রচিত স্তম্ভের শীর্ষদেশ। শীর্ষদেশে সুউচ্চ চতুষ্কোণ, মঞ্চের উপর আছে দুইটি করে হস্তী। বসে আছে হস্তী হাঁটু গেড়ে। তাদের পৃষ্ঠে একটি নর ও একটি নারী আরোহণ করে আছেন। বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে সজ্জিত এই সব নর আর নারী। তাঁদের শিরে শোভা পায় মূল্যবান শিরোভূষণ। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিভিন্ন তাদের বসবার ভঙ্গীও। তাই সুন্দর, নয়নাভিরাম।

বিপরীত দিকে গলিপথের দিকে মুখ করে সুউচ্চ মঞ্চের উপর অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছেন অনুরূপ নর ও নারী। তাঁরাও বহুমূল্য অলঙ্কারে ও বসনে সজ্জিত। তাঁদের শিরেও শোভা পায় মূল্যবান শিরোভূষণ। প্রতিটি হস্তীর মুখে নাকি গজ অথবা রৌপ্য দন্ত ছিল। ধাতুর তৈরী অশ্বের অঙ্গাবরণও ছিল। নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের করালে।

এই অনবদ্য সুন্দরতম মূর্তি-সম্ভারের শীর্ষদেশে রচিত হয় সুউচ্চ অর্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত মন্দিরের ছাদ। নির্মিত হয় ছাদের অঙ্গে শিরার আকারে উদ্গত সূক্ষ্ম বঙ্কিম কড়ি, এক-একটি পৃথক কাষ্ঠখণ্ড থেকে। খিল দিয়ে ছাদের খাঁজে তারা আবদ্ধ। সমমাপ এই কড়িগুলি, বঙ্কিম হয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে ছাদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পিছনের বৃত্তের কড়িগুলি কেন্দ্রস্থলে এসে মিশেছে। মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে আর স্তূপের চারি পাশে এক অপরূপ রহস্যময় আলোছায়ার সমাবেশ হয়েছে। বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখি স্থপতির এই সুমহান পরিকল্পনা।

পিছনে অর্ধগোলাকৃতি ছাদের নীচে বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে

অর্ধগোলক স্তূপটি, দাঁড়িয়ে আছে বুকে নিয়ে বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি এক মহামহিমময় মূর্তিতে। বৃত্তাকার এই স্তূপটির নিম্নাংশ, বুকে নিয়ে আছে শুধু দুটি রেলের বন্ধনী, তার অঙ্গে অন্য কোন অলঙ্কার ও ভূষণ নাই। শীর্ষদেশে শোভা পায় একটি সুবিশাল অনবদ্য "হারমিকা"। সবার উপরে বিরাজ করে একটি সুউচ্চ সুমহান ছত্র, আকৃতি তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মত।

বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখি চৈত্যের ভিতরের আলোছায়ার সমাবেশ—শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই চৈত্যের, নাই অন্য কোন চৈত্যে। প্রবেশ করে সূর্যের অত্যুজ্জ্বল রশ্মি, তোরণের পর্দার উপরাংশের গবাক্ষগুলির ভিতর দিয়ে তোরণের ভিতরের সম্মুখভাগে। সেখান থেকে সুবিশাল সূর্য-গবাক্ষের কাঠের অসংখ্য ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চৈত্যের অভ্যন্তরে। এই প্রবেশের পথে হারিয়ে ফেলে রশ্মি তার ঔজ্জ্বল্য, প্রশমিত হয় তার প্রাখর্যও। পরিণত হয় এক অলোকসুন্দর, অলৌকিক দীপ্তিতে। ছড়িয়ে পড়ে সেই দীপ্তি একে একে স্তম্ভের শীর্ষদেশে, তার অঙ্গে আর পাদদেশে। বিস্তৃত হয় সারা চৈত্যে। শেষে বর্ষিত হয় সেই দীপ্তি স্তূপের উপর, অলোকসুন্দর হয় স্তূপ, হয় মহামহিমময়। প্রবেশ করে না সেই দীপ্তি ছাদের বঙ্কিম অংশে, গলিপথে আর চৈত্যের অন্তরতম প্রদেশে। অর্ধ-আলোকিত হয় স্তম্ভের শ্রেণী। ছায়াচ্ছন্ন হয় গলিপথ। অন্ধকারে পরিণত হয় অন্তরতম প্রদেশ। রূপ ধারণ করে চৈত্য এক অন্তহীন রহস্যময় নিভৃত নির্জন গুহায় এক মহাপবিত্র শান্তির পরিবেশের। সৃষ্টি করেন বৌদ্ধ স্থপতি—সূর্য-গবাক্ষ পরিচায়ক তাঁর, নির্মাণ-কৌশলের, নিদর্শন তাঁর অগাধ স্থাপত্য জ্ঞানের। তাই এই প্রসিদ্ধি কার্লির চৈত্যের। বুকে নিয়ে আছে চৈত্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের, প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক মহা গৌরবময় কীর্তির। তাই কার্লির স্থপতি, কার্লির ভাস্কর লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। অমর হন কার্লির স্থপতি, অমর হয় কার্লি আর ভারতবর্ষ।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্তূপকে, শ্রদ্ধা জানাই বুদ্ধকে ও স্থপতিকে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, হয় নাই ম্লান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভাজা

ভাজার চৈত্য, ভাজার বিহার

ধীরে ধীরে এসে মোটরে উঠে বসি। আবার মোটর ছাড়ে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি কিছুক্ষণ। কানে ভেসে আসে লক্ষ কোটি পদধ্বনি, পদধ্বনি কত বৌদ্ধ শ্রমণের। তাদের অঙ্গে শোভা পায় হরিদ্রাবর্ণের আলখাল্লা, হস্তে জপের মালা। চরণধ্বনি কত বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীরও। আসেন তাঁরা সারা ভারত থেকে। আসেন সুদূর বিদেশ থেকেও। এই মহাপবিত্র তীর্থে এসে প্রণতি জানান তাঁরা তথাগতকে, জানান বুদ্ধকে। কানে ভেসে আসে লক্ষ শত কণ্ঠের :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

গাড়ী এসে বোম্বাই-পুণা রাস্তায় উপনীত হয়। আবার সুরু হয় রাস্তার দু'পাশে দিগন্তপ্রসারী সবুজ মাঠ। মাঝে মাঝে দেখা যায় আম্রকুঞ্জও। মোটর এক অনুচ্চ শৈলমালার সানুদেশে উপস্থিত হয়। এই পাহাড়ের শীর্ষদেশেই আছে লোনাভেলা। বাস করেন এখানে কত ধনী, কত শ্রেষ্ঠী। একটি ভারতীয় নাবিকদের শিক্ষাকেন্দ্রও আছে। কারুশিক্ষায় শিক্ষিত হয় কাডেটরা সেই শিক্ষাপীঠে।

আমরা অতিক্রম করতে থাকি পাহাড়। রাস্তা যায় সর্পিল গতিতে দুপাশের ঘন সবুজ বনানী আর লতাকুঞ্জ ভেদ করে। উপনীত হয় পাহাড়ের শীর্ষদেশে। মোটর পাহাড়ের শীর্ষদেশে এসে পৌছায়। দু'পাশে দেখা যায় ফুলে ভর্তি প্রাঙ্গণে বেষ্টিত লাল টাইলের বাংলো। সুন্দরতম আর শোভনতর এই বাংলোগুলি সুপরিকল্পিতও। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নয় খাণ্ডালার বাংলোর মত। দেখতে দেখতে যাই বাংলোর সৌন্দর্য আর তার প্রাঙ্গণের ফুলের বর্ণবিন্যাস। গাড়ী একটি হোটেলের সামনে এসে থামে।

গাড়ী থেকে নেমে স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিই। তার পর বিশুদ্ধ নিরামিষ মহারাষ্ট্রীয় খানা খেতে বসি। বসতে হয় কম্বলের আসনে সামনে নিয়ে একটি কাষ্ঠাসন। সেই আসনের উপর থালা রেখে অর্ধেক ভাত ও অর্ধেক রুটি, একটু ঘি, ডাল ও তরকারি আহার করি। কিছু দহি বড়াও। বিশেষ পার্থক্য নাই মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটি খানায়—উভয়েই নিরামিষাশী। তাই বোম্বাই শহরে গুজরাটীর বাড়ীতে, মাছমাংস ও ডিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনকি ভাড়াটেদের বেলায়ও। তাই ভাড়া নেওয়ার আগেই তাদের মাছমাংস ও ডিম না খাওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। ব্যতিক্রম শুধু পার্শীরা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছোটে। অল্পক্ষণ পরেই আমরা শৈলমালা অতিক্রম করে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, এক লীলানিকেতনে এসে উপনীত হই। এপারে ঘন নীল শৈলমালা বুকে নিয়ে গাঢ় সবুজ বনানী আর লতাকুঞ্জ। ওপারে সবুজ ক্ষেত দিগবলয়ে গিয়ে মেশে। মাঝখানে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী বয়ে যায় শৈলমালার পদপ্রান্ত স্পর্শ করে। শোনা যায় তার মৃদু গুঞ্জন, কানে ভেসে আসে তার অন্তরের ধ্বনিও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এই সুন্দরতম রূপ, এই অপরূপ শোভা। গাড়ী মালভিলিতে এসে পৌঁছায়। এখান থেকেই ভাজার গুহামন্দিরে যেতে হয়। এখানে একটি রেল ষ্টেশনও আছে। রেলে করেও বোম্বাই অথবা পুণা থেকে যাওয়া যায়।

মোটর থেকে নেমে, মাইলখানেক উঁচু নীচু রাস্তা অতিক্রম করি। দূর থেকেই দেখতে পাই দিগন্তবিস্তৃত পশ্চিমঘাট শৈলমালার বুকে দাঁড়িয়ে আছে ভাজার চৈত্য, দেখি কয়েকটি বিহারও—প্রকৃতির এক রমণীয় পরিবেশ। ধীরে ধীরে চৈত্যের সামনে এসে উপস্থিত হই।

এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকের প্রাচীনতম চৈত্য, অন্যতম প্রাচীনতম বৌদ্ধ চৈত্য, উপাসনা মন্দির বৌদ্ধদের। এই চৈত্যটি সতরটি বিহার সঙ্গে নিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়। বৌদ্ধ স্ত্রী-শ্রমণদের পূজা ও বাসের জন্য শুঙ্গ রাজারা নির্মাণ করেন। এই চৈত্যটি বুকে নিয়ে আছে প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির, সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের।

চৈত্যের সম্মুখভাগের চিহ্ন নাই, নাই প্রবেশপথেরও। নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের করালে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি সুবিশাল খিলানযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকার চন্দ্রাতপ। তার ভিতর দিয়ে মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশ দেখা যায়। কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল চৈত্যের সম্মুখ ভাগ, পূর্ণ ছিল সম্মুখের শূন্য স্থান অপরূপ কাঠের কাজে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে সেই কাজ কালের নির্মম হস্তে, নাই কিছুই অবশিষ্ট।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে চৈত্যটি পঞ্চান্ন ফুট দীর্ঘ ও ছাব্বিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ এই চৈত্যের ভিতরের দুপাশের গলিপথ। দেখি সুন্দর স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক করা হয়েছে তার কেন্দ্রস্থল গলিপথ থেকে। ক্রমান্বয়ে নীচু হয়ে নেমে যায় স্তম্ভগুলি, ক্ষীয়মাণ হয় তাদের উচ্চতা যত যায় ভিতরে। স্তম্ভের উপর উনত্রিশ ফুট উঁচু আড়ম্বরপূর্ণ অর্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ। ছাদের অঙ্গে শোভা পায় ঘন সন্নিবিষ্ট শিরার আকারে কড়ি, নির্মিত কাঠ দিয়ে।

মন্দিরের প্রান্তদেশে বৃত্তাকার স্থানের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে স্তূপটি। বুকে নিয়ে আছে বুদ্ধের স্মৃতির প্রতীক। দুই অংশে বিভক্ত এই স্তূপটি বৃত্তাকার তার তলদেশ। গম্বুজের আকারে রচিত তার অঙ্গ, শীর্ষে শোভা পায় একটি অনুপম গরাদে (রেল)। সবার উপরে বিরাজ করে একটি ছত্র। কাঠ দিয়ে রচিত এই স্তূপের শীর্ষদেশের হারমিকা। উপরের ছত্র কাঠ দিয়েই নির্মিত। খুব সম্ভব এই স্তূপের এবং চৈত্যের ভিতরে ও প্রাচীরের গাত্রে অনবদ্য সুন্দরতম চিত্র-সম্ভার ছিল। অদৃশ্য হয়েছে সেই চিত্র-সম্ভার।

চৈত্য দেখে আমরা একে একে বিহারগুলি দেখি। উপনীত হই দক্ষিণ প্রান্তের শেষে গুহামন্দিরে। একটি বিহার—এই গুহামন্দিরটি সমসাময়িক ভাজার চৈত্যের। এই বিহারে একটি স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত কক্ষ আছে—তার সামনে একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। সম্মুখভাগের প্রাচীরগাত্রে দুইটি প্রবেশ-পথ। এক-একটি প্রবেশ-পথ দিয়ে প্রকোষ্ঠগুলি কক্ষ বা সভাগৃহের সঙ্গে সংযুক্ত।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গ কেটে রচিত হয় অলিন্দের খিলান-যুক্ত ছাদ।

তার দুই প্রান্তে ত্রিকোণাগ্র প্রাচীর। রচিত হয় ভিতরের সমতল প্রাচীরও অঙ্গে নিয়ে কার্নিশ। দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড স্তূপও বাহনের উপর। পশ্চিম প্রান্তে স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে অলিন্দ থেকে তিনটি প্রকোষ্ঠকে পৃথক করা হয়। রচিত হয় কার্নিশের নীচেও মূর্তির সারি দিয়ে সুন্দরতম পাড়। অনবদ্য এই মূর্তি সম্ভার—দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। পদ্মের আকারে রচিত স্তম্ভের শীর্ষদেশ, তার উপরে নারী-সিংহীর মূর্তি। গো-জাতীয় তাদের দেহ, নারীর বক্ষ। দেখি ধ্বংসে পরিণত হয়েছে বারান্দার বাইরের সূক্ষ্ম শোভন স্তম্ভগুলি। দেখি অলিন্দের প্রাচীরের প্রশস্ত কুলুঙ্গির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি অতিকায় মূর্তি, সজ্জিত তারা অস্ত্রশস্ত্রে।

অলিন্দের পূর্ব প্রান্তে ও প্রাচীরের গাত্রে দেখি দুইটি অপরূপ মূর্তিসম্ভার, পৃথক হয়ে আছে তারা একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের প্রবেশ পথ দিয়ে।

বামে দেখি রথের উপর উপবিষ্ট এক নৃপতি। পরিচালিত সেই রথ চারিটি অশ্বে। নৃপতির দুই পাশে দুইটি রূপবতী নারী বসে আছেন। তাঁদের একজনের হস্তে শোভা পায় ছত্র। অপর জন হাতে ধরে আছেন চামর। তাঁদের পিছনে, অশ্বপৃষ্ঠে আসছেন রক্ষীর দল। আছেন তাদের মধ্যে একটি নারীও তাঁর অশ্বের পৃষ্ঠে শোভা পায় একটি জিন্ সঙ্গে নিয়ে পাদান। এইটিই প্রাচীনতম জিন ভারতীয় স্থাপত্যে। অশ্বের পৃষ্ঠে জিন ভারতীয় স্থপতি এর আগে রচনা করেন নি। অশ্বের পদতল একটি বিকটদর্শনা, বিকৃতবদনা, বীভৎস নারী-দানবের পৃষ্ঠের উপর স্থাপিত। মহাশূন্যে উড়ে যায় সেই নারী দানব। যান তপনদেব চারিঅশ্ব চালিত রথ-আরোহণে, সঙ্গে নিয়ে যান দুই রাণী। যান অন্ধকারকে বিতাড়িত করতে। উদয় হন দিবাকর পৃথিবীতে, দূর হয় তমিস্রা, আলোকিত হয় জগৎ। মূক হয়ে যাই দেখে ভাস্করের এই অপরূপ সৃষ্টি। এক অমর মহিমময় কীর্তি।

তার দক্ষিণে দেখি এক বৃহৎ হস্তীপৃষ্ঠে বসে আছেন এক মহামহিমময় নৃপতি। বসে আছেন তাঁর পশ্চাতে একজন অনুচর, হস্তে নিয়ে এক সুউচ্চ ধ্বজা। রাজা একটি গ্রাম্য পথ দিয়ে অগ্রসর হন। শুণ্ডে ধরে আছে হস্তী একটি সুবিশাল উৎপাটিত বৃক্ষ। রাজা নিজেই হস্তী চালনা করেন, কোন মাহুত নেই। অনুচরের হস্তের বিচিত্র ধ্বজাও বিস্তৃত হয়ে আছে ত্রিশূলের

আকারে। শোভা পায় অনুচরের কণ্ঠে এক বিচিত্র কণ্ঠভূষণ, কটিদেশে মালকোঁচা দিয়ে আবদ্ধ তার অঙ্গের বসন। শোভা পায় রাজার শিরেও বহুমূল্য শিরোভূষণ, হস্তে বজ্র। তাঁরা বসে আছেন একটি মূল্যবান আসনের উপর। আসন দিয়ে সম্পূর্ণ আবৃত হস্তীর পৃষ্ঠদেশ। উৎপাটিত বৃক্ষের নীচে নিষ্পিষ্ট কত অসংখ্য নর-নারী, মর্দিত হয়ে আছে ভূতলে। নাই তাদের দেহে প্রাণ, হয়েছে বিগত প্রাণ বৃক্ষের সংঘাতে। ঐরাবত আরোহণে যান দেবরাজ ইন্দ্র। অধিকর্তা তিনি বৃষ্টির, মহাশক্তিশালী, তাঁর প্রবল প্রতাপে কাঁপে ত্রিভুবন, কম্পিত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। মেঘের বাহনে যান মারুতি সখা পুরন্দর, সঙ্গে নিয়ে বজ্র আর বিদ্যুৎ। রুদ্র মূর্তিতে আসে ঝড়, আসে প্রভঞ্জন তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে ডমরু বাজাতে বাজাতে। আসে অশনি, আসে ঘোর ঘন গর্জনে। কম্পিত হয় দামিনী, বিরামহীন সেই কম্পন, উদ্ভাসিত হয় দিগন্ত। হয় বুঝি মহা প্রলয়, লুপ্ত হয় সৃষ্টি। নাই কোন ঝড়ের চিহ্ন দৃশ্যের বাকী অংশে, বিরাজ করে সেখানে মহাশান্তি।

দেখি নিষ্পিষ্ট নর নারীর নীচে একটি পবিত্র বৃক্ষ, বেষ্টিত হয়ে আছে একটি বেদী দিয়ে। এই পবিত্র বৃক্ষের উপরে তিনটি নর ও নারী ঝুলছে। ঝুলছে আরও তিনটি নর ও নারী নীচের অনুরূপ একটি পবিত্র বৃক্ষের উপর। শোভা পায় দুইটি ছত্র, দুইটি পবিত্র বৃক্ষের উপর। খুব সম্ভব তারা দেবতার পায়ে আত্মোৎসর্গের প্রতীক। প্রশমিত হয় দেবতার ক্রোধ, ফিরে আসে মহাশান্তি পৃথিবীতে।

তার নীচে, দক্ষিণে রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে একটি রাজসভা। ভদ্রাসনে রাজা বসে আছেন। তাঁর মস্তকের উপর শোভা পায় একটি রাজছত্র। তাঁর দুই পাশে, হস্তে চামর নিয়ে দুই অনুচর বসে আছেন। রাজার সামনে নর্তক, নর্তকী ও বাদ্যকরের দল, দক্ষিণে একটি চৈত্য বৃক্ষ। বৃক্ষের কণ্ঠে শোভা পায় মালা, মস্তকে ছত্র। বেষ্টিত হয়ে আছে বৃক্ষটি একটি রেল দিয়ে।

তার দক্ষিণে, একেবারে প্রান্তদেশে দেখি একটি অরণ্যের দৃশ্য। আছে সেই অরণ্যে একজন নর, সজ্জিত অস্ত্রশস্ত্রে। আছে একটি অশ্বমস্তকা অপ্সরাও। সজ্জিতা অপ্সরা বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে, তার শিরে শোভা

পায় একটি মূল্যবান শিরোভূষণ। অনুরূপ ভারহুতের অপ্সরাটি, কিন্তু অধিকতর মূল্যবান বসনে আর ভূষণে সজ্জিতা। পদ কুশল মানব জাতকে বর্ণিত যক্ষিণী অশ্বমুখী এই অপ্সরা বাস করেন গহন অরণ্যে এক পর্বতের পাদদেশে। নিরাপদ নয় তাঁর ভয়ে পথিকের পথ চলা, ভীতিপ্রদও। তিনি তাদের ভুলিয়ে নিয়ে যান গভীর অরণ্যের অন্তরতম প্রদেশে। তার পর তাদের হত্যা করে উদরস্থ করেন। রচিত হয় অনুরূপ অপ্সরার মূর্তি, সাঁচীর গরাদের অঙ্গের পদকের গাত্রে, বুদ্ধগয়ার রেলের অঙ্গে আর পাটলীপুত্রের গরাদের অঙ্গে।

দেখি ভারতের প্রাচীনতম প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাচীরের গাত্রে ক্ষোদিত। স্থপতির মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত এই দৃশ্যটি, পরিচায়ক তাঁর প্রভূত প্রকৃতি-জ্ঞানের, নিবদ্ধ নয় শুধু প্রকৃতির অধ্যয়নে। এই চিত্রে বস্তুর ভীড় নাই, নাই উপর্যুপরি সন্নিবেশও। তাই অনবদ্য সুন্দরতম এই দৃশ্য।

প্রবেশ-পথ দিয়ে বিহারের ভিতরের সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি সভাগৃহের পূর্বপ্রান্তে প্রাচীরের গাত্রেও বৃহৎ কুলুঙ্গির ভিতর পাঁচটি সশস্ত্র নর। অনুরূপ অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রের মূর্তির এই মূর্তিগুলি, বীরত্বব্যঞ্জক, মহিমময়। দেখি এক অপরূপ নৃত্যপরায়ণা দম্পতিও। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগের নৃত্যপরায়ণা দম্পতির—প্রতীক এই দম্পতি এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগের। দেখি বিস্ময়ে মূক হয়ে। দেখি রাজার মূর্তিও।

বেরিয়ে এসে আর একবার দেখি অলিন্দের মূর্তিগুলি। অনবদ্য এই মূর্তিগুলি, রচিত হয় নাই তারা আধ্যাত্মিক মহিমা প্রচারের জন্য, নয় তারা নীতির প্রতীকও। বাস্তব তারা। রচনা করেন তাদের ভাস্কর, সমৃদ্ধশালী করেন মিশিয়ে দিয়ে মনের সমস্ত মাধুরী, মহিমান্বিত করেন কল্পনায়। অপূর্ব এই শিল্পসম্ভার। আবার কোথাও দেখি, চিত্রগুলি বৈদিক কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। বেদের সঙ্গীতের অনুসরণে আর প্রকৃতির শক্তির সহায়তায় মানবের চিরন্তন কাহিনী তাতে আছে, আছে তার সুখ দুঃখের ইতিহাসের। মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি সেই ইতিহাস। তাই তারা অনাদি, অনন্ত, প্রাচীনতম বুদ্ধযুগেরও। রচিত হন রাজা, হয় রাজসভা, নিয়ে নর্তক

আর নর্তকীর দল। যান রাজা অশ্ব বাহনে, হস্তী আরোহণেও যান। নিষ্পিষ্ট হয় কত নর-নারী, মর্দিত হয় ভূতলে। আসে মেঘের বাহনে রুদ্রমূর্তিতে ঝড়, আসে প্রভঞ্জন, তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে, বিলুপ্ত হয় সৃষ্টি। আছে মহা অরণ্যও নিয়ে তার ব্যাঘ্র-ভীতি।

সৃষ্টি হয় বিহারের প্রাচীরে প্রস্তরের অঙ্গে এক রহস্যলোক। অনবদ্য, তুলনাহীন, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যজ্ঞানের, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য জ্ঞানেরও। রচিত হয় নাই এই রহস্যলোক ভারহুতে, হয় নাই সাঁচীতেও, রচনা করেন নাই সেখানে ভাস্কর মনের সমস্ত মাধুরী উজাড় করে দিয়ে। বৈশিষ্ট্য শুধু ভাজার বিহারের। তাই তার প্রাচীরের অঙ্গের মূর্তিসম্ভার লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন—বিশ্বের ভাস্কর্যের দরবারে। হয় বিশ্বজিৎ। তাই অমর হন ভাজার স্থপতি আর ভাস্কর, অমর হয় ভাজা—মহাসৌভাগ্যশালী হয় ভারত।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা জানাই সুঙ্গ রাজাদেরও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি—যা উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে, চিররাত্রি, চিরদিন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদিশা

বিদিশার চৈত্য

ধীরে ধীরে মোটর অভিমুখে রওনা হই। চোখের সামনে ভাসতে থাকে ভাজার বিহারের প্রাচীরের অঙ্গের দৃশ্যাবলী। ভেসে ওঠে চৈত্যের সম্মুখভাগ ও তার লুপ্ত গৌরবের এক মহিমময় ইতিহাস। জানতেও পারি না কখন মোটরে উঠে বসি আর মোটর ছাড়ে। সম্বিৎ ফিরে আসে একটা বিরাট ঝাঁকানি দিয়ে মোটর থেমে যাওয়ায়। রুদ্ধ হয় মোটরের গতি। দেখি, সামনে প্রসারিত উঁচু-নীচু পাহাড়ের রাস্তা। সম্ভব নয় মোটরের এমন অমসৃণ পথে চলা। তাই মোটর থেকে নেমে পদব্রজে অগ্রসর হই। প্রায় চার মাইল পদব্রজে অতিক্রম করলে বিদিশায় গিয়ে পৌঁছাব। দর্শন হবে তার প্রসিদ্ধ চৈত্য। বিদিশার চৈত্য দেখে, ফিরে এসে আবার পুণায় পৌঁছাতে হবে। তবেই আজকের যাত্রার পরিসমাপ্তি হবে।

উঁচু-নীচু অমসৃণ পাহাড়ের রাস্তা, দুর্গমও, সহজ নয় পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা, নয় সুন্দরও। তবুও সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়—লঙ্ঘন করে সমস্ত বিঘ্ন।

ডাঃ সান্যাল ত রেগেই আগুন। তিনি মোটরবিহারী, অধিকারী মোটরের, অভ্যস্ত নন পায়ে হেঁটে চলার। সুখী মনেও ভব্য, শান্ত। অসন্তোষের ছাপ ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। কর্মঠ, উদ্যমশীল সরকার মহাশয়, বয়সেও নবীনতম, আগে আগে চলেন। ভ্রূক্ষেপ নাই তার রাস্তার অমসৃণতায়, মানে না সে কোন বাধা। অগ্রসর হয় বীরদর্পে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। আমিও কষ্ট অনুভব করি। অনভ্যস্ত আমিও এই রকম পথ চলায়। কিন্তু আমারই উদ্যোগে আর ইচ্ছায় বিদিশায় যাওয়া। তাই শোভন নয় আমার পক্ষে কোন অনুযোগ করা, রুদ্ধ অভিযোগের পথও, চলতে হয় হাসিমুখেই। নীরবে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হয় এই দুর্গম পথ অতিক্রম করার সমস্ত গ্লানি। বাদ-প্রতিবাদের কলরোলে সমস্ত রাস্তা মুখরিত করে সকল বাধা-বিঘ্ন

অতিক্রম করে অবশেষে আমরা বিদিশার গুহামন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। তখন তপনদেব পশ্চিম গগনে এগিয়ে আসেন, ম্লান হয়ে আসে তাঁর তেজ, প্রশমিত হয় দীপ্তি।

নির্মিত হয় এই চৈত্যটি খ্রীষ্টের জন্মের একশ' পঁচাত্তর বছর পূর্বে। সুঙ্গ রাজারাই নির্মাণ করেন। প্রাচীনতর কার্লির চৈত্যের অপেক্ষা—বুকে নিয়ে আছে এই চৈত্যটি অনবদ্য শিল্পসম্ভার, নিদর্শন প্রকৃষ্টতম আর সুন্দরতম বৌদ্ধ চৈত্যের, এক সুন্দরতম সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির।

ধীরে ধীরে চৈত্যের সামনে এগিয়ে আসি। দেখি, বিভিন্ন এই চৈত্যের সম্মুখভাগের পরিকল্পনা, পৃথক নির্মাণ-কৌশলও। ভাজার চৈত্যের সম্মুখভাগের সঙ্গে মেলে না। অনুরূপ নয় কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগেরও।

পশ্চিমঘাটের শৈলমালার অঙ্গ কেটে নির্মিত হয় চৈত্যের সম্মুখভাগ, একটি অলিন্দ, পেছনে তার অর্ধ-গোলাকৃতি পর্দা। রচিত হয় অলিন্দে চারিটি পঁচিশ ফুট উঁচু অপরূপ সুষ্ঠু-গঠন স্তম্ভ, স্তম্ভের দুই পাশে উদ্গত স্তম্ভের বেষ্টনী। অনুরূপ এই স্তম্ভগুলি প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের নির্মিত স্তম্ভের, শীর্ষে নিয়ে আছে ঘণ্টা, ঘণ্টার অঙ্গে শিরা। ঘণ্টার শীর্ষদেশে শোভা পায় চতুষ্কোণ আসন। চারিটি থাকে বিভক্ত এই আসন—আসনের উপর তিনটি মূর্তি, মূর্তি অশ্বের, হস্তীর আর ষণ্ডের। প্রতিটি অশ্ব ও হস্তীর পৃষ্ঠে বসে আছে একজন নর সঙ্গে নিয়ে একটি নারী। বিস্তৃত তাদের পদযুগল। সজ্জিত তারা বহুমূল্য বসনে, ভূষিত মূল্যবান ভূষণেও। অনবদ্য, জীবন্ত, সুষ্ঠু-গঠন এই মূর্তিগুলি। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের ভিতরের স্তম্ভের শীর্ষদেশের মূর্তির, পড়ে সমপর্যায়েও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে বৌদ্ধ স্থপতির এক সুন্দরতম সৃষ্টি, রচিত হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে। তাই মহিমময়; সুন্দরতম, পরিচায়ক তাঁদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-জ্ঞানের। অশোকের স্তম্ভের উন্নততর সংস্করণ এই স্তম্ভগুলি। কিন্তু বিভিন্ন এই স্তম্ভগুলির দণ্ডের আকৃতি। অষ্টকোণ, বৃত্তাকার নয় অশোকের স্তম্ভদণ্ডের মত। বিভিন্ন পাদদেশের গঠনও, রচিত হয় বৃত্তাকার পাত্রের আকারে। নাই এই পাত্রের আকার অশোকের স্তম্ভের পাদদেশে। রচনা করেন স্থপতি স্তম্ভের শীর্ষদেশের মূর্তির উপর অলিন্দের

ছাদ। তার অঙ্গেও কাঠের তৈরী শিরার আকারে কড়ি, নির্মিত মন্দিরের ভিতরের ছাদের অনুকরণে।

স্তম্ভের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হয় দুইটি খিলানযুক্ত মন্দিরের প্রবেশপথ, অর্ধচন্দ্রাকৃতি তাদের শীর্ষদেশ। তার উপরে রেল। অলিন্দের শীর্ষদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি সূর্য-গবাক্ষ। অনুরূপ প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশের—আকৃতিতে ও গঠনপ্রণালীতে। সবার উপরে শোভা পায় একটি অলিন্দ, অঙ্গে নিয়ে অনুপম, সুন্দরতম রেল, শীর্ষে নিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি সূর্য-গবাক্ষ—অনুরূপ প্রথম সূর্য-গবাক্ষের আকৃতিতে ও গঠনে। দেখি স্তব্ধ হয়ে সম্মুখভাগের এই মহিমময় পরিকল্পনা, আর তার অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপদান। দেখি বৌদ্ধ স্থপতির এক সুন্দরতম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগের। শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

চৈত্যের ভিতরের সভাগৃহে প্রবেশ করি। পরিধি তার সাড়ে পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ, একশ' ফুট প্রস্থ। ক্ষুদ্রতর কার্লির চৈত্যের সভাগৃহের তুলনায়। দশ ফুট উঁচু স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক করা হয় তার কেন্দ্রস্থলকে তিন দিকের গলিপথ থেকে। অষ্টকোণ এই স্তম্ভগুলি, দাঁড়িয়ে আছে দণ্ডের আকারে। নাই তাদের শীর্ষদেশে কোন শিল্পসম্ভার। বৃত্তাকার নয় তাদের পাদদেশও। বুকে নিয়ে আছে কয়েকটি স্তম্ভ শুধু বুদ্ধের প্রতীক।

রচিত হয় স্তম্ভের শীর্ষদেশে অর্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত অপরূপ ছাদ, তার অঙ্গেও ঘন-সন্নিবিষ্ট কাঠের সমকেন্দ্রিক কড়ি, রচিত শিরার আকারে। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের ছাদের, মহিমময় পরিকল্পনায় আর সুন্দরতম রূপদানে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

চৈত্যের প্রান্ততম প্রদেশে বৃত্তাংশের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে অর্ধগোলক স্তূপ—মহিমময়। অঙ্গে নিয়ে আছে দুইটি স্তর, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা আর ছত্র। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের গঠনে। কিন্তু সুন্দরতর ও শোভনতর এই স্তূপটি। নাই রেল এই স্তূপের অঙ্গে, নাই অন্য কোন ভূষণও। চিত্র-সম্ভারে শোভিত ছিল এই স্তূপের অঙ্গ। ছিল প্রাচীরের গাত্র আর স্তম্ভের অঙ্গও। নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই চিত্রসম্ভার কালের করালে, নাই কিছু অবশিষ্ট।

মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখি এই মহামহিমময় স্তূপ, ভক্তিভরে প্রণতি জানাই বুদ্ধকে, জানাই তথাগতকে। আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অপরূপ দৃশ্য, দৃশ্য এক পূর্ব গৌরবের।

দু'হাজার বছর আগে, খ্রীষ্টের জন্মের শত বৎসর পূর্বে প্রবল হয় বৌদ্ধধর্ম ভারতে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি আর বৌদ্ধ কৃষ্টি উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। নির্মিত হয় চৈত্য, বৌদ্ধ-ধর্ম-মন্দির বুকে নিয়ে স্তূপ বা দাগোবা, বুদ্ধের স্মৃতির প্রতীক, পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গ কেটে ভাজাতে, বিদিশাতে, কার্লিতে, নাসিকে আর কনড়নে। হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তাতেও। বাস করেন এই সব স্থানে কত শত বৌদ্ধ শ্রমণ। তাঁদের অঙ্গে শোভা পায় হরিদ্রা আর ঘন পীতবর্ণের বসন, বিস্তৃত পা পর্যন্ত। কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। ছড়িয়ে পড়ে সেই পুণ্যধ্বনি দিকে দিকে। মুখরিত হয় দিগন্ত।

অবসান হয় রাত্রি। ঘুম ভাঙে তাঁদের পাখীর কাকলিতে। প্রাতঃকৃত্য সেরে তাঁরা সজ্জিত হন পীত বসনে। যাজকের নির্দেশে নিনাদিত হয় ঢক্কা, নির্দেশক পূজার সময়ের। চৈত্যের সামনে বসে বাদকেরা সেই ঢাক বাজান। প্রতিধ্বনিত হয় তার আওয়াজ নিভৃত-নির্জন পর্বত-কন্দরে, হয় গিরিগুহায় আর শৈল শিখরে—ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। পৌঁছায় বিহারে অধিষ্ঠিত শ্রমণদের কানেও। নিদ্রাভঙ্গে পূজার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। আসেন নগ্নপদে বৌদ্ধ পুরোহিত আর ধর্মযাজকও। ভূষিত তাঁরাও পীত বসনে—তাঁদের হস্তে শোভা পায় পূজার উপচার। পুষ্পপাত্রে সজ্জিত কত বিভিন্ন ফুল আর ফল, কত বিচিত্র সুগন্ধি। একে একে চৈত্যের সম্মুখের প্রাঙ্গণে আর অলিন্দে এসে সমবেত হন। পরিপূর্ণ হয় প্রাঙ্গণ আর অলিন্দ ধূপের সৌগন্ধে। সমাচ্ছন্ন হয় সুগন্ধি ধোঁয়ায়।

আবার নিনাদিত হয় ঢক্কা—তাঁরা পূজার উপচার হস্তে নিয়ে, শোভাযাত্রায় মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ধীরে ধীরে গলি পথ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। অবনত তাঁদের মস্তক—শব্দহীন তাঁদের পদক্ষেপ। তাঁদের হস্তের সুগন্ধি ধোঁয়া স্পর্শ করে মন্দিরের ছাদ। সুগন্ধে আমোদিত হয় গলিপথ—পরিপূর্ণ হয় সারা সভাগৃহ।

গলিপথ অতিক্রম করে মহা পবিত্র স্তূপকে বেষ্টন করে তাঁরা উপনীত হন সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে। নামিয়ে দিয়ে আসেন পূজার উপচার প্রধান পুরোহিতের হাতে। তিনি বসে থাকেন স্তূপের সামনে সভাগৃহের দক্ষিণ

পাশে সুউচ্চ কাঠের সিংহাসনে। বহুমূল্য আবরণে আচ্ছাদিত সেই সিংহাসন।

স্থাপিত হয় মূল্যবান আসনও প্রতিটি স্তম্ভের পাদদেশে। বিভিন্ন তাদের বর্ণ, বিচিত্র তাদের অঙ্গের শিল্পসম্ভার। উপবেশন করেন তাঁরা একে একে সেই সব আসনে। নিবদ্ধ থাকে তাঁদের দৃষ্টি মহা পবিত্র স্তূপে।

সুরু হয় স্তূপের পূজা, বুদ্ধের প্রতীকের, পূজা বুদ্ধের। পূজা করেন প্রধান পুরোহিত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মন্ত্র। ধ্বনিত হয় বুদ্ধের বাণী—বাণী অহিংসার, বাণী সাম্যের আর শান্তির। বাণী মোক্ষলাভের উপায়েরও। তার সঙ্গে বাজে ভেরী, শিঙ্গাও বাজে। বাদকেরা বাজান, সভাগৃহের এক প্রান্তে বসে। পূজিত হন তথাগত।

সুউচ্চ, সুন্দরতম আবরণে ভূষিত সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রধান পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠের সুগম্ভীর, সুউচ্চ মন্ত্রোচ্চারণ, সুললিত ভাষণ আর সুমধুর সঙ্গীত। ভেরীর নিনাদ আর শিঙ্গার আওয়াজ। মূল্যবান বিচিত্র কারুকার্য-সমন্বিত আসনে উপবিষ্ট পীতবসনে ভূষিত শ্রমণের দল। প্রাচীরের গাত্রের আর স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প ও মূর্তিসম্ভার। মন্দিরের ভিতরের আলোছায়ার সমাবেশ। সৃষ্টি করে এক অলৌকিক, অলোকসুন্দর পরিবেশ, এক রহস্যময় স্বপ্নপুরী, এক কল্পলোক।

পুনরাবৃত্তি হয় এই অনুষ্ঠানের সন্ধ্যাবেলাতেও, দেব দিবাকর যখন যান অস্তাচলে, পাখীর কূজনে মুখরিত হয় যখন শৈল-শিখর। হয় প্রতি সকাল সন্ধ্যায়। হয় দীর্ঘ সহস্র বৎসর। মহাতীর্থে পরিণত হয় এই সব স্থান।

আসে নবম আর দশম শতাব্দী। প্রবলতম হন হিন্দু ভারতে। হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। প্রবলতর হয় জৈনধর্মও। ক্ষীণ বল হয় বৌদ্ধধর্ম, হন ভারতের বৌদ্ধেরাও। তাঁরা পরিত্যাগ করেন ভারতবর্ষ। যান তিব্বতে, সিংহলে, ব্রহ্মদেশে। যান যবদ্বীপে, সুমাত্রায় আর মালয়েও। সঙ্গে নিয়ে যান বৌদ্ধ স্থপতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৌদ্ধ কৃষ্টি। গড়ে ওঠে স্তূপ, চৈত্য আর বিহার সেই সব দেশে, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন।

পরিত্যক্ত হয় ভারতের স্তূপ, চৈত্য আর বিহার বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার। অঙ্গে নিয়ে কত বহুশত বৎসরের

স্থপতির আর ভাস্করের সাধনার দান, কত অমূল্য সম্পদ কত অলৌকিক কাহিনী, কাহিনী জাতকের, বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর আর হিন্দু দেব-দেবীরও। পরিত্যাগ করে যান পীতবসনে ভূষিত শ্রমণেরা, বৌদ্ধ পুরোহিত আর ধর্ম-যাজকেরা। তীর্থ দর্শনে আসেন না কোন বৌদ্ধ যাত্রী। শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় এই সব স্থান। পরিণত হয় মহা-অরণ্যে, বাসস্থান হিংস্র শ্বাপদের, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক ও আরও কত জানোয়ারের। বাসস্থান কত ভয়াল ময়াল আর অজগরেরও। শেষে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। চলে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আবার আসে আবিষ্কারের প্রেরণা। আবিষ্কৃত হয় তারা একে একে। ফিরে পায় তারা লুপ্ত গৌরব। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও চিত্রশিল্পের দরবারে। ছড়িয়ে পড়ে তাদের অঙ্গের অনুপম, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভারের বার্তা—তাদের প্রাচীরের গাত্রের আর স্তম্ভের অঙ্গের ও শীর্ষদেশের অনবদ্য শোভন-গঠন, মহামহিমময় জীবন্ত মূর্তি-সম্ভারের আর তুলনাহীন চিত্র-সম্ভারের। বার্তা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের। ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। আসে দলে দলে যাত্রী, আসে সুদূর বিদেশ থেকেও। নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি। ডালি উজাড় করে দিয়ে যায়।

আমরাও শ্রদ্ধা জানাই ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থপতিকে আর ভাস্করকে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয় নি ম্লান, আছে অক্ষয় হয়ে।

গভীর রাত্রিতে উপনীত হই পুণায়। পরিসমাপ্তি হয় যাত্রার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কানেরি

১। কানেরির চৈত্য ২। কানেরির বিহার

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। বন্ধুবর ভাণ্ডারী বেড়াতে এসেছেন আমাদের মাতুঙ্গার বাসায়। শুনি, আছে নাকি কানেরিতে শতাধিক গুহামন্দির। আছে বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার। বোম্বাই থেকে উনিশ মাইল দূরে বি. বি. সি. আই. (অধুনা পশ্চিম) রেলে বোরিভিলি স্টেশন। সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে কানেরির গুহামন্দির। যেতে হয় পদব্রজে।

স্থির হয় আগামী রবিবারে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে কানেরি অভিমুখে রওনা হওয়া যাবে। বন্ধুবর সঙ্গী হবেন। আর যাবেন আমার গৃহিণী আর কন্যা। সঙ্গী হবে আমার তিন পুত্রও। তারা তখন বোম্বাইতে গ্রীষ্মের অবকাশ যাপন করছে।

রবিবারে খাওয়া-দাওয়া করে দুই টিফিন-ক্যারিয়ারে লুচি, আলুর দম ও ডিম-সেদ্ধ ভরে নিয়ে মাতুঙ্গা থেকে ট্রেনে করে সকলে ভি. টি. অভিমুখে রওনা হই। ভি. টিতে নেমে বাসে করে চার্চগেট স্টেশন। সেখানে একটি দ্রুতগামী ট্রেনে চেপে বসি। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়ে।

মেরিন ড্রাইভ স্টেশন পেরিয়ে ট্রেন একেবারে সমুদ্র-সৈকতের কিনারা দিয়ে চলতে থাকে। বামে দিগন্তপ্রসারী আরব সাগর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে তটের উপর লুটিয়ে পড়ে। বিরামহীন সেই লুটিয়ে পড়া। দক্ষিণে অভ্রভেদী অট্টালিকার শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি প্রাসাদের মত। সামনে মালাবার হিলস্, অঙ্গে নিয়ে শ্যাম আভরণ। সাগরের বক্ষ ভেদ করে ওঠে মালাবার। বিস্তৃত হয় দক্ষিণ থেকে বামে। প্রশমিত হয় তার উচ্চতা যত হয় বিস্তৃতি। শেষে মিলিয়ে যায় একেবারে আরবের বুকে। অদৃশ্য হয়ে যায় দিগন্তে। এক হয়ে যায় মালাবার, সাগর আর দিগ্বলয়। হারিয়ে ফেলে পৃথক সত্তা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশ।

সুন্দরতম মালাবার, অমরাবতী বোম্বাইয়ের, বুকে নিয়ে আছে অসংখ্য নয়নাভিরাম উদ্যানে বেষ্টিত প্রাসাদোপম অট্টালিকার শ্রেণী—বাসস্থান বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী আর ধনিকদের, আবাসস্থল ক্রোরপতিদের। সঙ্গমস্থলে সুন্দরতম রাজপ্রাসাদে বাস করেন প্রদেশের রাজ্যপাল। শীর্ষদেশে রচিত হয় (হ্যাঙ্গিং) ঝোলানো উদ্যান। অপরূপ সুপরিকল্পিত, সুদৃশ্য, শোভন এই উদ্যানটি—বোম্বাইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

বিদ্যুৎগতিতে ট্রেন এগিয়ে যায়। অন্তর্হিত হয়ে যায় সাগর অট্টালিকার অন্তরালে, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। মালাবারও চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। অতিবাহিত হয় প্রায় একটি ঘণ্টা, ট্রেন বোরিভিলি স্টেশনে এসে থামে। প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে বোরিভিলি। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ট্রেন থেকে নেমে কুলির হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার দুটি দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে কানেরি অভিমুখে অগ্রসর হই। মাইল খানেক পথ অতিক্রম করে আমরা জাতীয় উদ্যানে (ন্যাশানাল পার্কে) উপনীত হই।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার রওনা হই। সর্পিল গতিতে পথ যায়, যায় ঘন বন-বীথি ভেদ করে। কখনও উঁচুতে ওঠে, কখন নীচে নামে। মাঝে মাঝে ছুটে আসে রুপোলী স্রোতস্বিনী, আসে নৃত্য-চপল গতিতে অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। ভেদ করে আসে ঘনশ্যাম বন-বীথি। আবার পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায় সবুজের অন্তরালে। ক্ষীণতর হতে থাকে তার কলধ্বনি। শেষে নীরব হয়ে যায় একেবারে।

অগ্রসর হই। দেখতে দেখতে যাই প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা। বাড়তে থাকে শোভা যত অগ্রসর হই। বর্ধিত হয় শুভ্র, শ্বেত-বসনা, নৃত্য-চপলা কলনাদিনীর আর ঘন-শ্যামল অরণ্যানীর লুকোচুরি খেলাও। শেষে মন্দিরের পদপ্রান্তে এসে উপনীত হয় চরমে। পরিণত হয় এক সুন্দরতম লীলা-নিকেতনে, এক নন্দন কাননে। তাই বেছে নেন এই স্থান, এই স্বর্গোদ্যান বৌদ্ধ প্রধান পুরোহিত মন্দির নির্মাণের জন্য। পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গ কেটে নির্মিত হয় একটি চৈত্য, বুকে নিয়ে স্তূপ। রচনা করেন বৌদ্ধ স্থপতি। সেই চৈত্যে এসে নিভৃতে, নির্জনে, অলোকসুন্দর পরিবেশে পূজা করেন বৌদ্ধ

পুরোহিত, করেন বৌদ্ধ শ্রমণও। তাঁদের থাকবার জন্য নির্মিত হয় একটি বিহার। ক্রমে বাড়ে শ্রমণের সংখ্যা, আসেন তাঁরা দলে দলে, আসেন সুন্দরের আকর্ষণে, বর্ধিত হয় বিহারের সংখ্যাও। শেষে পরিণত হয় সেই সংখ্যা একশ'তে। মহাতীর্থে পরিণত হয় এই স্থান। নাই এত বৌদ্ধ মন্দির অন্য কোন স্থানে। নাই বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তাতে, নাই এলোরাতে, নাসিকেও নাই।

ধীরে ধীরে এসে আমরা চৈত্যের সামনে উপস্থিত হই।

হীনযান সম্প্রদায়ের শেষ চৈত্য। নির্মিত হয় এই চৈত্যটি ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে, নির্মাণ করেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা। লেখা আছে চৈত্যের অঙ্গে।

অপরূপ এই চৈত্যটি, দাঁড়িয়ে আছে, এক মহামহিমময় মূর্তিতে পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গে। আছে নিভৃতে, নির্জনে। বেষ্টিত হয়ে আছে ঘনশ্যাম অরণ্যানী আর রুপোলি নৃত্য-পরায়ণা সর্পিলগতি নির্ঝরিণী দিয়ে। শোনা যায় পল্লবের মর্মর ধ্বনি। কানে ভেসে আসে নির্ঝরের মৃদু গুঞ্জনও। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখি প্রকৃতির এই স্বপ্নময় অলোকসুন্দর পরিবেশ, এই রহস্যলোক।

নির্মিত এই চৈত্যের সম্মুখভাগ কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগের অনুকরণে। কিন্তু সুষ্ঠু নয় এই অনুকরণ। অসম্পূর্ণও। দেখি দাঁড়িয়ে আছে এক নিকৃষ্ট অসম্পূর্ণ অনুকরণ কার্লির চৈত্যের। ক্ষুদ্রতর আয়তনেও। দুই-তৃতীয়াংশ কার্লির চৈত্যের। বাইরের অলিন্দের পর্দার অঙ্গে দুই দম্পতির মূর্তি। তাঁদেরই অর্থে নির্মিত হয় এই চৈত্যটি। অনুরূপ এই মূর্তিগুলি কার্লির চৈত্যের দম্পতির মূর্তির।

এই চৈত্যটির নির্মাণ সুরু হয় ক্ষীণবল হন যখন হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা। তাঁরা ভারতে প্রবল থাকেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত—দীর্ঘ চারি শত বৎসর, অন্তর্হিত তাঁদের ক্ষমতা, তাঁদের প্রভাব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাই সম্ভব হয় না তাঁদের এই চৈত্যের সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া। থেকে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়। বাস করেন না কোন বৌদ্ধ শ্রমণ এই চৈত্যে। পূজা দেন না কোন বৌদ্ধ পুরোহিত এই স্তূপে। থাকে না কান্হেরিতে কোন জনমানব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

পরিত্যক্ত থাকে কানেরি ২০০ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরিণত হয় হিংস্র শ্বাপদের আবাসস্থলে। বাসস্থান হয় ভয়াল সর্পেরও।

আসে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রবলতর হন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতে। আবার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তীর্থস্থানে পরিণত হয় কানেরি। ফিরে পায় তার লুপ্ত গৌরব। আসেন দলে দলে বৌদ্ধ শ্রমণ, আসেন বৌদ্ধ পুরোহিতও। বাস করেন এসে কানেরিতে। আবার মুখর হয় কানেরি পীতবসনে ভূষিত পুরোহিত আর শ্রমণের কলকণ্ঠে। প্রতিধ্বনিত হয় শান্তির বাণী, বাণী অহিংসার আর সাম্যেরও তার আকাশে বাতাসে। নির্মিত হয় নূতন নূতন বিহার বুকে নিয়ে বৌদ্ধ স্থপতির প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, রচিত হয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত। নির্মিত হয় মূর্তি, মূর্তি বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের সেই সব বিহারে।

মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয় এই চৈত্যটির অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রও। রচিত হয় তার দুই প্রান্তে দুইটি পঁচিশ ফুট উঁচু মহামহিমময় বুদ্ধমূর্তি। রচনা করেন বৌদ্ধ স্থপতি গুপ্ত রাজাদের আমলে—তাঁদের প্রেরণায় ও অর্থে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও, মহাপরাক্রমশালী, অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল প্রতাপে, হন সার্বভৌম সম্রাট উত্তর ভারতের। বিস্তৃত হয় তাঁদের আধিপত্য মালবে আর দাক্ষিণাত্যেও। তাঁরাই রচনা করেন কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগের অপরূপ বুদ্ধমূর্তি। সুন্দরতম বুদ্ধমূর্তি দিয়ে সাজান নাসিকের বিহারকেও। অনবদ্য গঠন-সৌষ্ঠব এই মূর্তিগুলির, মহামহিমময়। লাভ করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের মূর্তিসম্ভারের দরবারে।

নিবদ্ধ থাকে পরবর্তী স্থপতির উন্নততর সজ্জা শুধু এই চৈত্যের সম্মুখভাগে। প্রবেশ করতে পারে না তার অভ্যন্তরে—সভাগৃহে। স্পর্শ করে না স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশও, থেকে যায় অপরিবর্তিত অবস্থায়।

দেখি চৈত্যের সামনে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, বেষ্টিত নীচু প্রাচীর দিয়ে। তার প্রবেশপথে, সোপান-শ্রেণী। সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রাঙ্গণের সুবিশাল সিংহস্তম্ভ শীর্ষে নিয়ে জোড়া সিংহ। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের সামনের সিংহস্তম্ভের গঠনে ও অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারে, দাঁড়িয়ে আছে এই সিংহস্তম্ভগুলি পশ্চিমঘাট

শৈলমালার অন্তর্ভূত হয়ে। পৃথক নয় তারা কার্লির সিংহস্তম্ভের মত। দেখি এই স্তম্ভের দণ্ডের কেন্দ্রস্থলে গদিও, বিভিন্ন কার্লির স্তম্ভের দণ্ড হতে। দেখি স্তম্ভের শীর্ষদেশেও চতুষ্কোণ পতাকার অঙ্গে মূর্তি দিয়ে রচিত বন্ধনী (কীচক বন্ধনী)। নাই এই বৈশিষ্ট্যও কার্লির সিংহস্তম্ভে।

দেখি স্তম্ভের পিছনে পর্দা দিয়ে রচিত চৈত্যের সম্মুখভাগ। আছে তাতে তিনটি উচ্চ চতুষ্কোণ প্রবেশপথ। দেখি এক সারিতে পাঁচটি গবাক্ষও, প্রবেশপথ আলোর মন্দিরে। আছে পর্দার অঙ্গেও অনেকগুলি ছিদ্র। খুব সম্ভব ছিল এখানেও কাঠের কাজ। ছিল কাঠের তৈরী ঝোলানো মঞ্চ, বসতেন সেখানে বাদ্যকরেরা। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে কাঠের কাজ। নাই কিছু অবশিষ্ট।

সম্মুখের পর্দার পিছনে প্রাচীরের গাত্রে দেখি একটি অনবদ্য অলিন্দ, অনুরূপ কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগের অলিন্দের। দেখি তিনটি প্রবেশপথও। নির্মিত হয় একটি সুবিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি চৈত্য-গবাক্ষও। শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ চৈত্যের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার অঙ্গের শিল্পসম্ভার। উপনীত হই অলিন্দে। দেখি তার প্রাচীরের গাত্রে ব্যালকনির ভিতর দুইটি দম্পতি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, কটিদেশে কোমরবন্ধ, দক্ষিণ হস্তে চক্র। অনবদ্য তাঁদের গঠন-সৌষ্ঠব। সুন্দরতম ব্যালকনির নির্মাণ-কৌশল আর তার অঙ্গের শিল্পসম্ভারও। তাদের দুই দিকে দুইটি স্তম্ভ শীর্ষে নিয়ে দুইটি সিংহের মূর্তি। ছাদের অঙ্গে রেলের কার্নিস। অপরূপ, সুন্দরতম এই মূর্তিগুলি, রচনা করেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা। দেখি স্তব্ধ হয়ে অলিন্দের দুই প্রান্তদেশের দুই মহিমময় বুদ্ধমূর্তিও, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুপ্ত ভাস্করের।

সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি রচিত এই সভাগৃহটিও কার্লির চৈত্যের সভাগৃহের অনুকরণে, বৃত্তাকার তার প্রান্ত প্রদেশ। ছিয়াশি ফুট দীর্ঘ, চল্লিশ ফুট প্রস্থ আর পঞ্চাশ ফুট উঁচু এই সভাগৃহটি দাঁড়িয়ে আছে এক মহিমাময় মূর্তিতে।

দেখি চৌত্রিশটি স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক করা হয়েছে স্তম্ভের কেন্দ্রস্থলকে চারিপাশের গলিপথ থেকে। ঘন-সন্নিবিষ্ট এই স্তম্ভগুলিও বুকে নিয়ে আছে

তাদের কয়েকটি অনুপম শিল্পসম্ভার। দেখি তাদের শীর্ষদেশেও অনবদ্য মূর্তিসম্ভার। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের সভাগৃহের স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের এই মূর্তিগুলি, মহিমময় পরিকল্পনায়, সুন্দরতম রূপদানে। দেখি বিস্মিত হয়ে। সময় হয় নাই অন্য স্তম্ভগুলির সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া। পরিসমাপ্ত হয় নাই তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের কাজ। লাভ করে নাই পূর্ণ পরিণতি।

কার্লির চৈত্যের অনুকরণেই নির্মিত হয় এই সভাগৃহের অর্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট সমকেন্দ্রিক কাঠের তৈরী কড়ি। দেখি মুগ্ধ হয়ে ছাদের নির্মাণ-কৌশল।

দেখি বৃত্তাংশে একটি মহামহিমময় স্তূপও। প্রণাম জানাই তথাগতকে।

বেরিয়ে এসে দেখতে থাকি একে একে বিহারগুলি।

উপনীত হই দশম গুহামন্দিরে। পরিচিত এই গুহামন্দিরটি দরবার-গৃহ নামে। মিলন হত এই দরবার-গৃহে বৌদ্ধ শ্রমণদের। আসতেন তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। আসতেন সুদূর বিদেশ থেকেও—সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, আর মালয় থেকেও। অনুষ্ঠিত হত এই দরবার-গৃহে এক মহা সম্মেলন—সম্মেলন বিশ্বের বৌদ্ধ শ্রমণের। যোগ দিতেন সেই সম্মেলনে বিশ্বের বৌদ্ধেরাও। বিশ্লেষণ হ'ত ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্বের। বিনিময় হত সংস্কৃতিও—সংস্কৃতি দেশ-বিদেশের। পরিণত হত এই দরবার গৃহ বিশ্বের মিলনের কেন্দ্রস্থলে।

সবশেষে ছেষট্টি নম্বরের গুহামন্দিরে উপনীত হই। দেখি তার প্রাচীরের গাত্রের মূর্তিসম্ভার। দেখি মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে একটি উপাসনার দৃশ্য। উপাসনা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের। দাঁড়িয়ে আছেন অবলোকিতেশ্বর সঙ্গে নিয়ে দুইটি পরমা রূপবতী নারী। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ। শোভা পায় মূল্যবান শিরোভূষণ নারীদের শিরেও। উপাসনা করেন তাঁদের কত নর, কত নারী। উপরে বসে, দুই দেবতা দেখেন সেই উপাসনা। মন্দিরের দ্বারে দ্বারপাল, দাঁড়িয়ে আছে মহিমময় মূর্তিতে হস্তে নিয়ে চামর। মূর্তি দিয়েই রচিত দেখি দ্বারের চৌকাঠ। শোভা পায় পদ্মের বৃন্ত আর প্রস্ফুটিত পদ্মও। দ্বারপালের মস্তকের উপর এক দম্পতি বসে আছেন। দেখি গুপ্তযুগের ভাস্করের এক সুন্দরতম সৃষ্টি, এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি,

যেমন মহিমময় পরিকল্পনায়, তেমনই অনবদ্য সুন্দরতম রূপদানে। শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা জানাই স্থপতিকে। নিবেদন করি ভাস্করকেও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয় নি ম্লান, আছে অক্ষয় হয়ে।

ফিরবার পথে দেখে আসি মণ্ডপেশ্বর। বোরিভিলি স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত এই মণ্ডপেশ্বর। ছিল এখানে তিনটি গুহামন্দির নির্মিত অষ্টম শতাব্দীতে।

পূর্বদিকের গুহামন্দিরটি ছ' ফুট প্রস্থ আর একুশ ফুট দীর্ঘ। একটি ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির, আছে এই এই মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রস্তর-নির্মিত জলাধার।

দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় গুহামন্দিরটি সাতাশ ফুট দীর্ঘ পনের ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। রচিত দেখি তার প্রাচীরের গাত্রে গণদেবতার মূর্তি।

বৃহত্তম পশ্চিম প্রান্তের তৃতীয় গুহামন্দিরটি, একটি বৌদ্ধবিহার। বাস করতে পারতেন এই বিহারে দশ থেকে বার জন বৌদ্ধ শ্রমণ। ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ধর্মমন্দিরে পরিণত হয় এই বিহারটি। উৎপাটিত হয় তার প্রাচীরের গাত্র থেকে বৌদ্ধ স্থাপত্য, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একেবারে। পর্তুগালের রাজা তৃতীয় জর্জের আদেশে চার্চের প্রতিপালনে ব্যয়িত হয় এই মন্দিরের আয়।

খ্রীষ্ট ধর্মমন্দিরে পরিণত হয় নাই ভারতের আর কোন মন্দির। বাজেয়াপ্ত হয় নাই মন্দিরের সম্পত্তি। একমাত্র ব্যতিক্রম এই মণ্ডপেশ্বর। আজও তার স্মৃতি বুকে নিয়ে আছে এখানে একটি অনাথ আশ্রম। আছে একটি পর্তুগীজ ধর্মমন্দিরের ধ্বংসাবশেষও।

আমরা মণ্ডপেশ্বর দেখে বোরিভিলি স্টেশনে ফিরে আসি। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে বোম্বাইতে। তখন রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে দিগন্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগেশ্বরী

যোগেশ্বরীর মন্দির

দু বছর বোম্বাইতে কাটাই। প্রতি রবিবারেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ভ্রমণে বের হই। কোন দিন জুহুতে সমুদ্রে স্নান করে, আর সমুদ্র-সৈকতে পায়চারি করে কাটাই, কোন দিন খারের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ করে, কোন দিন মেরিন ড্রাইভের জনারণ্যে ধাক্কাধাক্কি করে, কোন দিন চৌপাটিতে বেড়িয়ে, আবার কোনদিন মালাবারের শীর্ষদেশে ঝোলান উদ্যানে শুয়ে বসে। কিন্তু আমাদের বোম্বাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ উর্লির সমুদ্র-সৈকত আর মহালক্ষ্মীর মন্দির।

এই উর্লিতে এলেই দেখা যায় আরব সাগরের স্বরূপ। উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে ভীষণ গর্জনে ছুটে আসে আরব। আসে অমিত বিক্রমে, তীরের উপলখণ্ডের উপরে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। বিরামহীন এই আসা-যাওয়া। নাই সাগরের এই উদ্দামতা বোম্বাইয়ের অন্য কোন সমুদ্র-সৈকতে—নাই নারিকেলবীথি-বেষ্টিত জুহুতে, নাই প্রাসাদে-ঘেরা মেরিন ড্রাইভে, নাই অর্ধোন্মুক্ত চৌপাটিতেও। অপরূপ উর্লির রাত্রির রূপ। সম্মুখে উদ্দাম উন্মুক্ত নীল আরব, ছোটে অনন্তের পানে, দিগন্তে গিয়ে মেশে, শোনা যায় তার গর্জন, কানে ভেসে আসে তার অন্তরের ধ্বনি। তার বুকের উপর এক প্রশস্ত সিমেণ্ট-বাঁধান পথ, বিস্তৃত হয়ে আছে মাইল খানেক পরিধি নিয়ে। তার পিছনে পীচের প্রশস্ত রাজপথ বুকে নিয়ে আছে উজ্জ্বল নিওন বাতি। প্রতিফলিত হয় বাতির সবুজ আলো নীল তরঙ্গের বুকে। সবার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর, শোভন, ফুলে ভরতি প্রাঙ্গণে বেষ্টিত অট্টালিকাশ্রেণী, বাসস্থান বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রের তারকাদের, সৃষ্টি করে এক রহস্যলোক—এক স্বপ্নপুরী।

অতুলনীয় মহালক্ষ্মী। বুকে নিয়ে আছে মহালক্ষ্মীর সমুদ্র-সৈকত ছোট

বড় উপলখণ্ড, বিস্তৃত হয়ে আছে সিকি মাইল পরিধি নিয়ে। উত্তাল তরঙ্গ বুকে নীয়ে ভীষণ গর্জন করতে করতে ছুটে আসে আরব সাগর, আসে প্রমত্ত বিক্রমে, উন্মত্ত আবেগে। আসে দিগন্তের ওপার থেকে। প্রতিহত হয় এসে সেই উপলখণ্ডের উপর। বিচ্ছুরিত হয় শীকর তরঙ্গের আর শিলার সঙ্ঘাতে। প্রবাহিত হয় জলবিন্দু লক্ষশত ধারায়, প্রসারিত হয় সর্পিল-গতিতে। সৃষ্টি হয় কত অসংখ্য রুপোলী, দ্রুতগামী সর্প উপলখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে। রচিত হয় কত ক্ষুদ্র জলাশয়ও। আমরা একের পর এক প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করে উপনীত হই এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের শীর্ষদেশে। বসে বসে দেখতে থাকি সাগরের অপরূপ বিচ্ছুরণ। দেখি মুগ্ধ হয়ে তার ভয়াল প্রমত্ত রূপ। দেখি তরঙ্গ আর শিলার সঙ্ঘাত, দেখি জলকণার শোভা। ক্রমে আসে জোয়ার, বর্ধিত হয় সাগরের প্রচণ্ডতা, বাড়ে তরঙ্গের আকৃতি আর সমুদ্রের ভীষণতাও। তলিয়ে যায় জলের নীচে চারিপাশের অপেক্ষাকৃত নীচু শিলাখণ্ড, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। অর্ধনিমজ্জিত হয় বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও। তরঙ্গের বিচ্ছুরিত জলবিন্দুতে ভিজে যায় আমাদের সর্বাঙ্গ। আমরা পরিত্যাগ করে আসি সেই উপলখণ্ড। ফিরে আসি তীরে, নিমজ্জিত আর অর্ধনিমজ্জিত উপলখণ্ডের শীর্ষদেশে পা ফেলে, অতি কষ্টে। প্রণতি জানিয়ে আসি উন্মত্ত সাগরকে। তাকিয়ে দেখি নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই প্রস্তরখণ্ডও নিমজ্জিত হয়েছে সমুদ্রের অতলতলে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে সৈকতের সমস্ত শিলাও, লুপ্ত হয়েছে সাগরের জলের অন্তরালে। স্পর্শ করেছে সমুদ্রের জল সোপানশ্রেণীর পাদদেশ। এমন সময় শোনা যায় আরতির ঘণ্টা। কানে আসে ঢাকের বাদ্যও।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা উপনীত হই শৈলমালার অধিত্যকায়। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণে বেষ্টিত হয়ে মহালক্ষ্মীর সুন্দর মন্দির। এই মন্দিরটি স্থাপন করেন বিশ্ববিখ্যাত যশস্বী ক্রিকেটপারদর্শী বিজয় মার্চেন্টের পূর্বপুরুষেরা। মহাআড়ম্বরে পূজিতা হন এই মন্দিরের সুবর্ণ-বর্ণা দেবী মহালক্ষ্মী। স্বর্ণনির্মিত তাঁর অঙ্গ। মহা জাগ্রতা এই দেবী, তাই আসে এখানে যাত্রী, সমাগত হয় দলে দলে, আসে হাজারে হাজারে। আমরাও মন্দিরের সংলগ্ন দোকান থেকে ফুল ও নারিকেল কিনে নিয়ে ভক্তিভরে দেবীর পূজা করি। পূজান্তে প্রসাদ নিয়ে বাসায় ফিরি।

সেদিন ছিল রবিবার। মেঘমুক্ত আকাশ, সকালে উঠেই চায়ের টেবিলে বসে কোথায় যাওয়া যাবে এই নিয়ে আলোচনা সুরু হয়—মহালক্ষ্মী না উর্লি কন্যা বলে, পুরোনো হয়ে গিয়েছে মহ.লক্ষ্মী, উর্লির প্রতিও তার কোন আকর্ষণ নাই। বলে, চল না আজ যোগেশ্বরী দেখে আসি। অতি উত্তম প্রস্তাব। দেখা হবে একটি নূতন জায়গা, আগে দেখি নাই। বোম্বাইয়ের কাছাকাছি সবগুলি গুহামন্দিরও দেখা হবে, অবশিষ্ট থাকবে না একটিও। তাই রাজী হয়ে যাই কন্যার প্রস্তাবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে যোগেশ্বরী অভিমুখে রওনা হই। মাতুঙ্গায় গিয়ে ট্রেনে চড়ে ব্যান্দ্রাতে গাড়ী বদল করে এক ঘণ্টার মধ্যেই যোগেশ্বরীতে পৌঁছাই।

ট্রেন থেকে নেমে অতিক্রম করতে হয় আরও এক মাইল পথ, যেতে হয় পদব্রজে। দু'পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত, দিগন্তে গিয়ে মেশে। তার মাঝখান দিয়ে অপ্রশস্ত মাটির পথ, যায় বঙ্কিম গতিতে। আমরা অতিক্রম করি ধীরে ধীরে সেই পথ। মাঝে মাঝে অতিক্রম করতে হয় হোগলা বনও। কোথাও বা বর্ষার প্লাবন বয়ে যায় রাস্তার বুকের উপর দিয়ে, সৃষ্টি হয় পথের বুকে ক্ষুদ্র কলনাদিনী স্রোতস্বিনী। উল্লম্ফনে অতিক্রম করতে হয় সেই তরঙ্গিনী। আবার কোথাও ভিন্ন হয় পথ স্রোতস্বিনীর প্রবল গতিতে। রুদ্ধ হয় চলার গতি।

অতিকষ্টে পার হয়ে যাই সেই বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন স্থান। উপনীত হই অপর পারে। অবশেষে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হই।

নির্মিত হয় এই গুহামন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। নির্মাণ করেন মহাপরাক্রমশালী রাষ্ট্রকুট রাজারা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা দাক্ষিণাত্যের আর দক্ষিণ ভারতের।

পতন হয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর্যাবর্তে। সার্বভৌম আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ হয় বাংলার শশাঙ্কের, থানেশ্বরের হর্ষবর্ধনের আর কনৌজের যশোধর্মনের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠিত হয় দুইটি মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে। পল্লবেরা কাঞ্চীতে, দাক্ষিণাত্যে—মহারাষ্ট্রদেশে স্থাপন করেন চালুক্যরাজ বংশের প্রথম পুলকেশী ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বোম্বাইয়ের বিজাপুর জেলায় বাতাপিতে (বর্তমান

বাদামি) তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। অনুরূপ সাতকর্ণী ও বৈজয়ন্তীর কদম্বের, মানব গোত্রীয় এই চালুক্যরা। পরিচিত হারীতি পুত্র নামেও। কেউ বলেন উদ্ভূত তাঁরা অযোধ্যার এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ থেকে। বিন্ধ্য অতিক্রম করে, তাঁরা দাক্ষিণাত্যে এসে বসতি স্থাপন করেন।

পুলকেশীর পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মণ ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অধিরোহণ করেন পিতৃসিংহাসনে। অধিকার করেন তিনি কানাড়া আর কোঙ্কন, বাড়ে রাজ্যের সীমানা। তাঁর ভাই মঙ্গোলেশ রাজত্ব করেন ৫৯৭ থেকে ৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে কলচুরির রাজা। রত্নগিরি চালুক্যের অধিকারে আসে।

অলঙ্কৃত করেন চালুক্য সিংহাসন ৬০৯ থেকে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কীর্তিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, সর্বশ্রেষ্ঠ সমসাময়িক রাজাদের মধ্যেও। পরাজিত হন উত্তর কানাড়ার কদম্বরাজ, মহীশূরের গঙ্গরাজা, কোঙ্কনের মৌর্যরাজ। আনুগত্য স্বীকার করেন তাঁর কাছে মালব আর গুজরাটের অধিবাসীরা। পল্লবরাজা মহেন্দ্রবর্মণও পরাজিত হন। চোল কেরল আর পাণ্ড্য রাজাও নতি স্বীকার করেন। প্রতিরুদ্ধ হয় হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণও।

তিনি পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর রাজসভায় রাজদূত প্রেরণ করেন। আবদ্ধ হন তাঁরা সখ্যতার বন্ধনে। পরিদর্শন করেন তাঁর রাজসভা চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ। তাঁর প্রশংসায় মুখরিত হয় তাঁর লেখনী, লেখা আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী আইহোলীর শিলালিপিতেও। কিন্তু ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। রুদ্ধ হয় তাঁর বিজয়ের অভিযান। বাতাপি আসে কিছুদিনের জন্য পল্লবদের অধিকারে।

তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য। ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পল্লব নরসিংহবর্মণকে পরাজিত করে, তাঁর রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। আবার দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজিত হন চোল, কেরল আর পাণ্ড্যরাজারাও।

রাজত্ব করেন একে একে বিনয়াদিত্য আর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। পাণ্ড্য ও চোল রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বী·গার করেন। করেন মালাবার উপকূলের অধিবাসীরাও। পরাজিত হন তাঁর কাছে পল্লবরাজা। ব্যাহত হয় সিন্ধুবিজেতা আরবদের গুজরাট আক্রমণও। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তিনি, নির্মিত হয় রাজধানী, বাতাপিতে এক সুন্দরতম মন্দির কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দিরের অনুকরণে।

দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ শেষ রাজা এই বংশের। রাজত্ব করেন ৭৪৭ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গ অধিকার করেন চালুক্য সিংহাসন। অস্তমিত হয় চালুক্য ক্ষমতা, চালুক্য প্রভাব দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রে, সুরু হয় রাষ্ট্রকূট শাসন, রাষ্ট্রকূট প্রতিপত্তি। রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবলপ্রতাপে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত অঞ্চলে দীর্ঘ দ্বিশত বৎসরেরও বেশী। হন সার্বভৌম সম্রাট।

দন্তিদুর্গই স্থাপন করেন এই রাজবংশ। মহাভারতের যদুবংশ তাঁদের পূর্বপুরুষ। কেউ বলেন রাষ্ট্রীকদের বংশধর তাঁরা, ছিলেন তেলেগু কৃষিজীবী, অধিবাসী কর্ণাটকের। পরে চালুক্য রাজাদের অধীনস্থ সামন্ত রাজা। মহাক্ষমতাশালী এই দান্তিদুর্গ। চালিত হয় তাঁর সামরিক অভিযান কাঞ্চীতে, মহাকোশলে, মাল্বে আর দক্ষিণ গুজরাটে।

মহাপরাক্রমশালী তাঁর ভাই প্রথম কৃষ্ণও। অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রকূট সিংহাসন ৭৬৮ থেকে ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, পরাজিত হন তাঁর কাছে বেঙ্গীর চালুক্যরাজ চতুর্থবর্ধন, মহীশূরের গঙ্গরাজাও। তিনিই নির্মাণ করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির এলোরার কৈলাসনাথ।

রাজত্ব করেন একে একে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ আর ধ্রুবও। পরাজিত হন তাঁর কাছে মহীশূরের গঙ্গরাজা। মহীশূর আসে রাষ্ট্রকূটের অধিকারে। তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন কাঞ্চীর পল্লবরাজ। বিতাড়িত হন রাজপুতনার মরুভূমিতে গুর্জর প্রতিহাররাজ বৎস রাজা। প্রবেশ করে তাঁর বিজয়ের অভিযান আর্যাবর্তেও, নতি স্বীকার করেন তাঁর কাছে বাংলার ধর্মপাল। বাড়ে রাজ্যের সীমানা, বর্ধিত হয় রাষ্ট্রকূট প্রতিপত্তিও।

অলঙ্কৃত করেন তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকূট সিংহাসন ৭৯৩ থেকে ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। পরাজিত করেন পল্লবরাজ দন্তিবর্মণকে। দমন করেন মহীশূরের বিদ্রোহ। পরাজিত হন তাঁর কাছে গুর্জর প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট, বাংলার ধর্মপাল আর তাঁর আশ্রিত কনৌজরাজ চক্রায়ুধ। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত থেকে দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে।

তাঁর পুত্র অমোঘবর্ষ। রাজত্ব করেন ৮১৪ থেকে ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে বেঙ্গীর চালুক্যরাজা। লেখা আছে শিলালিপিতে, বিস্তৃত হয় তাঁর অধিকার বাংলায় আর বিহারেও। রচয়িতা তিনি রত্নমালিকা নামক ধর্মগ্রন্থের, পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যের আর ধর্মেরও। মান্যখেটে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। আরব দেশীয় পর্যটক সুলেমানের মতে তিনি ছিলেন পৃথিবীর চারিজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম, সমপর্যায়ে পড়তেন তিনি চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা ও রোমের সম্রাটের।

রাজত্ব করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ তাঁর মৃত্যুর পর। কীর্তিহীন তিনি।

রাজত্ব করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র ৯১৫ থেকে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রমশালী তিনিও। পরাজিত হন তাঁর কাছে কনৌজের গুর্জর প্রতিহার রাজা।

রাজত্ব করেন একে একে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ আর তৃতীয় অমোঘবর্ষ। কীর্তিহীন তাঁরাও, তাদের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে প্রশমিত হয় রাষ্ট্রকূট ক্ষমতা এবং প্রাধান্য।

তৃতীয় কৃষ্ণই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রকূট সিংহাসন ৯৩৯ থেকে ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে প্রতিহার রাজা মহীপাল। কালঞ্জর আর চিত্রকূট আসে রাষ্ট্রকূটের অধিকারে, পরাজয় স্বীকার করেন পল্লব, পাণ্ড্য ও চোল রাজাও। আবার বাড়ে রাষ্ট্রকূট ক্ষমতা। বাড়ে রাষ্ট্রকূট প্রতিপত্তিও।

মৃত্যু হয় তৃতীয় কৃষ্ণের। হীনবল হতে থাকেন রাষ্ট্রকূট, অস্তমিত হতে থাকে তাঁদের ক্ষমতা। শেষে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে।

পরাজিত হন শেষ রাষ্ট্রকূট রাজা কক্ক, চালুক্য বংশের দ্বিতীয় তৈলের কাছে। আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য ক্ষমতা, চালুক্য প্রভুত্ব দাক্ষিণাত্যে।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা রাষ্ট্রকূট রাজারাও। মন্দির দিয়ে সাজান তাঁদের রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। বুকে নিয়ে ছিল এই সব মন্দির শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, নিয়ে ছিল অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। তাঁরাই নির্মাণ করেন এলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৈলাস, নির্মিত হয় গুহামন্দির যোগেশ্বরীতে আর এলিফ্যাণ্টাতেও, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্তিসম্ভার।

পরিচিত এই চালুক্য বংশ কল্যাণের চালুক্য নামে। বাতাপির চালুক্য রাজবংশের বংশধর দ্বিতীয় তৈল স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য কল্যাণে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। মহাপরাক্রমশালী এই তৈল। তাঁর কাছে পরাজিত হন রাষ্ট্রকূট রাজা, হন মালবের অধিপতি পরমার বংশের মুঞ্জও। স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী মান্যখেটে।

তার পর একে একে রাজত্ব করেন সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় জয়সিংহ আর সোমেশ্বর ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

মহাপরাক্রমশালী সোমেশ্বরও, তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন মালব ও চোলের অধিপতি। পরাজিত হন কাঞ্চীর চেদিরাজ, কর্ণদেবও। বাড়ে রাজ্যের সীমানা।

তাঁর পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। অধিরোহণ করেন কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। রাজত্ব করেন ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তার কাছে চোল রাজা কুলতুঙ্গ। বাংলার কিছু অংশও তাঁর অধিকারে আসে। বিদ্যোৎসাহী তিনি। অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা, বিক্রমাঙ্ক-চরিত প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন আর মিতাক্ষরা রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর।

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কালচুরি বিজ্জল অধিকার করেন সমস্ত চালুক্য রাজ্য। প্রতিষ্ঠিত হয় লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় তাঁর রাজত্বকালে।

অবশেষে গড়ে উঠে চালুক্যভূমে তিনটি মহাশক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য—দেবগিরিতে যাদব, বরঙ্গলে কাকতীয় আর মহীশূরে দ্বারসমুদ্রে হোয়সল।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা চালুক্য রাজারা, কল্যাণের চালুক্যরা আর মহীশূরের হোয়সলেরাও। গড়ে ওঠে দাক্ষিণাত্যের দিকে দিকে, চালুক্যভূমে, মহীশূরে

অসংখ্য মন্দির, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির। সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির সেনাপতি কাফুর জয় করেন একে একে দেবগিরি, বরঙ্গল ও দ্বারসমুদ্র। চালুক্যভূম ও মহীশূর দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অধিকারে আসে। সংহারের লীলা সঙ্গে নিয়ে আসেন মুসলমান বিজেতা। ধ্বংসে পরিণত হয় কত মহিমময় সুবিশাল মন্দির, বুকে নিয়ে সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, কত অমূল্য সম্পদ, অঙ্গে নিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন স্থপতির বহু শত বৎসরের সাধনার দান। লুপ্ত হয়ে যায় একেবারে।

নির্মিত হয় এই মন্দিরটি, অস্তমিত হতে থাকে যখন বৌদ্ধ মহাযান ক্ষমতা ভারতে, প্রশমিত হয় যখন তাঁদের সংস্কৃতি, তাঁদের কৃষ্টি, প্রবল হয় আবার হিন্দুধর্ম, পুনর্জীবিত হয় হিন্দু স্থাপত্য। তাই অধিকার করে আছে এই মন্দিরটি একটি বিশিষ্ট স্থান ভারতের গুহামন্দিরের ইতিহাসে।

শৈব গুহামন্দির, অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব। রচিত হয় মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে ক্রুশের আকৃতিতে। ক্রুশাকারে নির্মিত হয় সভাগৃহের শীর্ষদেশও। আছে এই মন্দিরে একাধিক প্রবেশ-পথও, সমপর্যায়ে পড়ে এলিফ্যাণ্টার শৈবমন্দির, গণেশ-গুম্ফার। অনুরূপ এলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির ভুমারলেনারও। কিন্তু বিস্তৃততর এর পরিকল্পনা, বৃহত্তর এর পরিধি। বিভিন্ন এর পরিকল্পনা অন্য বৌদ্ধ গুহামন্দির থেকে। পৃথক এর নির্মাণ-পদ্ধতিও, স্থাপিত হয় নাই বৌদ্ধ মূর্তি মন্দিরের প্রান্তদেশে, নিবদ্ধ নয় শুধু একটিমাত্র প্রবেশ-পথে।

আমরা পূর্বদিকের অর্ধভগ্ন সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করি। উপনীত হই একশ কুড়ি ফুট দীর্ঘ একটি অলিন্দে। দাঁড়িয়ে আছে অলিন্দটি আটটি সুন্দর স্তম্ভের উপর। দাঁড়িয়ে আছে এক এক পাশে চারটি স্তম্ভ। অনুরূপ এলিফ্যাণ্টার স্তম্ভের। অঙ্গে নিয়েছিল এই স্তম্ভগুলি সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, শোভিত ছিল তাদের শীর্ষদেশও অনবদ্য, অনুপম মূর্তিসম্ভারে। শোভিত ছিল অলিন্দের স্তম্ভের পিছনের (গ্যালারির) মঞ্চের প্রাচীরের গাত্রও অনুপম মূর্তিসম্ভার দিয়ে। মূর্তি দিয়ে রচিত ছিল কত কাহিনী, কাহিনী কত

পুরাণের। কিন্তু বিলুপ্ত হয়েছে সেই শিল্পসম্ভার, বিকৃত হয়েছে মূর্তিসম্ভারও কালের করালে, হয়েছে নিশ্চিহ্ন।

অলিন্দ আর কক্ষ অতিক্রম করে আমরা একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হই। দেখি দুই পাশে দুইটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দাঁড়িয়ে আছে পৃথক হয়ে। খুব সম্ভব রাখা হয়েছিল এই দুইটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপত্যের জন্য। কিন্তু সময় নাই স্থপতির, তাদের অঙ্গ শিল্প-সম্ভারে সাজাবার, হয় নাই সুযোগ। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আমরা আরও একটি অলিন্দে পৌছাই। বৃহত্তর এই অলিন্দটি। অনুরূপ আকৃতিতে আর নির্মাণ-পদ্ধতিতে প্রথম অলিন্দের। বুকে নিয়ে আছে আটটি স্তম্ভ ও মঞ্চ। শোভিত হয়ে আছে স্তম্ভের অঙ্গ, মঞ্চের প্রাচীরের অঙ্গ ও অনবদ্য মূর্তিসম্ভারে।

আছে এই অলিন্দে তিনটি প্রবেশ-পথ। যুক্ত হয় অলিন্দ মন্দিরের প্রধান সভাগৃহের সঙ্গে। দেখি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে, অলিন্দের প্রাচীরের অঙ্গে মূর্তিসম্ভার। দেখি স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারও। দেখি মুগ্ধ হয়ে, প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশের অনুপম মূর্তিসম্ভারও।

দ্বিতীয় অলিন্দ অতিক্রম করে একটি প্রবেশ-পথ দিয়ে এক প্রশস্ত চতুষ্কোণ সভাগৃহে উপনীত হই। পঁচানব্বই বর্গ ফুট এই সভাগৃহটি। দাঁড়িয়ে আছে কুড়িটি সুষ্ঠু গঠন স্তম্ভের শ্রেণীর উপর, অনুরূপ এলিফ্যাণ্টার স্তম্ভের আকৃতিতে আর গঠনে। রচিত হয় সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার এই স্তম্ভগুলির অঙ্গেও। ভূষিত হয় তাদের শীর্ষদেশও প্রকৃষ্টতম, নিরুপম অলঙ্কার দিয়ে। বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহের চতুর্দিক গলিপথ দিয়ে।

সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশাকার গর্ভগৃহ। আছে তাতে চারিটি দ্বার, যুক্ত হয় দ্বার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সঙ্গে। বিরাজ করেন সেখানে শিবলিঙ্গ, বিগ্রহ এই মন্দিরের। ভূষিত হয় গর্ভগৃহের প্রাচীরের গাত্রও অনবদ্য শিল্পসম্ভার আর সুন্দরতম মূর্তিসম্ভার দিয়ে। অবলুপ্ত হয়েছে শিল্পসম্ভার, বিলুপ্ত হয়েছে মূর্তিসম্ভারও কালের নির্মম হস্তে, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত গুহামন্দিরটি একটি সুবিস্তৃত সমতল অধিত্যকার উপর। পরিধি তার আড়াই শত ফুট, বৃহত্তম পরিধি ভারতের গুহামন্দিরের। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটির লুপ্ত গৌরবের নিদর্শন, প্রতীক এক অতীত

গৌরবময় ইতিহাসের, অঙ্গে নিয়ে আছে বিকৃত, বিলুপ্ত আর অর্ধবিলুপ্ত, সুন্দরতম সৃষ্টি। দেখে হতাশায় আর ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয় অন্তঃকরণ বিমর্ষ হয় মন।

শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্থপতিকে। ফিরে আসি সঙ্গে নিয়ে এক অসন্তোষের গ্লানি, এক মর্মবেদনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এলিফ্যাণ্টা

গণেশ-গুম্ফা

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস, বোম্বাইতে থাকি, মাতুঙ্গার অধিবাসী। সান্ধ্যভ্রমণে দাদরে বন্ধুবর কেদারের বাসায় যাই। বন্ধুপত্নীর বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি এক খ্যাতিমান চিত্র-পরিচালকের গৃহিণী। তিনি বলেন, দেখেন নাই তিনি এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দির, আমরাও দেখি নাই। সেদিন ছিল শনিবার, স্থির হয় পরের দিনই এলিফ্যাণ্টা দেখতে রওনা হব।

বোম্বাই বন্দর থেকে ছয় মাইল দূরে এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ, ছিল নাকি একটি সুবিশাল হস্তীমূর্তি, দ্বীপের অবতরণ স্থলে। তাই এলিফ্যাণ্টা নামে খ্যাতিলাভ করে এই দ্বীপ। সারা দ্বীপ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুইটি ক্ষুদ্র পর্বত, মাঝখানে তার এক উপত্যকা, বুকে নিয়ে আছে পর্বত একটি সুন্দরতম ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির, পরিচিত গণেশ-গুম্ফা নামে।

কার্ণাক বন্দর থেকে প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে ষ্টীমার এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে যাতায়াত করে। করে না শুধু বর্ষার তিন মাস। পনরই জুন থেকে পনরই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তখন বাড়ে সমুদ্রের জলের স্ফীতি, বাড়ে গর্জন আর উদ্দামতা, বর্দ্ধিত হয় প্রচণ্ডতাও। বিপদসঙ্কুল হয় ছোট ষ্টীমারে যাতায়াত, তাই সম্ভব নয় তখন এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দির দর্শনও।

ভোর চারটে থেকেই সুরু হয় এলিফ্যাণ্টা যাওয়ার প্রস্তুতি। মাতুঙ্গা থেকে ছ'টার গাড়ীতে রওনা হই। মসজিদ স্টেশনে নেমে পদব্রজে কার্ণাক বন্দরে উপনীত হই, সঙ্গে যান স্ত্রী ও কন্যা। দেখি বন্ধুবর ও বন্ধুপত্নী আগেই এসে হাজির হয়েছেন। হন নাই বন্ধুপত্নীর বান্ধবী, তাঁর স্বামী ও ভগ্নী। আমরা টিকিট কিনে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। এদিকে ষ্টীমার ছাড়বার সময় এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তাঁদের দেখা নাই। শেষে তাঁদের আসবার আশা ত্যাগ করে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা ষ্টীমারের দ্বিতলের ডেকে স্থান সংগ্রহ করি। বাঁশী বাজিয়ে হাল দিয়ে জলের আওয়াজ

করে স্টীমার ছাড়বার উপক্রম করে। খালাসীরা সিঁড়ি তুলতে ছুটে যায়। এমন সময়ে দেখি ছুটতে ছুটতে আসছেন পরিচালক মহাশয়, তাঁর পিছনে তাঁর স্ত্রী ও তাঁর ভগ্নী। সবার পিছনে একটি বড় ঝাঁকা মাথায় নিয়ে একটি কুলী। এই ঝাঁকাই নাকি তাঁদের দেরীর কারণ। ঝাঁকার মধ্যে আছে নানা রকমের সদ্য-প্রস্তুত খাদ্য। সময়সাপেক্ষ তাদের প্রস্তুত করা। কুলীকে বিদায় দিয়ে আমরা সকলে পাশাপাশি চেয়ারে বসি, স্টীমারও ছাড়ে।

প্রশান্ত সৌম্য আরব, নাই তাতে বঙ্গোপসাগরের চঞ্চলতা, নাই সে গর্জন, নাই উদ্দামতাও। দিগন্তে বিস্তার করে আছে তার নীল দেহখানি, মিশেছে নীল আকাশ আর নীল সাগর। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার বুকের শীতল হাওয়ায় জুড়িয়ে যায় শরীর। আনন্দে পরিপূর্ণ হয় মন, দেখে তার অপরূপ রূপ।

অগ্রসর হতে থাকে স্টীমার দিগন্তের পানে অদৃশ্য হয়ে যায় কার্ণাক বন্দর, হয় বোম্বাই শহরের অট্টালিকা আর প্রাসাদও একে একে। শেষে বোম্বাই শহর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। ঘণ্টাখানেক বাদে আমাদের স্টীমার এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে থামে।

আমরা স্টীমার থেকে নেমে কুলীর মাথায় জিনিস চাপিয়ে উপত্যকার ভিতরের একটি উঁচুনীচু রাস্তা অতিক্রম করে গুহামন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হই। প্রায় দু'ফার্লং রাস্তা যেতে হয়, উঠতে হয় পর্বতের শীর্ষদেশে। স্থান সংগ্রহ করি মন্দিরের অধ্যক্ষের বাড়ীর বারান্দার একপ্রান্তে। সেখানে একখানি বড় টেবিল ও খানকতক চেয়ার সাজান ছিল।

তখন এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন এক বাঙালী ব্রাহ্মণ। তিনি খবর পেয়ে ছুটে এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। মহিলারা অন্দরমহলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্থরু হয় প্রাতরাশ। পরিচালক গৃহিণী একে একে বার করেন তাঁর সঙ্গে আনা খাবার। তাঁর সহোদরা পরিবেশন করেন। আমরা খাই আর গল্প করি, গল্প বলেন পরিচালক মহাশয় আমরা শুধু শ্রোতা, নিবদ্ধ থাকে গল্প বোম্বাইয়ের চিত্র-জগতে। তিনি ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত পরিচালক, অন্যতম প্রবীণতমও। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত চিত্র কোম্পানীতে চতুর্গুণ মাহিনায় নিযুক্ত হয়েছেন। আরও

অনেক বাঙালী চিত্রশিল্পী ও চিত্রতারকাও নিযুক্ত আছেন বোম্বাইতে, কলিকাতার চতুর্গুণ মাহিনায়। স্বর্ণপ্রসূ বোম্বাই বাসস্থান কোটিপতিদের। তাই সম্ভব হয় তাদের এত অধিক মাহিনায় শিল্পী নিযুক্ত করা। সুলভ হয় শিল্পীদেরও অর্থ উপার্জন।

প্রাতরাশ সেরে আমরা সকলে মন্দির অভিমুখে রওনা হই। সঙ্গে যান মন্দিরের অধ্যক্ষ। দেখি এসেছেন বহু দর্শন-অভিলাষী, এসেছেন হাজারে হাজারে। আছেন তাঁদের মধ্যে মারাঠী, গুজরাটী, ভাটিয়া, পার্শী, ইহুদী, দক্ষিণ-ভারতীয় আরও কত অধিবাসী, কত বিভিন্ন দেশের। সার্বভৌমিক নগরী বোম্বাই দাঁড়িয়ে আছে মহাভারতের সাগরতীরে, মিলন হয় এখানে বিশ্বের মানবের, বিভিন্ন তাদের জাতি, বিভিন্ন তাদের পরিচ্ছদ, বিভিন্ন তাদের ভাষা। এক নয় তাদের জীবিকা অর্জনের প্রণালীও।—ছড়িয়ে আছে তারা বোম্বাই ও বৃহত্তর বোম্বাইয়ের দিকে দিকে। জানা যায় তাদের স্বরূপ মেরিন ড্রাইভের সৈকতে সান্ধ্যভ্রমণে। জানা যায় ছুটির দিনেও, ছুটির দিনে বোম্বাইবাসী বহির্ভ্রমণে বার হন। যান সারা বোম্বাইবাসী, যান সপরিবারে। ব্যতিক্রম শুধু প্রবাসী বাঙালীরা। কেউ যান খাওয়া-দাওয়া সেরে, কেউ টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার সঙ্গে নিয়ে, কেউ মহালক্ষ্মীতে যান, কেউ জুহুর, উর্লির, দাদরের, মহিমের আর মেরিনের সমুদ্র-সৈকতে। কেউ বা মালাদে, খারের রামকৃষ্ণ আশ্রমে, যোগেশ্বরীতে, কানেরিতে, মালাবার পাহাড়ের শূন্য উদ্যানে, যান আরও কত স্থানে—এলিফ্যাণ্টাতেও আসেন। সমস্ত দিন গল্পগুজব আর ছুটোছুটি করে কাটিয়ে, সন্ধ্যার পর স্বগৃহে ফিরে আসেন। তাই সীমাহীন ভীড় হয় বৈদ্যুতিক ট্রেনে। সহজ হয় না ট্রেনে ওঠা, হয় বিপদসঙ্কুলও, উঠতে হয় মারামারি করে। প্রতিটি বাসস্ট্যাণ্ডেই সৃষ্টি হয় এক ফার্লং দীর্ঘ কিউ, দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাসে স্থানসংগ্রহের অপেক্ষায়। চলে যায় নাকের উপর দিয়ে কত বাসও। পরিপূর্ণ নির্দিষ্ট আসনের সংখ্যা, তাই নাই প্রবেশের অনুমতি। অপেক্ষা করতে হয় এক ঘণ্টা কখনও দু'ঘণ্টা। উত্তীর্ণ হয় ধৈর্যের সীমা, শেষে বাসে আসন মেলে। তবুও শেষ নাই তাঁদের বহির্গমনের।

স্বর্ণপ্রসূ বোম্বাই নগরী। কর্মমুখর তার অধিবাসীরা, সুরু হয় তাদের কার্যের প্রস্তুতি রাত্রি তিনটে থেকেই। বেশীর ভাগ পরিবারেই নাই রান্নার

পাট। হোটেলে গিয়ে তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। সেখানেও দীর্ঘ কিউ। পরিশ্রম করে সমস্ত দিন, করে অর্থ উপার্জন।

মহারাষ্ট্রীয় ছাড়া নাই আর কারও সামাজিকতার বালাই, নাই আত্মীয়-স্বজনের আসা-যাওয়া। তাই ছুটির দিনে তারা বর্হিভ্রমণে বার হয়ে সারা সপ্তাহের পরিশ্রম পুষিয়ে নেয়, দূর হয় ক্লান্তি।

তা ছাড়া গৃহেও স্থানাভাব বোম্বাই শহরে। নাই পর্যাপ্ত স্থান বৃহত্তর বোম্বাইয়ের গৃহেও। বাস করতে হয় সপরিবারে, অধিকাংশ অধিবাসীকেই এক কিংবা দুখানি ঘরে। তাই নাই তাদের গৃহের আকর্ষণ। সুখের আর স্বাচ্ছন্দ্যের নয় গৃহের বাসও, নয় আনন্দেরও। তাই তারা ছুটির দিন বাহিরে কাটায়। কাজ থেকে ফিরে এসে অন্যদিন পার্কে কাটায়। কাটে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত গল্পগুজবে। তারা হোটেলে আর রেস্তোঁরাতে খায়, কাটায় আপিসে আর উদ্যানে, অসুখ হলে যায় নার্সিংহোমে। তাই বোম্বাই শহরে আর বৃহত্তর বোম্বাইতে প্রতিটি রাস্তার মোড়েই আছে এক বা একাধিক উদ্যান, রেস্তোঁরা আর নার্সিং হোম।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মন্দিরে প্রবেশ করি। নির্মিত হয় এই মন্দিরটিও অষ্টম শতাব্দীতে। রাষ্ট্রকুট রাজারাই নির্মাণ করেন। শৈব মন্দির। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে এক সমতল উপত্যকার উপর, ১৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১২৯ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। নাই এই মন্দিরের সম্মুখভাগ, নির্মিত হয় এলোরার প্রসিদ্ধ মন্দির, ডুমার লেনার অনুকরণে। মণ্ডপের সামনে রচিত হয় তিনটি প্রবেশদ্বার, একটি কেন্দ্রস্থলে আর দুইটি দুই প্রান্তে। সেই প্রবেশ-পথ দিয়ে মন্দিরে আলো প্রবেশ করে, আলোকিত হয় মণ্ডপ, হয় ভিতরের দুইটি গর্ভগৃহও। সৃষ্টি হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে এক মহাশান্তির আর মহা পবিত্রতার পরিবেশ।

আমরা কেন্দ্রস্থলের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, মন্দিরের প্রশস্ত মণ্ডপে প্রবেশ করি। দাঁড়িয়ে আছে দুইটি করে সিংহ সোপানশ্রেণীর দুইদিকে, প্রহরী তারা মন্দিরের। অনুরূপ উড়িষ্যার খণ্ডগিরির জৈন গণেশ-গুম্ফার। প্রহরী সেখানে হস্তী। নির্মাণ করেন সেই গুম্ফা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে চেতবংশের মহাপরাক্রমশালী কলিঙ্গ রাজা, খারবেল।

দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডপটি অনেকগুলি স্তম্ভের উপর। কোনটি পনের ফুট উঁচু কোনটি বা সতের ফুট। অনবদ্য এই স্তম্ভগুলি। অষ্টকোণ তাদের নিম্নাংশ। বাঁশির আকারে রচিত তাদের কেন্দ্রস্থল, অঙ্গে নিয়ে শিরা। শীর্ষদেশে শোভা পায় বৃত্তাকার গদি। দেখেছি এলে রাতেও অনুরূপ স্তম্ভ। বিস্মিত হয়ে তাদের অঙ্গের শিল্পসম্ভার দেখি। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। স্তম্ভের সারি দিয়েই রচিত হয় কেন্দ্রস্থল আর গলিপথ। হয় দুই পাশের উইংস (পার্শ্বপ্রকোষ্ঠ)ও। অপরূপ এই পরিকল্পনা দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

গর্ভগৃহে উপনীত হই। নির্মিত হয় দুইটি পৃথক গর্ভগৃহ, বুকে নিয়ে লিঙ্গ। চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ, গর্ভগৃহের দুই পাশে দেখি দুইটি বৃহৎ মূর্তি। মূর্তি রক্ষাকর্তার, মূর্তি দ্বারপালের।

মন্দির দেখে মন্দিরের পিছনের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের সামনে উপস্থিত হই। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে তিনটি অতিকায় দ্বারপাল। দ্বারপাল নয় দানব তারা। দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ কুলুঙ্গীর মধ্যে। পৃথক হয়ে আছে কুলুঙ্গিগুলি দুই পাশের উদ্গাত স্তম্ভ দিয়ে। অপরূপ এই উদ্গাত স্তম্ভের অঙ্গের ও শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারও। বামে, পূর্বদিকের প্যানেলের অঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে অর্ধনারীশ্বর, শিবের নারী এবং পুরুষরূপে প্রকাশ—আছে পুরুষের বলবীর্য, আছে নারীর স্নেহ, তার অপরিসীম করুণাও। দক্ষিণে, বিপরীত দিকের প্যানেলে বিরাজ করেন হরপার্বতী, শিবাণীকে সঙ্গে নিয়ে শিব, দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে মহিমময় অনবদ্য এই মূর্তিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। সৃষ্টি হয় এক অলৌকিক ঐশ্বরিক পরিবেশও।

কেন্দ্রস্থলে একটি তেইশ ফুট উচ্চ, উনিশ ফুট প্রস্থ কুলুঙ্গির মধ্যে, সতর ফুট দশ ইঞ্চি উঁচু, মহামহিমময় ত্রিমূর্তি মহেশ্বর বিরাজ করেন। মহেশ্বর সৃষ্টিকর্তা, মহেশ্বর প্রলয়ঙ্কর আর উমা-মহেশ্বর।

কেন্দ্রস্থলে তিনি তৎপুরুষ, সৃষ্টি করেন জগৎ, অধিকর্তা সৃষ্টি ও স্থিতিরও, তাই প্রশান্ত, সৌম্য তাঁর আনন। শিরে শোভা পায় সুউচ্চ বহুমূল্য মুকুট, আকৃতি তার স্তম্ভের মত, প্রতীক অনন্তের অধিকর্তার। বৃষস্কন্ধ তিনি, তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় মূল্যবান মুক্তার মালা, এক হস্তে তিনি ধারণ করেন বৃত্তাকার ফল আর এক হস্তে জপের মালা।

দক্ষিণে তিনি মহাপ্রলয়ঙ্কর ভৈরব। বিনাশ করেন জগৎ, বিলুপ্ত হয় সৃষ্টি। তাই ক্রোধে প্রদীপ্ত তাঁর নয়ন। তাঁর রোষদীপ্ত বদনে শোভা পায় শ্মশ্রু, মস্তকে দীর্ঘ জটা। চূড়ার আকারে সজ্জিত সেই জটা, নেমে আসে স্তরে স্তরে স্কন্ধের উপর। জটা দিয়ে আবৃত হয় স্কন্ধ। জটার অঙ্গে শোভা পায় পুষ্প। রচিত হয় একটি নরকঙ্কালও তার অঙ্গে, প্রতীক প্রলয়ের। হস্তে ধরে আছেন একটি ক্রুদ্ধ সর্প, বিস্তৃত তার ফণা, উদ্যত তাঁর মুখ দংশনে। বামে তৃতীয় আননে তিনি বামদেব-উমা, দেবীরূপী শিব, চিরকল্যাণময়ী, মূর্তিমতি দয়া আর করুণা। তাই অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত তাঁর আনন, বিরাজ করে সেই আননে মহাপ্রশান্তি। তাঁর শিরে শোভা পায় কুঞ্চিত কুন্তল। নেমে আসে সেই কুন্তল তাঁর স্কন্ধের উপর। শোভিত হয়ে আছে কুন্তল বিভিন্ন বহুমূল্য অলঙ্কারে, মণিমুক্তাখচিত ঝাপ্টায় আর টায়রাতে। কর্ণে তাঁর মূল্যবান হীরার দুল। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই ত্রি-মূর্তির অপরূপ রূপ, দেখি বিস্ময়ে মূক হয়ে, তুলনাহীন সৃষ্টি এক মহা-প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ ভাস্করের। ঋষি তিনি, রচনা করেন প্রস্তরের অঙ্গে এক মহামহিমময় দেবতাকে। অনবদ্য গঠনে, নিরুপম প্রকাশে, পবিত্রতম বিকাশে! রচনা করেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, ঢেলে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী। করেন এক মহা গৌরবময় সৃষ্টি, দেবলোকে পরিণত হয় মন্দির, পরিণত হয় স্বর্গপুরীতে।

দেখি দাঁড়িয়ে আছে ত্রিমূর্তির দক্ষিণে ও বামে দুই দ্বারপাল পাশে নিয়ে দুইটি বামন। মহিমময় তাঁরাও, তাঁদের শিরেও শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরক কুণ্ডল। অনবদ্য তাদের গঠন সৌষ্ঠবও, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের, দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ঘুরে ঘুরে দেখি প্রাচীরের গাত্রে অপরূপ মূর্তিসম্ভার, দেখি এক মহিমময় ভৈরবের মূর্তিও, দেখি শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ। দেখি পার্বতীর মস্তকের উপর উড়ন্ত বিদ্যাধরীর দল। দেখেছি অনুরূপ দৃশ্য এলোরার ডুমারলেনাতে। সমসাময়িক এই দৃশ্যের।

দেখে মুগ্ধ হই শিবের তাণ্ডব নৃত্য। দেখি এক মহামহিমময় দশ ফুট উঁচু শিব, তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার মুকুট অনুরূপ ত্রিমূর্তির শিরোভূষণের। কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে জড়োয়ার বাজু, ভগ্ন মণিবন্ধ,

ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তাঁর পদযুগলও, কটিদেশে কোমরবন্ধ, বিস্তৃত দক্ষিণ উরু পর্যন্ত, নাই চিহ্ন বাম উরুর, শুনি পর্তুগীজ জলদস্যুরাই ধ্বংসে পরিণত করেছে এই অনবদ্য মূর্তিটিকে, ধ্বংস করেছে আরও অনেক মূর্তি। নৃত্য করেন নটরাজ, করেন তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস হয় পৃথিবী, পরিণত হয় মহাশ্মশানে, শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় ভক্তদের অন্তঃকরণও, চূর্ণ হয় তাদের অহঙ্কার। বিচ্ছিন্ন হয় মায়ার বন্ধন, কিন্তু শেষ নাই নটরাজের নৃত্যের, অন্তহীন সেই নৃত্যও। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে চলে সৃষ্টির রহস্য, সাধিত হয় জীবন ও মৃত্যু। তাই অপরূপ সেই নৃত্যের ছন্দ। দেখেন সেই নৃত্য স্বর্গের দেবতারাও, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ উড়ন্ত অবস্থায়।

দেখি রাক্ষস রাজা লঙ্কাধিপ রাবণ স্বর্গের কৈলাসকে আন্দোলিত করছেন, দেখেছি অনুরূপ দৃশ্য এলোরার কৈলাসের মন্দিরে, দেখেছি মহীশূরের দ্বারসমুদ্রের মন্দিরে, তাদেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ বুকে নিয়ে আছে এলিফ্যাণ্টার প্রাচীরের গাত্র।

দেখি বেষ্টন করে আছেন শিব আর পার্বতীকে কত দেবতা, কত দেবী, বর্ষিত হচ্ছে পুষ্প তাঁদের শিরে। অনবদ্য এই দৃশ্যটিও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, ঘুরে ঘুরে দেখি প্রাচীরের অঙ্গের মূর্তিসম্ভার। যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য রূপদান, প্রতীক তারা শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূট ভাস্কর্যের। তাই এলিফ্যাণ্টা অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের ভাস্কর্যের দরবারে।

অধ্যক্ষের বাংলোতে ফিরে এসে পরিচালক-গৃহিণীর প্রস্তুত গরম গরম উপাদেয় খিচুড়ী খেয়ে আবার মন্দির দর্শনে যাই।

নির্মিত হয় একটি উপমন্দির, মূল মন্দিরের সংলগ্ন। তার পূর্ব কোণে এই ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রার্থনা-কক্ষের সামনেও দেখি একটি সোপানশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে অর্ধভগ্ন অবস্থায়। দাঁড়িয়ে আছে তার দুপাশেও দুইটি সিংহ-প্রহরী মন্দিরের। দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নাবস্থায় সংলগ্ন মন্দিরটি, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে কিন্তু বুকে নিয়ে আছে নিখুঁত রমণীয় শিল্পসম্ভার, কত সুন্দরতম অলঙ্করণ, পরিচায়ক পূর্ব গৌরবের, সমন্বয় মূল মন্দিরের সংলগ্ন মন্দিরেরও। দেখি মন্দিরের প্রাঙ্গণ নীচু হয়ে নেমে গিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে একটি অগভীর জলাশয়।

খুব সম্ভব এই জলাশয়েই পূজা হ'ত সর্পদেবতার, নাগের পূজারী হিন্দুরা— তাই এই ব্যবস্থা।

উপমন্দির দেখে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাঁঠাল গাছের সুপক্ক কাঁঠালসহ চা পান করে জাহাজঘাটের অভিমুখে রওনা হই। ঘাটে পৌঁছে দেখি কিনারা থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে স্টীমারটি দাঁড়িয়ে আছে। ভাটার টানে কমে গিয়েছে কিনারার জল, লাঘব হয়েছে তার গভীরতা, তাই সম্ভব হয় নাই স্টীমারের পাড়ে লাগান। দেখি নোঙর ফেলে আছে দুইখানি বড় নৌকাও, সেই নৌকায় চড়েই যেতে হবে যাত্রীদের, উপনীত হতে হবে স্টীমারে। আমরা নৌকায় চড়ি, চড়েছে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ জন যাত্রীও। কিছুক্ষণ পরেই নৌকা ছাড়ে, অগ্রসর হয় মাঝ-সমুদ্রের দিকে। তরঙ্গের আঘাতে নৌকা দোলে, কাঁপে আমাদের অন্তঃকরণও, এক আতঙ্কে আর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়। কখন তলিয়ে যাবে নৌকা আরবের অতল তলে, হবে সকলের সলিল-সমাধি। অগ্রসর হয় নৌকা, বাড়ে তরঙ্গের উদ্দামতা বর্ধিত হয় নৌকার কম্পনও। সীমাহীন আতঙ্কে ছেয়ে ফেলে আমাদের অন্তঃকরণ। মনে মনে স্মরণ করি বিপদের বন্ধু বিপদবারণ নারায়ণকে। জানতেও পারি না কখন মহিলারা গা ঘেঁষে বসেছেন, মুদ্রিত তাঁদের নয়ন। অবশেষে নৌকা ক্রমে স্টীমারের গায়ে লাগে, দূর হয় আমাদের আশঙ্কা, অবসান হয় আতঙ্কেরও, কিন্তু লাঘব হয় না কষ্টের। নৌকা থেকে একটি ঝোলান দড়ির সিঁড়ি বেয়ে স্টীমারের ডেকে উপনীত হতে হয়। লম্বিত সেই সিঁড়ি স্টীমারের পিছন দিকে, কষ্টসাধ্য এই আরোহণ, দুঃসাধ্য মহিলাদের পক্ষে। ঢেউ-এর দোলায় কম্পিত হয় নৌকা, হয় স্থানচ্যুতও প্রতি মুহূর্তেই। একবার সিঁড়ি এগিয়ে আসে, ধরতে যাই হাত বাড়িয়ে, স্থানচ্যুত হয় নৌকা, সিঁড়ি চলে যায় নাগালের বাইরে। জানি না কেমন করে আর কখন দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলি সিঁড়ি, উঠে যাই স্টীমারেও। ওঠেন অতি কষ্টে, একে একে মহিলারাও, সবশেষে বন্ধুবরেরাও।

কিন্তু সম্ভব হয় না দ্বিতীয় নৌকাখানির স্টীমারের সংলগ্ন হওয়া, বুকে নিয়ে শতাধিক যাত্রী। স্টীমারের দশ গজ দূরে এসে হঠাৎ রুদ্ধ হয় তার গতি। এক বিপুল উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কাত হয় নৌকা এক পাশে,

নিমজ্জিত হয় সমুদ্রের জলে। শুধু ভেসে থাকে তার গলুই। শত কণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ করুণ মর্মভেদী আর্তনাদে পরিপূর্ণ হয় দিগন্ত, ভরে যায় আকাশ বাতাস। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ভেসে যায় নৌকা বিপরীত দিকে, স্রোতের টানে, ...কে নিয়ে শতাধিক মৃত্যু-পথযাত্রী। দাঁড়িয়ে দেখেন সেই যাত্রা নিষ্পলক নেত্রে, আমাদের জাহাজের কর্মকর্তারা, দেখে খালাসীরাও। সম্ভব নয় আমাদের জাহাজের পশ্চাদনুসরণ, নয় যুক্তিসঙ্গত, নইলে জাহাজের ঢেউয়ে ডুবে যাবে নৌকা, হবে সকলের জীবনান্ত। কম্পিত বক্ষে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, আমরাও দেখতে থাকি তার অগ্রগতি, অপেক্ষা করতে থাকি কখন আসবে সেই অন্তিম মুহূর্ত, নিমজ্জিত হবে নৌকা সাগরের অতল তলে।

হঠাৎ দূরে বেজে উঠে ঘন ঘন স্টীমারের বাঁশী। দেখি বিদ্যুৎ-গতিতে, দিকচক্রবাল থেকে, আসে একটি ক্ষুদ্রকায় স্টীমার। অগ্রসর হতে থাকে ভেসে যাওয়া নিমজ্জমান নৌকার দিকে। সাড়া পড়ে যায় আমাদের স্টীমারের কর্মকর্তা ও খালাসীদের মধ্যেও। মুহূর্ত মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে দেয় স্টীমার, অনুসরণ করে নৌকার। মন্থর তার গতি, বিশ গজ দূরে এসে থামে।

উপনীত হয় তৎক্ষণে ক্ষুদ্রকায় স্টীমারটিও নৌকার কাছে, নিক্ষেপ করে দড়ি। হাত বাড়িয়ে অতি কষ্টে নৌকার মাঝি সেই দড়ি ধরে। সংলগ্নীভূত হয় নিমজ্জমান নৌকা আর স্টীমার। দেখি অর্ধ-নিমজ্জিত হয়েছে নৌকা সাগরের তলে। দাঁড়িয়ে আছে হাঁটু সমান জলে, নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী অঙ্কে নিয়ে শিশু। দাঁড়িয়ে আছে মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, পার্শী, দক্ষিণ ভারতীয় ও ইহুদী। সুনিশ্চিত মৃত্যু-পথযাত্রী তাঁরা, ফুটে ওঠে তাঁদের মুখের উপর এক সীমাহীন আতঙ্কের ছায়া, এক নিশ্চিত মৃত্যুর অভিশাপ। আতঙ্কিত অন্তঃকরণে, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরাও দেখি তাদের একে একে স্টীমারে আরোহণ। শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। গভীর রাত্রিতে বাসায় ফিরে আসি। কিন্তু আজও ভুলতে পারি নি সেই দৃশ্য। ভেসে ওঠে চোখের সামনে নিভৃতে—নির্জনে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অজন্তা

১। অজন্তার চৈত্য ২। অজন্তার বিহার

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। বোম্বাইতে বদলি হই। সঙ্গে নিয়ে যাই দুটি বাসনা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। দেখব অজন্তা ও এলোরা, দর্শন হবে প্রভাসতীর্থও। দেখা হয় অজন্তা ও এলোরা, হয় না প্রভাসতীর্থ, সম্পূর্ণ সফল হয় না বাসনা।

আমরা তখন কলেজে পড়ি; স্থরু হয় ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা। পুরোধা হন ঋষি অবনীন্দ্রনাথ, হন অগ্রণী। শুনি, ভারতীয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে অজন্তা। খবর পান শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শোনেন কলকাতাতে ঋষি অবনীন্দ্রনাথ আর ভগ্নী নিবেদিতা। অজন্তায় প্রেরিত হন উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু আর অসিত হালদার।

কিছুদিন পরেই অসিত হালদার ফিরে আসেন। অজন্তা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জানা যায় অঙ্কিত আছে নাকি অজন্তার প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে অনবদ্য চিত্রসম্ভার, নাই বিশ্বের অন্য কোন স্থানে। বিস্মিত হই দেখে তাদের অনুলিপি মাসিক পত্রিকার পাতায়, মুগ্ধ হই তাদের সৌন্দর্যে ও বর্ণ-স্থষমায়।

শুনি ফিরে আসেন না নন্দলাল। অজন্তাতে বাসা বেঁধে তিনি সেখানকার চিত্রাবলী পর্যবেক্ষণ করেন, অনুশীলন করেন তাদের অঙ্কন পদ্ধতি, তাদের গঠন-সৌষ্ঠব আর বর্ণ-বিন্যাস। প্রেরণ করেন তাদের অনুলিপি প্রতি মাসে শান্তিনিকেতনে। সেগুলি মাসিকের পাতায় প্রকাশিত হয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তাদের অনবদ্য গঠন-সৌষ্ঠব আর তুলনাহীন বর্ণ-স্থষমা। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অজন্তায় অতিবাহিত করে নন্দলাল দেশে ফিরে আসেন, আসেন জয়যাত্রা থেকে, বিজয়ের মুকুট শিরে ধারণ করে, সঙ্গে নিয়ে আসেন অজন্তার চিত্রের অসংখ্য অনুলেখন। পায় দিনের আলোক, লুক্কায়িত ছিল এতদিন

যা গুহার অন্ধকারে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্রশিল্পের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ, তাঁর জয়ের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। বাসনা জাগে অজন্তা দর্শনের অন্তরের গহনতম প্রদেশে।

ফারগুসানের গ্রন্থে এলোরার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা অবগত হই, বাসনা হয় স্থপতির এই অপরূপ কীর্তির নিদর্শন দেখবারও।

তাই যখন বোম্বাইতে বদলির আদেশ পাই, ভাবি সত্যিই আসে বুঝি সে সুযোগ এতদিনে। সহজ হয় অজন্তা আর এলোরা দর্শন, সফল হয় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের এক প্রবল বাসনা, লুক্কায়িত থাকে যা মনের মণিকোঠায়।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতা বর্ধিত হয়েছে, উপনীত হয়েছে শিখরে। পতন হয়েছে সিঙ্গাপুরের, ব্রহ্মদেশ জাপানীদের অধিকারে এসেছে। বেঁটে জাপানী হানা দিচ্ছে ভারতের পূর্ব প্রান্তে, উপনীত হয়েছে আসামে, ইম্ফলে। হাওয়াই জাহাজের বুক থেকে, প্রতিদিন জাপানী বোমা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, আসামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বাদ যায় না চট্টগ্রাম, বর্ষিত হয় দু'দিন কলিকাতাতেও। কখন তারা আসাম অতিক্রম করে বাংলায় প্রবেশ করবে, সেখান থেকে সারা ভারতবর্ষে, তার নিশ্চয়তা নেই। জাপানী ভীতিতে আতঙ্কিত ইংরেজ, কম্পিত আমেরিকানরাও। ক্ষুদ্রকায় জাপানী, নাই তাদের প্রাণের ভীতি, মানে না তারা কোন বাধা, গ্রাহ্য করে না বিঘ্ন, হাওয়াই জাহাজ নিয়ে যেখানে সেখানে যখন তখন নেমে পড়ে, যুদ্ধ করে প্রাণপণে, সর্বদা প্রস্তুত নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে, সম্ভব নয় এমন জাতের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

কিন্তু ভারতবর্ষকে বাঁচাতেই হবে, রক্ষা করতে হবে জাপানীদের হাত থেকে। নইলে বন্ধ হয়ে যাবে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ। তৈরি হচ্ছে যুদ্ধের উপকরণ ভারতের সমস্ত কারখানাতেই, "ক্যামুফ্লাজ" জালের অন্তরালে। নির্মিত হচ্ছে সব রকমের অস্ত্রশস্ত্রই। আমেরিকান অর্থে নূতন কারখানা গড়ে উঠেছে ভারতের দিকে দিকে। নির্মিত হয়েছে কত সুদূর প্রশস্ত রাজপথও, সংযুক্ত হয়েছে কারখানা আর ডিপোগুলি বৃহৎ শহরের ও মহানগরীর সঙ্গে। তৈরি হচ্ছে সর্বপ্রকারের যুদ্ধোপকরণই, সীমাহীন তাদের পরিমাণও। প্রেরিত হবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন আর যেখানে হবে তাদের

প্রয়োজন। রুদ্ধ হবে না সরবরাহের নির্মাণ, নইলে অচল হবে যুদ্ধ, হবে পরাজয় ইংরেজের! পরাজয়ের গ্লানি শিরে ধারণ করে পরিত্যাগ করতে হবে ভারতবর্ষ, এমন সুন্দর ও সুবিশাল জমিদারী হবে হস্তচ্যুত।

তাই তখন আসে হাজারে হাজারে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈনিক, আসে প্রতিদিন। জাহাজ-ভরতি করে অবতরণ করে বোম্বাইয়ের বন্দরে, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে আসামের যুদ্ধক্ষেত্রে—রুদ্ধ করতে যায় জাপানীদের অগ্রগতি। প্রেরিত হয় যুদ্ধের উপকরণও, ট্রেনে করে, যায় ট্রাকে চড়েও। বিরামহীন এই যাওয়া, যায় রাত্রি দিন। তিল ধারণের স্থান নেই গাড়ীতে। প্রতি ট্রেনের সঙ্গেই উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী যান, তাঁদের হাতেই ন্যস্ত যাত্রীদের স্থানের ব্যবস্থার দায়িত্ব, নির্ভর করে তাদের মর্জির উপরই অসামরিক লোকের ট্রেনে স্থান মেলাও, মেলেও কদাচিৎ। তার উপর ট্রেন ছাড়বার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, নেই পৌঁছোবারও। সামরিক "স্পেশাল" দিন রাত্রি যাচ্ছে, দিতে হয় তাদের যাওয়ার পথ, দাঁড়িয়ে থাকতে হয় "সাইডিং"-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই সম্ভব হয় না নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনের চলাচল, বিলম্ব হয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে। তাই বন্ধ তখন বোম্বাইতে সহজ যাতায়াত, বিষম কষ্টসাধ্য, অনিশ্চিতও। অসম্ভব রেলের টিকিট কেনাও। পরিমিত স্থানের সংখ্যা, তাই ভোর হওয়ার আগেই "কিউ"-এ গিয়ে দাঁড়াতে হয়, নিশ্চয়তা নেই টিকিট পাওয়ারও।

কল্পনাতীত মোটরে ভ্রমণ। সামরিক ট্রাক চলে রাত্রি দিন, তাদের ফাঁকে মালে-ভরতি অসামরিক লরি, স্থান নেই অন্য গাড়ির যাতায়াতের, তার উপর আবার পেট্রলের র‍্যাশন।

তবুও ত্রুটি নাই অজন্তায় যাত্রার চেষ্টার। পরিচিত বন্ধুদের অনেকেই অজন্তা দেখেছেন, তাই পাই না তাঁদের কাছে কোন উৎসাহ। শুনি নিষেধের বাণী। বলেন, উচিত হবে না যাওয়া এমন পরিস্থিতিতে, হবে না যুক্তিসঙ্গতও। কলিকাতা মেলে চড়ে মানমাদ পর্যন্ত যেতে হবে। সেখান থেকে নিজামের ট্রেনে করে ঔরঙ্গবাদ। ঔরঙ্গবাদ থেকে উত্তর-পশ্চিমে চোদ্দ মাইল দূরে এলোরা। পথে সপ্তম মাইলে দেবগিরি বা দৌলতাবাদের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ, আরও

তিন মাইল দূরে অহল্যাবাই-এর মন্দির। বিপরীত দিকে উনসত্তর মাইল দূরে অজন্তা। নাই কোন ব্যবস্থা বাসের, যেতে হবে ট্যাক্সি করে।

দেখতে দেখতে দু বৎসর অতিবাহিত হয়, কমে আসে বোম্বাই-এর স্থিতির আয়ু। পরিত্যাগ করতে হয় অজন্তা দেখার আশাও। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে ঔরঙ্গাবাদের স্টেশন মাস্টারকে একখানি চিঠি লিখি। জানতে চাই অজন্তা-এলোরা যাওয়ার ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না, মিললে কত ভাড়া লাগবে আর প্রতি ট্যাক্সিতে কজন যাত্রী নেবে। সাতদিনের মধ্যেই উত্তর আসে, ট্যাক্সি মিলবে, যত চাই। নিজামের মুদ্রায় নব্বই টাকা ভাড়া দিতে হবে প্রতি ট্যাক্সির। যাত্রী নেবে চারজন। দুদিনের মধ্যেই দেখিয়ে দেবে যা কিছু আছে দর্শনীয়, নাই কোন নিষেধ বাড়তি শিশু নেওয়ারও। লেখেন, তিনিই ট্যাক্সি বন্দোবস্ত করবার ভার নেবেন, ব্যবস্থা করবেন আমাদের তিনদিনের বাসেরও স্টেশনের সংলগ্ন ধর্মশালায় অথবা রেস্ট-হাউসে। আমাদের ঔরঙ্গাবাদে পৌঁছাবার দিন ও ক্ষণ আগে জানালে স্টেশনেও উপস্থিত থাকবেন।

চিঠি পড়ে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অবিলম্বে চিঠি হাতে নিয়ে পাশের কামরায় প্রবেশ করি। সেখানে আমার সতীর্থ কেদার বসু বসেন। তাঁর বাড়ী বিক্রমপুরে। তিনি খাঁটি দেশী ভাষায় কথা বলেন। উদার তাঁর অন্তঃকরণ, কিন্তু সহজেই বিচলিত হন। তিনি সম্প্রতি বোম্বাই-এ এসেছেন, আজও দেখেন নাই এলোরা ও অজন্তা। বসু সাহেব চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলেন, "হ যাইতে ত হইবই, আর কে যাইব লগে ?"

বাড়ীতে ফিরে শুনি, বন্ধুবর হাজরাও দেখেন নাই অজন্তা। সন্ধ্যাবেলা দাদর আর মাতুঙ্গার সন্ধিস্থলে তাঁর বাসায় উপনীত হই। হাজরা সুপ্রতিষ্ঠিত, নিরীহ, ভদ্র, ধীর, গম্ভীর। বলেন, তাঁরাও যাবেন। হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে কেদারকে খবর দিতে যাই। পথে বহু-পুরাতন বন্ধু, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, বন্ধুবৎসল, কৃতকর্মা সিংহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। বলেন, তিনিও সঙ্গী হবেন, কিন্তু একাকী যাবেন। একবার সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করেছিলেন প্রথম যখন বোম্বাইতে আসেন। তাঁকেও দাদরে কেদারের বাসায় সঙ্গে করে নিয়ে যাই। স্থির হয় আমি আমার স্ত্রী ও কন্যা, কেদার তার স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্র,

সস্ত্রীক সকন্যা হাজরা আর সিংহ সাহেবকে নিয়ে দল তৈরী হবে। পুরোধা হবেন সিংহ সাহেব। জ্যেষ্ঠ তিনি বয়সে, অবগত এলোরা ও অজন্তার বিষয়। একজন ভাল চাকরকেও সঙ্গে নিতে হবে, ভার নেবে সে রান্নার ও শিশুদের। যাত্রা করব আগামী শনিবার। কে কি সঙ্গে নেবেন আর কি কি জিনিস নেওয়া হবে, তাও স্থির হয়। রচিত হয় ফর্দ। আমার উপরে ভার বাড়ী থেকে সন্দেশ তৈরী করে নেওয়ার। খেতে হবে রাস্তায়; লাগবে সেখানকার স্থিতির সময়ও। নিয়ে যাব টিফিন-ক্যারিয়ারে ভর্তি করে। হাজরাদের উপর মাংসের ভার, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে অজন্তা যাত্রার প্রাক্কালে। বসুদের উপর ভার ডিমের কারি ও ডিম সেদ্ধ। উদরস্থ করা হবে যখন প্রয়োজন হবে। সিংহ মহাশয় নেবেন ড্রাই ফ্রুট। অফুরন্ত তার সরবরাহ, দিতে হবে সবাইকে যাত্রার সুরু থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত। তা ছাড়া একটি বড় হাঁড়ি ও একটি কড়াই নিতে হবে। গোটা চারেক কাঁচের গ্লাস, এক সেট চায়ের বাসন, দুটি সোরাই আর গোটা দুই জলের বোতলও। নিতে হবে ডবল রুটি। প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, মসলাপাতি। বাঁধাকপি, আলু, এক পাউণ্ড চা, সের দুই-তিন চিনি ও একটি হরলিক্সের শিশি। ডজন কতক কলা ও তিন ডজন কমলালেবুও নিতে হবে। পুরোধা সিংহ সাহেবই জিনিসপত্র কেনার ও সংগ্রহের ভার নেন। আমাদের যাত্রার তারিখ ও সময় জানিয়ে ঔরঙ্গাবাদ স্টেশন মাস্টারকেও চিঠি লিখে দিই।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী, খাওয়া-দাওয়া সমাপন করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা কেদার বসুর বাড়ীতে সমবেত হই। আসেন না শুধু সিংহ সাহেব। তাঁর বাসায় লোক পাঠাতে যাব এমন সময় দেখি তিনি গজেন্দ্রগমনে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর পিছনে একটি কুলি, মস্তকে নিয়ে একটি বিরাট ঝুড়ি। সিংহ সাহেবের স্কন্ধে, বগলে আর হস্তেও চার-পাঁচটি বিভিন্ন আকৃতির ক্যানভাসের থলে ঝুলছে, সবগুলিই প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিপূর্ণ। বলেন, সব কিছুই যোগাড় হয়েছে, টিকিটও কেনা হয়েছে। এখন ট্যাক্সি ডাকিয়ে রওনা হতে বাকী। বলেন, সম্ভব নয় দাদরে গাড়ীতে স্থান পাওয়া, উঠতে হবে ভি. টি. থেকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই তুই ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র বোঝাই করে আমরা ভি. টি. অভিমুখে রওনা হই।

ভি. টি.তে পৌঁছে দেখি অসম্ভব গাড়ীতে ওঠা। নাই স্থান পা রাখবারও, কোথায় রাখা হবে জিনিসপত্র? প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি করে বিছানা ও স্যুটকেশ এসেছে, তার উপর সিংহ সাহেবের আনা ছোট-বড় পাঁচটি থলি আর বিরাট ঝুড়ি।

তিন মহিলাকে অতি কষ্টে পুত্র-কন্যা ও জিনিসপত্র নিয়ে একটি মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা মধ্যম শ্রেণীতে উঠি, কোনপ্রকারে সোজা হয়ে দাঁড়াবার স্থান মেলে।

মহিলারা যে কামরাতে প্রবেশ করেন, অধিকার করেছিলেন সেই কামরা চারজন ইংরেজ মহিলা। তাঁরা সহ্য করতে পারেন না আমাদের মহিলাদের এই অনধিকার প্রবেশ, জানান অসম্মতি। বচসা হয় তুই দলে। আমাদের দলের পুরোধা হন মিসেস পুতুল বসু এম.এ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। বি.এ. পাস লীলা হাজরাও সপ্রতিভ, আননে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি। শুধু আমার স্ত্রীই সক্ষম হন নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করতে কিন্তু তীক্ষ্ণধী তিনিও, বান্ধবী-গৌরবে গৌরবান্বিতা। বলেন, সুপণ্ডিতা তাঁর অধিকাংশ বান্ধবী, নাই বা হলেন তিনি বি.এ., এম.এ.। সদাহাস্যময়ী কৌতুকপ্রিয়া তিন জনই। কারণে অকারণে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখর হয় গৃহ, ঝঙ্কৃত হয় চতুর্দিক। শেষে পরাজয় স্বীকার করেন বিদেশিনীরা। কামরা পরিত্যাগ করে স্থান সংগ্রহ করেন অন্য কামরায়।

রাত্রি আড়াইটায় ট্রেন মান্‌মদ স্টেশনে উপনীত হয়। আমরা ট্রেন বদল করে ঔরঙ্গাবাদের গাড়ীতে গিয়ে উঠি। প্রাচুর্য স্থানের, তাই সকলে এক কামরা দখল করে বিছানা খুলে শয্যা বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভোর পাঁচটায় ট্রেন ধীরে ধীরে ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনে এসে থামে। স্টেশনে নেমে দেখি স্টেশন মাস্টার মহাশয় আমাদের প্রতীক্ষা করছেন। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর কামরায় নিয়ে গিয়ে বসান। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেশন থেকেই গরম চা পান করে আমরা ধর্মশালায় উপস্থিত হই। পথ দেখিয়ে নিয়ে যান স্টেশন মাস্টার। চৌকিদার ঘর খুলে দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,

সামান্য প্রয়োজনীয় আসবাবে সজ্জিত অতি প্রশস্ত এই কক্ষটি। আমরা মেঝেয় বিছানা পেতে একে একে শুয়ে পড়ি, আচ্ছন্ন হই গভীর নিদ্রায়। নিদ্রা যান না শুধু সিংহ সাহেব। নিযুক্ত তিনি আর একদফা চা প্রস্তুত করাতে, ব্যস্ত অজন্তায় যাওয়ার প্রস্তুতিতে।

সিংহ সাহেবের ডাকে গাত্রোত্থান করে স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা-গৃহের সংলগ্ন স্নানের ঘরে স্নান সমাপন করি। তার পর চা ও জলযোগ সেরে যাবার জিনিসপত্র দুই ট্যাক্সির পিছনে বেঁধে নিয়ে অজন্তা অভিমুখে রওনা হই। তখনও পূর্বাকাশে উদয়ভানুর আগমন হয় নি।

ট্যাক্সি বঙ্কিমগতিতে অগ্রসর হয়। কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে শহরের প্রান্তদেশে উপনীত হয়। একটি দ্বার অতিক্রম করে অজন্তার রাস্তায় পৌঁছোয়। ছোটে বিদ্যুৎগতিতে, সর্পিল পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে। কখনও উঁচুতে ওঠে, কখনও নীচে নামে। রাস্তার দুপাশে শুষ্ক, রুক্ষ বন্ধুর মাঠ, নাই তাতে সবুজের লেশ। নয় শস্যশ্যামল, তাই নয় নয়নাভিরামও। স্পর্শ করে দিগন্তের শৈলশ্রেণীর পাদদেশ। মাঝে মাঝে এক-একটি মহীরুহ। মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি প্রহরী, প্রহরী তারা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের। শুনি এই জমিতেই ফলে ব্যারোচের তুলা। সীমাহীন তাদের পরিমাণ, গুণেও তারা শ্রেষ্ঠ ভারতে। এখন কর্তিত হয়েছে তুলার বৃক্ষ, তাই শূন্য বুক নিয়ে পড়ে আছে মাঠ, হয়েছে নিরাবরণ, নিরাভরণও। ফসলের সময় আগত হলে আবার পরিপূর্ণ হবে তার বুক তুলার বৃক্ষে। স্বর্ণপ্রসূ এই জমি, মহাসমৃদ্ধশালী বারোচ।

প্রায় মাইল ত্রিশ অতিক্রম করে আমাদের ট্যাক্সি একটি চায়ের দোকানের সামনে এসে থামে। ট্যাক্সি থেকে নেমে চা পান করে আবার আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসি। ট্যাক্সি নক্ষত্রগতিতে ছোটে। মাইলের কাঁটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশে, পঞ্চাশ থেকে ষাটে ওঠে।

দেখতে দেখতে বদলে যায় রাস্তার রূপও। কখনও এগিয়ে আসে দূরের শৈলশ্রেণী। দূর থেকে দেখে মনে হয় রুদ্ধ হয় বুঝি পথ, বন্ধ হয় গাড়ীর গতি। আবার তারা সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ায়, ভরসা দেয় চলার নিরাপত্তার। দুই পাশের শুষ্ক, রুক্ষ, বন্ধুর মাঠও পরিবর্তিত হয় শস্যশ্যামল ক্ষেতে, প্রসারিত হয় তাদের সবুজ অঞ্চল, পর্বতমালার পদতল ধন্য হয় তাদের চরণ-স্পর্শে।

কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করে, অজন্তা থেকে পাঁচ মাইল দূরে, অজন্তা গ্রামে উপনীত হই। আছে এই গ্রামে একটি ডাক-বাংলো। সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয় রাস্তার রূপও, পরিণত হয় প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, এক নয়নাভিরাম লীলানিকেতনে। গাড়ী সর্পিলগতিতে চলে, দুপাশের সবুজ-ঘন বনবীথি আর লতাকুঞ্জ ভেদ করে। অতিক্রম করে শৈলমালা, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের বর্ণ—সবুজ, নীল, পীত, হরিদ্রা, রক্তাভ, গাঢ়লাল। উপনীত হয় একেবারে নিম্নতম প্রদেশে, এক সুন্দরতম শোভন-দৃশ্য পর্বতকন্দরে। তার বক্ষভেদ করে প্রবাহিতা এক রুপোলী, কলনাদিনী স্রোতস্বিনী।

গাড়ী থেকে নেমে স্রোতস্বিনীর শীতল জলে হাত-মুখ ধুয়ে আমরা গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী ছাড়ে। বঙ্কিম তার গতি—মন্থরও। অতিক্রম করে সবুজ ঘন বনে আচ্ছাদিত অপরূপ সুদুর্গম সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। ভেদ করে যায় নয়ন-মুগ্ধকর দুর্লঙ্ঘ্য ঘন নীল লতাগুল্মে আবৃত পর্বতকন্দর। প্রায় হাজার ফুট পর্বত আরোহণ করে অজন্তা পর্বতের সানুদেশে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে এসে থামে। গাড়ী থেকে নামি।

দেখি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সু-উচ্চ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এক মহামহিমময় ধ্যান-গম্ভীর মূর্তিতে, অঙ্গে নিয়ে আছে ঘন বন-বীথি, ভূষিত হয়ে আছে ঘন সবুজ আভরণে। প্রসারিত হয়ে আছে দিক্‌চক্রবালে। রচিত হয় তার ঋজু খাড়া বুকে এক স্বপ্নপুরী, এক অমরাবতী। নির্মিত হয় আটাশটি গুহামন্দির, চব্বিশটি বিহার ও চারিটি চৈত্য। রচনা করেন বৌদ্ধ স্থপতি, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। নির্মিত হয় অন্ধ্র-সাতবাহন, চালুক্য, বাকাটক ও গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, প্রেরণায় ও অর্থে। বুকে নিয়ে আছে এই সব চৈত্য আর বিহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, শ্রেষ্ঠ প্রতীক বৌদ্ধ ভাস্করের আর বৌদ্ধ চিত্রশিল্পীরও। নিদর্শন মহাগৌরবময় সৃষ্টির, অক্ষয় কীর্তির। বুকে নিয়ে আছে তাদের বহু শত বৎসরের সাধনার দান।

অবগাহিত তার শীর্ষদেশ অরুণোদয়ের প্রথম স্নিগ্ধ রশ্মিতে। তার পদতলে, গভীর অরণ্যসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ভেদ করে প্রপাতের আকারে বঙ্কিম গতিতে প্রবাহিতা নৃত্যচপলা কলনাদিনী স্রোতস্বিনী। শোনা যায় তার অন্তরের ধ্বনি, কানে ভাসে তার মৃদু গুঞ্জনও।

বিস্তৃত হয়ে আছে মন্দিরগুলি, কাস্তের আকারে প্রায় এক মাইল পরিধি নিয়ে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রকৃতির এই নিভৃত, নির্জন, মহিমময়, ধ্যানগম্ভীর সুন্দরতম পরিবেশ, এই রহস্যলোক। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের সামনে উপনীত হই। সঙ্গে নিয়ে যাই একজন অভিজ্ঞ প্রদর্শক। জমা দিয়ে যাই ডাইনামোর দর্শনী দশ টাকাও অপরিহার্য অজন্তার মন্দির দর্শনে। হ'ত যদি কিছু কম, সহজ হ'ত অনেকের পক্ষে দেওয়া।

প্রচারিত হয় বৌদ্ধধর্ম দিকে দিকে মহারাজা প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে খ্রীষ্টের জন্মের দু'শত ষাট বছর পূর্বে। গড়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে—প্রবল থাকে বৌদ্ধধর্ম সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত, বিস্তৃত হয় ভারতের বুকে বৌদ্ধ সভ্যতা আর সংস্কৃতি, সাজান বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্কর ভারতের বুক অনবদ্য স্তূপ, চৈত্য আর বিহার দিয়ে। নির্মিত হয় সুন্দরতম, সুষ্ঠু-গঠন স্তম্ভও অঙ্গে নিয়ে অনুপম অতুলনীয় শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে মহিমময় জীবন্ত মূর্তি-সম্ভার।

শোভিত করেন চিত্রশিল্পী এই সব বিহারের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ সুন্দরতম চিত্র-সম্ভারেও। মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, নিখুঁত রূপদান। সৃষ্টি হয় কত রহস্যলোক, কত স্বপ্নপুরী, কত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ।

রচনা করেন সাঁচীর তোরণ, নাসিকের, অজন্তার ও এলোরার বিহার, কার্লির ও অজন্তার চৈত্য, অমরাবতীর রেলিং, নাসিকের, কার্লির, অজন্তার ও ভারহুতের স্তম্ভ, বিদিশার আর অজন্তার স্তূপ। অজন্তার আর বাঘের চিত্র-সম্ভার। কল্পনাতীত তাদের পরিকল্পনা, তুলনাহীন, সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম রূপদান।

প্রবলতম হয় ভারতে হিন্দুধর্ম, প্রবলতর হয় জৈনধর্মও, ক্ষীয়মান হয় বৌদ্ধধর্ম অষ্টম শতাব্দীতে, অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে নবম ও দশম শতাব্দীতে। পরিত্যাগ করে যায় ভারত। যায় তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায় ও চীনে, সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের সভ্যতা, তাদের কৃষ্টি। নিয়ে যায় শিল্পীও, গড়ে উঠে বৌদ্ধ স্থাপত্য সেই সব দেশে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, শোভিত হয় অনবদ্য চিত্র-সম্ভারেও।

লুপ্ত হয়ে যায় একে একে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ স্থপতির গৌরব, বৌদ্ধ শিল্পীর অমূল্য দান অন্তর্হিত হয়ে যায় ভীষণ হিংস্র শ্বাপদ ও ভয়াল ময়াল সঙ্কুল গভীর অরণ্যের অন্তরালে, অদৃশ্য হয়ে যায় সভ্য জগতের দৃষ্টির বাইরে। সুপ্ত থাকে কয়েক শত বৎসর। আসে আবিষ্কারের প্রেরণা, আবিষ্কৃত হয় তারা একে একে। বিস্মিত হয় লোকে তাদের গঠন-গরিমায়, তাদের অঙ্গের সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার, তাদের চরম উৎকর্ষ দেখে। ছড়িয়ে পড়ে তাদের সৌরভ দিকে দিকে। দলে দলে যাত্রী আসে, আসে দেশ বিদেশ থেকে, সুদূর সমুদ্রপার থেকেও। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দেয় ডালি উজাড় করে। গৌরবান্বিত হয় শিল্পী, গৌরব বাড়ে ভারতবাসীর। এমন করেই একদিন, বিলুপ্ত হয়ে যায় বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তাও, পরিণত হয় গভীর অরণ্যে, বাসস্থান হিংস্র শ্বাপদের আর বাদুড়ের। অন্তর্হিত হয়ে যায় সভ্য জগতের দৃষ্টির বাইরে। লুপ্ত থাকে কয়েক শত বৎসর বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। জানে না কেউ তার অস্তিত্ব, শোনে নাই তার নাম। শোনে নাই এইখানেই একদিন রচিত হয়েছিল এক স্বপ্নলোক, বুকে নিয়ে বহুশত বৎসরের বৌদ্ধ স্থপতির, ভাস্করের আর চিত্রশিল্পীর সাধনার দান, এক অমূল্য সম্পদ। বাস করতেন এখানে শত শত বৌদ্ধ শ্রমণ, কত বৌদ্ধ পুরোহিত আর মহাপুরোহিতও। তাঁদের সম্মিলিত উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে আর ধর্মসঙ্গীতে, সকাল সন্ধ্যায় প্রকম্পিত হ'ত এর আকাশ বাতাস—প্রতিধ্বনিত হ'ত গিরিকন্দর আর শৈলমালার শিখরদেশ। বাস করতেন কত বৌদ্ধ স্থপতি, কত বৌদ্ধ ভাস্কর, কত বৌদ্ধ চিত্র-শিল্পীও, নিযুক্ত থাকতেন তাঁরা মন্দির নির্মাণের কাজে, ভূষিত করতেন তাদের অঙ্গ শিল্প, মূর্তি ও চিত্র-সম্ভারেও। বিরামহীন সেই কাজ। আসতেন এখানে হাজারে হাজারে বৌদ্ধতীর্থ যাত্রীও, চরিতার্থ হ'ত তাঁদের জীবন এখানকার চৈত্যে পূজা দিয়ে, সার্থক হ'ত নয়ন এখানকার বিহার ও চৈত্যের মহিমাময় সৌন্দর্য দেখে। মুখর হ'ত অজন্তা তাদের কলকণ্ঠে, প্রতিধ্বনিত হ'ত তার আকাশ বাতাস, তার গিরিকন্দর আর শৈলশিখরও। হয়ত এমনই করে একদিন চিরতরে বিলুপ্ত হ'ত অজন্তা সঙ্গে নিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

চিত্রসম্পদ, পরিণত হ'ত ধ্বংসে, নিমজ্জিত হ'ত বিস্মৃতির অতল গহ্বরে, হ'ত এক অপূরণীয় ক্ষতি বিশ্বের।

আসে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ভারতের শিল্পের ইতিহাসের এক পরম স্মরণীয় দিন। একদল ইংরেজ সৈনিক শিবির স্থাপন করে ভারত হায়দ্রাবাদ সীমান্তের পর্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশে। উৎসবে উন্মত্ত তারা, হঠাৎ তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সামনের পাহাড়ের অঙ্গে। মনে হয়, সারি সারি গুহা নিয়ে আছে পাহাড় অঙ্গে। কৌতূহল জাগে মনে। অতি কষ্টে পাহাড় অবতরণ করে, অতিক্রম করে এক বেগবতী স্রোতস্বিনী। তার পর সুরু হয় সম্মুখের শৈলমালায় আরোহণ। কষ্টসাধ্য এই আরোহণ। রাস্তা নাই, নাই রাস্তা পশুদের যাতায়াতের জন্যও। নিবিড় ঘন বন-বীথি আর লতাগুল্মে আচ্ছাদিত শৈলমালার অঙ্গ, দুর্গম, অনতিক্রম্য। তাই উঠতে হয় প্রস্তরখণ্ডের উপর পদস্থাপন করে, আর লতা-গুল্ম আঁকড়ে ধরে। আরোহণ করতে হয় অতি সাবধানে। নইলে স্খলিত হবে পদ, নিমজ্জিত হবে অতল গহ্বরে, হবে জীবনান্ত। শেষে পাহাড় অতিক্রম করে, গুহার দ্বারে উপনীত হয়। বিস্মিত হয় দেখে তার ভিতরের শিল্প-সম্ভার।

কিছুদিন পরে সৈন্যেরা লোকালয়ে ফিরে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় এক বিস্ময়জনক বার্তা। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, উড়িয়ে দেয় হেসে। ক্রমে এই খবর সৈন্যদের গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, সুধী ও বিদ্বৎ সমাজের কানে আসে। তাঁরা অজন্তা দেখতে আসেন। দেখে মুগ্ধ হন তার গুহামন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, তার প্রাচীরের গাত্রের আর ছাদের অঙ্গের চিত্র-সম্ভার। প্রকাশিত হয় অজন্তার গুহা সম্বন্ধে প্রথম বিবরণী Transactions of the Royal Asiatic Society-র পৃষ্ঠায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার দীর্ঘ দশ বৎসর পরে।

শোনেন মনীষী জেমস ফার্গুসনও। তিনিও অজন্তায় গিয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তার গুহা সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণী ঐ একই পত্রিকায় লেখেন। জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। আলোড়িত হয় সুধী সমাজ এই সব বিবরণী পাঠ করে, অবগত হন তাঁরা অজন্তার গুহার গুরুত্ব সম্বন্ধে, জানেন এই সোসাইটির সভ্যরাও। তাঁরাই প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারদের

কাছে চিঠি লেখেন। অজন্তার গুহার প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্র-সম্ভার রক্ষার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তাঁদের চিঠি পেয়ে ঐ চিত্রগুলির অনুলিপি নেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ পল্টনের সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর রবার্ট গিল ঐ কাজে নিযুক্ত হন।

তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ কাজে নিযুক্ত থেকে লণ্ডন শহরে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রায় ত্রিশখানি অনুলিপি পাঠান। সেগুলি লিডেন হল স্ট্রীটে কোম্পানির যাদুঘরে রক্ষিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনর্বার ঐ কর্মে নিযুক্ত হন, প্রেরণ করেন কর্তৃপক্ষের নিকট অনেকগুলি অনুলিপি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেগুলি সিডেনহামে ক্রষ্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর জন্য প্রেরিত হয়। প্রেরিত হয় না শুধু শেষের পাঁচখানি অনুলিপি। আগুন লেগে ভস্মে পরিণত হয় কৃষ্টাল প্যালেসে রক্ষিত সবগুলি অনুলিপিই। রক্ষিত হয় যে পাঁচখানি অনুলিপি, হয় না অগ্নিদগ্ধ, প্রেরিত হয় কেন্‌সিংটনে, আজও সেখানকার ভারতীয় শাখায় এই অনুলিপিগুলি প্রদর্শিত হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জেম্‌স ফার্গুসান ও ডাঃ বার্জেস ভারত সরকারকে এক যুক্ত চিঠি লেখেন। লেখেন মেজর গিলের যে সমস্ত অনুলিপি আগুনে পুড়ে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে, উচিত সেগুলির পুনরুদ্ধার করা। ফলে জর্জ গ্রীফিথস্‌কে অবিলম্বে অজন্তায় গিয়ে গুহা সম্বন্ধে একটি বিশদ বিবরণ পাঠাতে আদেশ করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীফিথস্ অজন্তায় আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন বোম্বাইয়ের চিত্র বিদ্যালয়ের (School of Arts) কয়েকজন শিক্ষার্থী। তাঁরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বৎসর গুহার কাজে নিযুক্ত থাকেন। প্রেরিত হয় প্রায় একশত পঁচিশখানি অনুলিপি সাউথ কেনসিংটনের যাদুঘরে। তাদের মধ্যেও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সাতাশিখানি অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংসে পরিণত হয়। যেগুলি অবশিষ্ট থাকে সেগুলি নিয়েই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীফিথস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Paintings in the Buddhist caves of Ajanta' রচনা করেন। তাঁর নেওয়া ছাপ্পান্নখানি অনুলিপি আজও ভিক্টোরিয়া আর এ্যালবার্ট যাদুঘরের ভারতীয় শাখার প্রাচীরের গাত্রে বিলম্বিত আছে।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে লেডি হেরিংটন্ ভারত দর্শনে আসেন। মুগ্ধ হন তিনি

অজন্তার গুহার প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্রগুলি দেখে। ১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার অজন্তায় আসেন। ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বার। তিনিও ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অজন্তার গুহার চিত্রাবলী সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, পরিচিত 'Ajanta Frescoes' নামে।

কিন্তু নিবদ্ধ থাকে তখনও অজন্তার গুহার চিত্রাবলী ভারতবর্ষের বাইরে সুদূর ইংলণ্ডে। প্রচারিত হয় না ভারতে, থেকে যায় ভারতের লোকচক্ষুর অন্তরালে আবদ্ধ থাকে গুহার অন্ধকারে। শেষে একদিন এই খবর এসে পৌঁছায় শান্তিনিকেতনে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কানে, শোনেন ঋষি অবনীন্দ্রনাথ, অবগত হন ভগ্নী নিবেদিতাও। প্রেরিত হন তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদীয়মান শিল্পী শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার। অজন্তায় তাঁদের নেওয়া অনুলিপিই প্রথম বাংলায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়, যেখান থেকে সারা ভারতবর্ষে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীতে। তাই তাঁদেরও প্রাপ্য অজন্তার আবিষ্কারের গৌরব।

এঁরা ছাড়াও বহু মনীষী অজন্তা দেখতে আসেন। আসেন বহু চিত্র-শিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও। তাঁরা সাগর অতিক্রম করে এসে অনুশীলন করেন গুহার চিত্রাবলীর অঙ্কন পদ্ধতি, গঠন-ভঙ্গিমা আর বর্ণ-সুষমা। অনুশীলন করেন তাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও। এঁদের মধ্যে আছেন প্রফেসর উলিয়াম রথেনস্টাইন, প্রফেসর লরেঞ্জো সিকনি আর ক্যাপটেন গ্লাডস্টোন সলোমন। তাঁরাও লিপিবদ্ধ করেন তাঁদের মতামত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম সরকার এখানে একটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করেছেন। সম্যক অবগত তাঁরাও এই গুহার চিত্রাবলীর গুরুত্ব সম্বন্ধে, যত্নবান তাদের সংরক্ষণে আর সুসংস্কারে। দেখেন যাত্রীদের ও অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পীদের সুখ-সুবিধাও। রচনা করেন তাঁরাও অজন্তার গুহা সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান পুস্তক, প্রকাশিত হয় তার প্রাচীরগাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্রের বহু সুষ্ঠু অনুলিপিও।

রং আর তুলির সাহায্যে অঙ্কিত করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী অজন্তার প্রাচীরের গাত্রে, ছাদের আর স্তম্ভের অঙ্গে জাতকের গল্প, কাহিনী বুদ্ধের পূর্বজন্মের। অঙ্কিত করেন তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর দৃশ্য, করেন কত

পৌরাণিক কাহিনীও। করেন যুগের পর যুগ, দেন তাদের সম্পূর্ণ রূপ। দেন মনের মাধুরী মিশিয়ে, উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য।

চিত্রিত করেন মানবের জীবনও, সচেতন সাংসারিক সুখে, দুঃখে, কিন্তু বিস্মৃত হয় না সে শেষের দিনের কথা, নিঃশেষ হবে যে দিন আয়ু, অবসান হবে জীবনের। ভোলে না অনিত্য এই জীবন, অনিত্য স্নেহ-মমতা, অনিত্য সুখ-দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, নিত্য শুধু ব্রহ্ম সনাতন। ভুলে না ব্রহ্ম হতেই হয়েছে উদ্ভব, আবার লীন হয়ে যেতে হবে ব্রহ্মে। যেতে হবে কয়েক সহস্র বৎসরের জন্মান্তরের সুকৃতির ভিতর দিয়ে।

রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে বহু বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ। রচনা করেন চিত্রশিল্পী বহুশত বৎসরের অক্লান্ত সাধনায়। অভিনয় করেন সেই রঙ্গমঞ্চে কত রাজা, কত রাণী সঙ্গে নিয়ে কত মুনি-ঋষি। অভিনয় করেন কত মহাশক্তিশালী পুরুষও। বাদ যায় না প্রজারাও। অংশ গ্রহণ করেন এই বহু-বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে সব শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই। সেজে আসেন তাঁরা বিভিন্ন আর বিচিত্র সাজে, করেন বিভিন্ন অভিনয়।

অঙ্কিত করেন কত বিচিত্র আর বিভিন্ন দৃশ্যও, দৃশ্য কত নগরের, কত রাজপ্রাসাদের, কত রাজসভার, নৃত্য করেন সেই রাজসভায় কত রাজনর্তকী, অনুপম, তরঙ্গায়িত তাঁদের গঠন-ভঙ্গিমা, অনবদ্য তাঁদের অঙ্গের পেলবতা, সুন্দর, শোভন, তাঁদের অঙ্গের ভূষণ। নিযুক্ত তাঁরা নৃত্যে, নিখুঁত সেই নৃত্যের ছন্দ, নির্ভুল তার তাল।

অঙ্কিত হয় কত প্রাকৃতিক দৃশ্যও, দৃশ্য কত বিস্তৃত প্রান্তরের কত অরণ্যের কত উপবনের, কত উদ্যানেরও। কত পশু, কত পক্ষী, কত হরিণ, কত গরু, কত সিংহ, কত হস্তী বিচরণ করে সেই সব বনে উপবনে।

গ্রথিত সকলে একই গ্রন্থি দিয়ে। গ্রথিত রাজা ও রাণী, তাদের পারিষদবর্গ। গ্রথিত নর, নারী, পশু-পক্ষী, রাজপ্রাসাদ, রাজসভা, অরণ্য, উদ্যান, লতা আর পল্লব। অভিনয় করেন সেই সূত্রের মধ্যে প্রতিটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁদের নিজস্ব অভিনয়, বিকশিত হয় তাদের নিজের স্বরূপ, নিজস্ব সত্তা, লাভ করে তারা অপরূপ রূপ, হয় রূপময়, প্রাণময়ও। এক মহামহিমময় উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয় তাদের প্রতিটি অঙ্গ, উদ্ভাসিত হয়

তাদের আনন, হয় নয়নও। সে আলো ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণের আলো, সে দীপ্তি ভগবৎ করুণালাভের স্বীকৃতি। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার এক অপূর্ব সমন্বয়।

জীবন্ত এই চরিত্রগুলি, অপরূপ প্রতিচ্ছায়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনেরও। চরম প্রকাশ শিল্পীর মনস্তত্ত্বের, তাই লাভ করে অজন্তার চিত্র-শিল্প শ্রেষ্ঠ রূপ, পায় পূর্ণ পরিণতি।

তুলনাহীন এই চিত্রসম্ভার, মহিমময় সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য অপরূপ রূপদান। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্র-শিল্পের দরবারে।

এই রঙ্গমঞ্চে পরম রূপবতী নারীই পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন, করেন তাকে মধ্যমণি শিল্পী। করেন তাকে সুন্দরের প্রতীক, প্রতীক বিশ্বের সমস্ত মাধুর্যের আর সুষমার। দেন অপরিসীম নারীচরিত্র জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রতি পদক্ষেপে তার সাহায্য নেন। সাজান নারী দিয়ে সমস্ত গুহামন্দির, শোভিত করেন অপরূপ সাজে। নারীকেই করেন পুষ্প। শোভিত হন নারী দিয়েই রাজা ও রাজকুমারও, মহিমান্বিত হয় রাজসভা আর রাজপ্রাসাদ। শোভিত হয়ে আছে নারী দিয়ে পথ, ঘাট, বাতায়ন। গ্রথিত হয় নারী দিয়ে মালা।

প্রস্ফুটিত করেন শিল্পী কখনও একটি নারীকে, কখনও বা একাধিককে। অপ্সরার মত নারী উড়ে চলে। কোথাও এক যৌবন-মদে মত্তা এক মত্ত সৈনিককে রসাতলের পথে নিয়ে যায়। কোথাও নিযুক্তা নারী সংসারের কাজে, ব্যাপৃতা কোথাও শিথিল কবরী বন্ধনে হস্তে নিয়ে কনক-মুকুর, কোথাও দাঁড়িয়ে বাতায়নে, সজ্জিতা অভিসারিকার ভূষণে। কেউ মত্তা উৎসবে, নিযুক্তা কেউ গল্প-গুজবে।

আছে নারী বসে, আছে দাঁড়িয়েও। তাদের শিরে শোভা পায় স্বর্ণমুকুট, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরক কুণ্ডল। বাহুতে তাদের মাণিক্যখচিত বহুমূল্য বাজু, মণিবন্ধে স্বর্ণ-কঙ্কন। কোথাও নাই তাদের অঙ্গে কোন বসন, বিবসনা তারা, স্বল্প-বসনা, কোথাও বা বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে সজ্জিতা।

অঙ্কিত হয় নারীর মস্তকের প্রতিটি দোলন, দেহের প্রতিটি সূক্ষ্মতম গঠন, তার যৌবন-পরিপুষ্ট পীনোন্নত চঞ্চল বক্ষ, বঙ্কিম গ্রীবা, ললিত কপোল, তার

মদিরালস আকর্ণ-বিস্তৃত আঁখি, তার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনও। অঙ্কিত হয় তার বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশ বিন্যাসও।

অঙ্কিত করেন অজন্তার শিল্পী নারীকে কত বিভিন্ন রূপে, কত বিচিত্র ভঙ্গীতে, কত বিভিন্ন সাজে। করেন ভাদের সুন্দরতম। হন তাঁরা রহস্যময়ী, মহিমময়ীও। রমণীয়তম হয় অজন্তার গুহামন্দির তাঁদের সাহায্যে, হয় মহামহিমান্বিত, পরিণত হয় অজন্তা, এক স্বপ্নলোকে, এক স্বপ্নপুরীতে, বুকে নিয়ে ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তখন মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে সারা ইউরোপ।

বপন করেন বৌদ্ধ চিত্রশিল্পী যে বীজ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশের সিরগুজার গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, মহামহীরুহে পরিণত হয় সেই বীজ অজন্তার গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে। লাভ করে পূর্ণ পরিণতি—উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় গিওট্রো আর লিওনার্ডোকেও। সমপর্যায়ে পড়ে অজন্তা সিসটাইনের ভজনালয়ের। এই ভজনালয়কে চিত্র-সম্ভারে ভূষিত করবার জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়—সিগনরেল্লি, বট্টিচল্লি, ঘিরল্যাণ্ডাইও, পেরুগিনো ও রচেল্লির মধ্যে। অলঙ্কৃত হয় তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায়। কিন্তু লাভ করে না সম্পূর্ণ রূপ, পায় না পূর্ণ পরিণতি! তাই শেষ রূপ দান করতে হয় এই ভজনালয়ের সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপ্রতিভাবান চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে, দিতে হয় হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে। অমরত্ব লাভ করে ভজনালয়, অমর হন মাইকেল এঞ্জেলোও। অজন্তার চিত্রশিল্পীরাও রচনা করেন এখানে এক বহু-বিস্তৃত অনবদ্য শিল্প-সম্ভার, এক মহামহিমময় সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। রচনা করেন যুগের পর যুগ মিশিয়ে দিয়ে অন্তরের সমস্ত মাধুর্য, নিঃশেষ করে দিয়ে হৃদয়ের সবখানি ঐশ্বর্য—হন বিশ্বজিৎ। অমর হয় অজন্তা, নিজেরাও লাভ করেন অমরত্ব।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, অঙ্গে নিয়ে ছিল ষোলটি গুহামন্দির, চিত্রসম্ভার। বিনষ্ট হয় তাদের মধ্যে দশটি কালের করালে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে, পরিণত হয় ধ্বংসে। অঙ্গহীন হয় অবশিষ্ট ছ'খানিও প্রকৃতির অত্যাচারে আর অনভিজ্ঞ সংস্কারে। প্রদীপ্ত ছিল একদিন এই চিত্রগুলি লাল, নীল, সবুজ, হরিদ্রা, বেগুনি রঙে,

প্রতিভাসিত ছিল বিভিন্ন বর্ণ-সুষমায় আর অপরূপ অনবদ্য সুসামঞ্জস্যে। আজ তারা হারিয়েছে সে প্রোজ্জলতা, পরিণত হয়েছে দীপ্তিহীন চিত্রে।

আমরা প্রথম গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। একটি বিহার, নির্মিত হয় এই মন্দিরটি ৬০০ থেকে ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে, নির্মাণ করেন মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ স্থপতি, দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে, তাঁদের প্রেরণায়। সমসাময়িক ও দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে বিহারগুলি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। এই সময়েই বৌদ্ধ স্থাপত্য লাভ করে চরম উৎকর্ষ, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্থপতির এক মহা গৌরবময় সৃষ্টি, সৃষ্টি চরম উৎকর্ষের। দেখি, অপরূপ এই মন্দিরের সম্মুখ ভাগের শিল্পসম্ভার, যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপদান, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানের।

অলিন্দে উপনীত হই। দেখি বুকে নিয়ে আছে অলিন্দটি স্তম্ভের শ্রেণী। অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভগুলি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্তম্ভেরও, চতুষ্কোণ তাদের নিম্নতম প্রদেশ, অষ্টকোণ উপরার্ধ। রচিত হয় চারিটি বামনের মূর্তি, স্তম্ভের পাদদেশের চারি পাশে, চারিটি সন্ধিস্থলের চারকোণে। চারিটি অষ্টকোণের শীর্ষদেশেও, হস্তে ধারণ করে আছে তারা স্তম্ভের শীর্ষদেশ। স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশের কেন্দ্রস্থলে বায়ুনির্গমের পথ। শীর্ষদেশের নীচে আর বায়ুনির্গমের পথের উপরে নির্মাণ করেন শিল্পী একটি ছেদ, শোভিত সেই ছেদের অঙ্গ সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে। অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্পদে ভূষিত স্তম্ভের অঙ্গও। আবৃত স্তম্ভদণ্ড মিহি সূক্ষ্মতম আবরণে, তার দুই প্রান্তদেশে শোভা পায় পাড়। মনে হয় অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভ একটি মসলিনের বসন।

স্তম্ভের শীর্ষদেশে, কেন্দ্রস্থলে, মূর্তি দিয়ে রচিত, দেখি ধর্মের কাহিনী। সিংহাসনে বসে আছেন এক দেবতা, তাঁর দুই পাশে বংশীবাদকেরা, নিযুক্ত বংশীবাদনে। উড়ন্ত দেবীর মূর্তিও আছে। তাদের উপরে একটি ছেদ। তার উপরে এক সারি হস্তীযূথ, যায় আরও অনেক জন্তু। সৃষ্টি হয় এক সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক নয়নাভিরাম দৃশ্য, এক মহা গৌরবময় সৃষ্টি, সৃষ্টি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শনের।

দেখি অনুরূপ অপরূপ স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে সাজান স্থপতি মন্দিরের অভ্যন্তর

ভাগও। ভিতরে প্রবেশ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি ছাদের অঙ্গের প্যানেলের দৃশ্য। তার পর বাম দিক থেকে দেখতে সুরু করি প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার। দেখি শিবি জাতকের দৃশ্য। প্রদর্শক বলে তার কাহিনী, কাহিনী এক বোধিসত্বের, বুদ্ধের পূর্বজন্মের।

সিংহাসনে বসে আছেন বোধিসত্ব মহারাজা শিবি। প্রাণভয়ে ভীত এক কবুতর তাঁর কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাকে অনুসরণ করে এক চিল। বলে এই কবুতরই তার ন্যায্য খাদ্য, তাই সমর্পণ করতে হবে কবুতরকে তার হস্তে। এক তুলাদণ্ড আনিয়ে মহারাজা তার এক পাল্লায় কবুতরকে স্থাপন করেন। স্থাপিত হয় অপর পাল্লায় সম পরিমাণ মাংস, স্বহস্তে কর্তিত হয় সেই মাংস রাজার দেহ থেকে। দান করা হয় সেই মাংস চিলকে। আহার্য পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করে চিল। নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে কবুতরও। নিজের অঙ্গের মাংস দিয়ে শরণার্থীর জীবন রক্ষা করেন বোধিসত্ব।

তার পরেই মহাজন জাতকের দৃশ্য দেখি। প্রদর্শক বলে বিনা কারণেই এক রাজকুমার তাঁর ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। নিহত হন ভ্রাতা, রাণী পলায়ন করেন, গর্ভে নিয়ে সন্তান, পরিত্যাগ করে যান নগর। জন্মগ্রহণ করেন সেই গর্ভে এক বোধিসত্ব। মাতৃপালিত শিশু জানে না সে পিতৃপরিচয়। ক্রমে পুত্র যৌবনে পদার্পণ করে, অবগত হয় নিজের প্রকৃত পরিচয়ও। শেষে একদিন পাড়ি দেয় সমুদ্র, সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যপোত, পরিপূর্ণ বাণিজ্যসম্ভারে। নিমজ্জিত হয় পোত, হয় বাণিজ্যসম্ভারও সমুদ্রের অতল তলে। হন না শুধু কুমার, এক দেবী তাঁর জীবন রক্ষা করেন, তাঁকে নিয়ে যান তাঁর পিতৃরাজ্যে। সেখানে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হয়ে তিনি তাঁর পিতৃব্যকন্যাকে বিবাহ করেন। এই পিতৃব্যই তাঁর পিতাকে হত্যা করে তাঁর পিতৃসিংহাসন হরণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে সংসার পরিত্যাগ করে যান কুমার, তাঁর অনুগমন করেন তাঁর পত্নী। তাঁরা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন।

তার পাশেই প্রাচীরের গাত্রে দেখি নৃত্যপরায়ণা নর্তকীর দল। অপরূপ তাদের গঠনভঙ্গিমা, অনবদ্য তাঁদের নৃত্যের ছন্দ। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রধানা নর্তকীর বহুমূল্য শিরোভূষণ, আর তার সারা অঙ্গের মূল্যবান অলঙ্কার।

তার পাশেই অঙ্কিত দেখি এক জাতকের কাহিনী, কাহিনী সঙ্খপাল জাতকের।

তখন বারাণসী মগধের অধীনস্থ। মহারাজার প্রিয়তমা পত্নীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় দুর্যোধন। যৌবনে উপনীত হয়ে তিনি পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজত্ব পরিত্যাগ করে পিতা সঙ্খপাল হ্রদের তীরে গিয়ে বাস করেন। সেখানে প্রতিদিন হ্রদের গর্ভ থেকে উঠে এসে নাগরাজ সঙ্খপাল, তাঁর কাছে ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করেন। একদিন পিতাকে দেখতে এসে বোধিসত্ত্ব তাকে দেখতে পান। শোনেন তিনিই নাগরাজ সঙ্খপাল।

ক্রমে নিঃশেষ হয় বোধিসত্ত্বের আয়ু। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অন্তঃকরণে নাগরাজা হবার বাসনা জাগে। ভূমিষ্ঠ হন তিনি নাগরাজা হয়ে। কিন্তু কিছুদিন পরেই বীতশ্রদ্ধ হন সেখানকার ঐশ্বর্যে, সুখ পান না বিলাসে ও ব্যসনে। মনস্থ করেন পরের হিতের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে, শয়ন করেন এসে একটি বল্মীকের উপর।

কয়েকজন শিকারী বিফলমনোরথ হয়ে অরণ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে। তাঁকে ঐ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁর উপর উৎপীড়ন সুরু করে দেয়। বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেন বোধিসত্ত্ব সেই অত্যাচার, দেন না কোন বাধা।

এমন সময় সেই পথ দিয়ে গৃহে ফেরেন আলারা, এক মহাসমৃদ্ধিশালী ভূস্বামী। তিনি অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করেন বোধিসত্ত্বকে। মুক্তিলাভ করে আলারাকে বোধিসত্ত্ব নাগরাজ্যে নিয়ে যান। রাখেন তাঁকে সেখানে এক বছর, আদরে যত্নে আর আপ্যায়নে। শেষে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন আলারাও, শিক্ষাগুরু হন বারাণসীর রাজার।

সঙ্খপাল জাতকের দৃশ্য দেখে আমরা এক রাজসভার দৃশ্য দেখি। অপরূপ এই দৃশ্যটি দেখি মুগ্ধ হয়ে।

বুদ্ধের সংসারত্যাগের দৃশ্য দেখে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সামনে উপনীত হই। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি অজন্তার চিত্রশিল্পীর এক মহামহিমময় সুন্দরতম সৃষ্টি, এক মহা-গৌরবময় সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি। দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মপাণি এক বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, শিরে

মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য মুকুট, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের কুণ্ডল। পীতবসনে ভূষিত তাঁর কটিদেশ। পীত তাঁর অঙ্গের বর্ণও। হয় এক অপরূপ সমন্বয় পিছনের লাল পরিবেশের সঙ্গে, সমন্বয় হয় তাঁর বিচিত্র অঙ্গবিন্যাসে, হস্তের পুষ্পধারণের অপরূপ ভঙ্গীতে আর তাঁর আননের বিষাদের অভিব্যক্তিতে। বার বার জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধ। হবেন বুদ্ধ, লাভ করবেন পরম জ্ঞান, উপায় নির্বাণলাভের। কিন্তু হন বোধিসত্ত্ব, হন না পরম জ্ঞানী। তাই পরিপূর্ণ-বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির অন্তঃকরণ হতাশায় আর বিষাদে, ফুটে ওঠে সেই অন্তরের ভাষা তাঁর মুখের উপর। ফুটিয়ে তোলেন অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, নিঃশেষ করে দিয়ে মনের মাধুরী, লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন, বিশ্বের চিত্রশিল্পের দরবারে হন বিশ্বজিৎ। পরাজয় স্বীকার করতে হয় তাঁর কাছে পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে, হয় লিওনার্ডোকেও।

শ্রদ্ধা নিবেদন করি পদ্মপাণিকে, জানাই চিত্রশিল্পীকেও। এগিয়ে গিয়ে প্রলোভনের দৃশ্য দেখি। দেখি এক বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধ বসে আছেন। নিমগ্ন তিনি ধ্যানে। সমাগত তাঁর মহাজ্ঞান লাভের পরম মুহূর্তটি, হবেন তিনি বুদ্ধ, হবেন তথাগত। এগিয়ে আসেন তাঁর তপস্যার বিঘ্ন করতে সয়তান মার, নইলে মুক্ত হবে নির্বাণলাভের পথ জগৎবাসীর কাছে, হবে তারা ধার্মিক, হবে নিষ্পাপ, রইবে না তাঁর কিছু করণীয়।

প্রথমে অনুনয় করেন, মিনতি করেন, অনুরোধ করেন তপস্যা থেকে বিরত হওয়ার জন্য। পরে নিজের কন্যাদের পাঠান। পরম রূপবতী সেই কন্যারা, অধিকারী অপরিসীম ছলনারও। সঙ্গে নিয়ে আসে তারা কত বিলাসের আর ব্যসনের বস্তু। মুগ্ধ হন যদি বুদ্ধ তাদের রূপে অথবা ঐশ্বর্যে হন বিচলিত, জাগে যদি তাঁর অন্তঃকরণে ভোগের লিপ্সা, হন তিনি সঙ্কল্পচ্যুত।

বুদ্ধ থাকেন অচল, অটল তাঁর সঙ্কল্প। নিবিষ্ট থাকেন কঠোর ধ্যানে। ভ্রূক্ষেপ নাই তাঁর কোন কিছুতেই। মোহ নাই তাঁর সম্পদে, লোভ নাই নারীর রূপে ও লাস্যে।

বিফল হয়ে মার ক্রোধে উন্মত্ত হন। নিয়ে আসেন যত ছিল দৈত্য আর দানব। তাঁদের বলপ্রয়োগ করতে আদেশ করেন। বলেন, নিক্ষেপ কর

বুদ্ধকে, কর আসনচ্যুত পরম জ্ঞানলাভ করবার আগেই। অগ্রসর হয় তারা বুদ্ধের দিকে, দ্রুত তাদের গতি, সজ্জিত তারা বিভিন্ন আর বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রেও। নির্ভীক বুদ্ধ, অচল হয়ে সিংহাসনে বসে থাকেন, নিযুক্ত থাকেন ধ্যানে।

সন্তুষ্ট হন দেবতারা, হন ধরিত্রীদেবীও। উপস্থিত হন সেখানে বুদ্ধকে রক্ষা করতে, সঙ্গে নিয়ে আসেন দেবসৈন্য। যুদ্ধ হয় দানবে আর দেবসৈন্যে, এক প্রচণ্ড সংগ্রাম। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে দানবেরা পলায়ন করে, করেন মারও।

অবসান হয় রাত্রি, গৌতম লাভ করেন পরম জ্ঞান, হন মহাজ্ঞানী, হন বুদ্ধ।

দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এক মহামহিম পরিকল্পনার সুন্দরতম রূপদান।

পাশেই দেখি, অঙ্কিত কত বুদ্ধমূর্তি, প্রাচীরের গাত্রে। কেউ পদ্মাসনে বসে, কেউ সিংহাসনে। কারও হস্তে বরদা মুদ্রা, কারও অভয়। উদ্ভাসিত তাঁদের নয়ন, তাঁদের আনন তাঁদের অন্তরের ভাষাতে। দেখি মুগ্ধ হয়ে। দেখি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিও। সুন্দর, শোভন গঠন এই মূর্তিটিও, আলো করে আছে প্রাচীরের গাত্র।

তার পাশেই এক জাতকের কাহিনী দেখি, কাহিনী কম্পিয়া জাতকের।

কম্প নামে এক নদী ছিল। তার এক পারে মগধের রাজ্য, অপর পারে অঙ্গ। সেই নদীগর্ভে নাগেরা বাস করতেন। বিবদমান এই রাজারা, নিযুক্ত থাকতেন রণে। একবার অঙ্গদেশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন মগধরাজ। তাঁর অনুসরণ করেন অঙ্গদেশের সৈনিকেরা। মগধরাজ কম্প নদীতীরে উপনীত হন অশ্বপৃষ্ঠে, অবতরণ করেন নদীর জলে, অদৃশ্য হয়ে যান তার অতল গহ্বরে। এসে পৌছান কম্পিয়ার রাজসভায়, এক মণিমুক্তাখচিত সভাগৃহে।

বিস্মিত হন কম্পিয়ারাজ আগন্তুককে দেখে। জিজ্ঞাসা করেন তাঁর পরিচয়। পরিচয় পেয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেন। বাস করেন মগধরাজ কিছু-দিন কম্পিয়ার সম্মানিত অতিথি হয়ে, শেষে, নাগরাজার সাহায্যে উদ্ধার করেন তাঁর হৃত সিংহাসন। পরাজিত হন অঙ্গরাজ, অঙ্গ মগধের অধিকারে আসে। এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন মগধ আর নাগরাজা। প্রতি বৎসরই মগধরাজ কম্পিয়া নগরে যান। সঙ্গে নিয়ে যান বহুমূল্য উপঢৌকন।

বোধিসত্ত্ব তখন এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, উপনীত হন তিনিও কম্পনদীর তীরে, মগধরাজার অনুচরবর্গের সঙ্গে। মুগ্ধ হন তিনি রাজ ঐশ্বর্য দেখে। বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণেও অমনই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ার।

পরজন্মে হন তিনি নাগরাজা। কিছুদিন পরেই বীতশ্রদ্ধ হন তিনি বিপুল ঐশ্বর্যে, অনুশোচনা ও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ। এক সাপুড়িয়ার হস্তে নিজেকে ধরা দেন। প্রদর্শিত হন তিনি বিভিন্ন স্থানে, উপার্জন করে অর্থ সাপুড়িয়া।

একদিন ঐ অবস্থায় দেখে, বারাণসীর রাজা তাঁকে সাপুড়িয়ার কাছ থেকে কিনে নেন। নাগরাজা নিজের রাজত্বে ফিরে যান, সঙ্গে নিয়ে যান মগধরাজকে। সেখানে মগধরাজ সাত দিন বাস করে অনেক ধন-দৌলত সঙ্গে নিয়ে মগধে ফিরে আসেন।

ফিরবার পথে দেখি একে একে একটি শোভাযাত্রার দৃশ্য, একটি রাজপ্রাসাদ ও একটি রাজসভার দৃশ্য। সিংহাসনে বসে আছেন খুব সম্ভব পারস্যসম্রাট খসরু, পাশে নিয়ে সম্রাজ্ঞী সিরিনকে। তাঁদের দুই পাশে দুই পরিচারিকা দাঁড়িয়ে। সুন্দরতম প্যানেলের তিন কোণের পুষ্পগুচ্ছ, অপরূপ উপরার্ধের বাম কোণের লম্বগ্রীব হংসমিথুনের চিত্রটি, বৈশিষ্ট্য অজন্তার চিত্রশিল্পীর।

সবশেষে, কৃষ্ণারাজকুমারীকে দেখি। কৃষ্ণ তাঁর অঙ্গের বর্ণ—তাই বুঝি পরিচিতা কৃষ্ণারাজকুমারী নামে। কিন্তু অপরূপ রূপবতী এই নারীটি। উন্নত তাঁর নাসিকা, আকর্ণ-বিস্তৃত তাঁর নয়ন, তাঁর ললিত কপোল অর্ধাবৃত হয়ে আছে মস্তকের টায়রার সংলগ্ন ঝুমকোতে। সুন্দরতম তাঁর কেশ-বিন্যাস আর গ্রীবার ভঙ্গী। তাঁর কর্ণে শোভা পায় হীরককুণ্ডল, কণ্ঠে হার আর মুক্তার মালা, বিস্তৃত সেই মালা তাঁর নিরাবরণ যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত বক্ষের উপর। আননে তাঁর বিষাদের ছাপ, বসে আছেন এক বিরহিণী, অপেক্ষা করছেন প্রিয়তমের আগমনের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এক সুন্দরতম সৃষ্টি অজন্তার চিত্রশিল্পীর। শিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

দ্বিতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। একটি বিহার, নির্মিত সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, সমসাময়িক প্রথম গুহামন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। অনুরূপ প্রথম গুহামন্দিরের পরিকল্পনায়, অঙ্গের শিল্পসম্ভারে ও নির্মাণকুশলতায়, বিভিন্ন এই মন্দিরের অলিন্দের ও সভাগৃহের স্তম্ভের পরিকল্পনা, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্পদ আর মূর্তিসম্ভারও। বুকে নিয়ে আছে এই স্তম্ভগুলিও শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক মহা-গৌরবময় যুগের, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

ভিতরে প্রবেশ করে স্তব্ধ হই, দেখে ছাদের অঙ্গের চিত্রসম্ভার। অঙ্কিত হয় একটি আয়তক্ষেত্র, তার কেন্দ্রস্থলে পাঁচটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত। তাদের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন পুষ্পগুচ্ছ ও লতা। চারি কোণে চারিটি উড়ন্ত অপ্সরা, তাদের মাঝেও প্রস্ফুটিত পদ্মের গুচ্ছ। বেষ্টিত আয়তক্ষেত্র রেলিং দিয়ে।

বামদিক থেকে প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার দেখতে স্বরু করি। প্রথমেই অঙ্কিত দেখি ক্ষান্তিবাদী জাতকের কাহিনী।

এক সমৃদ্ধশালী ব্রাহ্মণ পরিবারে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ তিনি বহু শাস্ত্রে, কিন্তু যাপন করেন সাধারণ গৃহস্থের জীবন। পিতামাতার মৃত্যু হলে উপযুক্ত ব্যক্তিদের তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য দান করে, তিনি বরণ করেন সন্ন্যাসীর জীবন। কিছুদিন অতিবাহিত হলে বারাণসীতে এসে রাজোদ্যানে বাস করতে থাকেন।

একদিন স্বরাপানে প্রমত্ত হয়ে কতকগুলি নর্তকী সঙ্গে নিয়ে রাজা সেই উদ্যানে উপনীত হন। তাদের সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাজা নিদ্রাভিভূত হন। নর্তকীরা তখন তাদের যন্ত্রপাতি দূরে নিক্ষেপ করে উদ্যান পরিক্রমায় নির্গত হয়। দর্শন লাভ করে তারা সন্ন্যাসীর, শুনতে থাকে তাঁর মুখনিঃসৃত ধর্মের বাণী। নিদ্রাভঙ্গে রাজা অবগত হন নর্তকীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে গিয়ে এক ফকিরের বাণী শুনছে। ক্রোধে উন্মত্ত হন রাজা, অসিহস্তে সেখানে উপস্থিত হন। জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসীকে কি তাঁর বাণী? কি বাণী তিনি প্রচার করেন?

সন্ন্যাসী বলেন, প্রচার করি আমি ধৈর্যের বাণী।

রাজা ঘাতককে ডেকে আদেশ করেন, মারো একে কণ্টকে নির্মিত

চাবুকের আঘাত, দাও দু'হাজার ঘা, আঘাত কর সর্বাঙ্গে। তার পর একে একে কাটো এর হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ।

ঘাতক আদেশ পালন করে, আর প্রতিবারই জিজ্ঞাসা করে, কি তাঁর বাণী।

সন্ন্যাসী বলেন, প্রচার করি আমি ধৈর্যের বাণী, নিহিত সেই বাণী আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে।

রাজা তখন তাঁর বক্ষে পদাঘাত করে প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। উত্থানের শেষ সীমানায় বিভক্ত হন ধরিত্রীদেবী, সম্পূর্ণ গ্রাস করেন রাজাকে। মৃত্যুবরণ করেন পাপিষ্ঠ রাজা, পরিসমাপ্তি হয় তাঁর জীবন।

শুনতে পেয়ে সেনাপতি এসে তুলে নেন সন্ন্যাসীর দেহ নিজের অঙ্কে, সেবা করেন প্রাণপণে। তাঁর যত্নে আর শুশ্রূষায় নিরাময় হন বোধিসত্ত্ব।

তার পাশেই চিত্রিত দেখি হংস জাতকের কাহিনী। একদা বারাণসীতে এক নৃপতি বাস করেন। বহু পুত্রের জনক বলে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। রাণীর নাম ক্ষেমা। তখন হংসরূপে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন, হন তিনি হংসরাজ, অধীনে তাঁর নব্বই সহস্র হংস। এক রাত্রিতে রাণী স্বপ্ন দেখেন, প্রচার করেন তাঁর বাণী এক অতি সুন্দর স্বর্ণ হংস। নিদ্রাভঙ্গে সেই হংসকে লাভ করবার জন্য রাণীর অন্তঃকরণে এক তীব্র বাসনা জাগে। তিনি তাঁর অন্তরের বাসনা রাজাকে জানান। এক মহা পবিত্র স্থানে পরিণত করেন রাজা তাঁর সরোবর। ঘোষিত হয় সেই বার্তা চারিদিকে। সেই পবিত্র স্থান দেখতে আসেন হংসরাজ, সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি, সুমুখ। ধৃত হন তাঁরা রাজ-শিকারীর হস্তে, নীত হন রাজার সম্মুখে। সন্তুষ্ট হন নৃপতি তাদের দর্শন করে। সীমাহীন পরিচর্যা আর আহার্য দিয়ে তাঁদের তুষ্ট করেন। শেষে কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করেন, অনুরোধ করেন ধর্মের কথা শোনাবার জন্য। মহাজ্ঞানী তখন তাঁর বাণী সুরু করেন। শোনেন সেই বাণী রাজা ও রাণী সারারাত্রি ধরে, হয় না শেষ সেই রাত্রির। এক মহাপ্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয় রাণীর অন্তঃকরণ, চরিতার্থ হয় তাঁর বাসনা।

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি ঘটনাবলীর চিত্র দেখি। বুদ্ধ হয়ে জন্মাবার আগে, বুদ্ধ তুষিত স্বর্গে বিরাজ

করেন। বসে বসে ভাবেন কবে, কোন্ ভূ-ভাগে, কোন্ দেশে, আর কোন্ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। স্থির করেন সমাগত পরম-পবিত্র ক্ষণটি, ভূমিষ্ঠ হবেন তিনি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, কপিলাবস্তু নগরে, মায়াদেবীর গর্ভে। পুত্র হবেন কপিলাবস্তু-রাজ শুদ্ধোদনের।

তার পাশেই দেখি, মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন, স্বর্গ থেকে নেমে এসে, এক শ্বেত হস্তী তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে প্রবেশ করছে। নিদ্রাভঙ্গে, মায়া এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা রাজাকে শোনান। সভা-পণ্ডিতদের ডেকে রাজা জিজ্ঞাসা করেন স্বপ্নের নিহিত অর্থ। তাদের মধ্যে একজন বলেন, রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এক সর্ব-সুলক্ষণযুক্ত পুত্র, অঙ্গে নিয়ে বত্রিশটি শুভ প্রতীক। যদি তিনি সংসারে বাস করে সংসারী হন, হবেন তিনি এক মহা-পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী সম্রাট। মুণ্ডিত হয় যদি তাঁর মস্তক, কেশ আর শ্মশ্রু, পরিধান করেন যদি তিনি পীতবাস, হবেন তিনি বুদ্ধ, পরম জ্ঞানী।

তার পাশেই দেখি, শিবিকা আরোহণে রাণী পিতৃ-ভবনে গমন করছেন, যাচ্ছেন লুম্বিনী উদ্যানে। সঙ্গে যান তাঁর বান্ধবী আর সহচরীরাও।

দেখি, একটি শালবৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়ে মায়া দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ধরে আছেন তাঁর ভগ্নী মহা-প্রজাপতি—মায়ার দক্ষিণ উদর থেকে নির্গত হন নবজাতক। হস্ত প্রসারিত করে ধারণ করেন সেই নবজাতককে দেবাদিদেব ব্রহ্মা আর দেবরাজ ইন্দ্র। দেখি অগ্রসর হন নবজাতক সপ্ত পদ, তাঁর পদতলে প্রস্ফুটিত হয় সপ্ত পদ্ম, তাঁর শীর্ষে ছত্র, ধারণ করেন সেই ছত্র দেবরাজ ইন্দ্র। অগ্রসর হন নবজাতক এক এক দিকে আর বলেন, তাঁর বাণী প্রতি পদক্ষেপে। পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমি লাভ করব মহানির্বাণ। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে বলেন, জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমিই হব প্রধান, লাভ করব শ্রেষ্ঠত্ব। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ করে বলেন, এইটিই হবে আমার শেষ জন্ম, উত্তরে আমিই অতিক্রম করব জন্মান্তরের মহাসমুদ্র, দূর হবে জন্মান্তরের দুঃখ, এক জন্মেই মোক্ষ লাভ করবে জীব।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই দৃশ্যগুলি, দেখি অজন্তার চিত্রশিল্পীর এক সুন্দরতম সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি।

তার পাশেই, প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত দেখি, শ্রাবস্তী নগরে, নৃপতি

প্রসেনজিতের সামনে, বুদ্ধ প্রদর্শন করেন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ। আছে তার মধ্যে একই সময়ে তাঁর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে দর্শন দান। বিজিত হয় অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণ।

ফিরবার পথে, একটি বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে তুইটি জাতক ও পূর্ণ অবদানের দৃশ্য দেখি। অনুরূপ এই প্যানেলটি বুদ্ধের জীবনাবলীর ঘটনার দৃশ্যের আকৃতিতে, আছে বিপরীত দিকেও। প্রথমেই অঙ্কিত দেখি রুরু জাতকের কাহিনী, কাহিনী এক মহাসমৃদ্ধিশালী বণিকপুত্রের। অধিকারী সে প্রচুর ঐশ্বর্যের, কাটায় জীবন বিলাসে ও ব্যসনে। ক্রমে নিঃশেষিত হয় তার সমস্ত সম্পদ, হয় সে ঋণী। একদিন উত্তমর্ণদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্য সে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত হয়ে, সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে থাকে।

বোধিসত্ত্ব তখন এক স্বর্ণ-মৃগ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, বাস করেন সেই স্থানে একাকী। তাঁর কর্ণে, বণিকপুত্রের কাতরধ্বনি প্রবেশ করে। তিনি দয়াপরবশ হয়ে, সেই জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। প্রতিশ্রুতি দেন বণিক-পুত্র, প্রকাশ করবেন না তিনি কাহারও কাছে স্বর্ণমৃগের কথা।

আবার মহারাণী ক্ষেমা স্বপ্ন দেখেন। দেখেন, এক স্বর্ণমৃগ তাঁর কাছে বাণী প্রচার করছেন। তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা রাণীর অন্তঃকরণে জাগে। প্রেরিত হয় লোক দিকে দিকে তার অনুসন্ধানে। বণিকপুত্রও সেই বার্তা শোনে, প্রকাশ করে দেয় রাণীর নিকটে কোথায় আছে স্বর্ণমৃগ, সঙ্গে নিয়ে আসে রাজাকেও মৃগের আলয়ে। ভঙ্গ হয় তার প্রতিশ্রুতি। এদিকে, মৃগের কণ্ঠস্বর শুনে রাজা স্তব্ধ হয়ে যান একেবারে, ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করে, কৃতাঞ্জলিপুটে করেন তাঁর স্তুতি। শেষে তাঁকে বারাণসীতে নিয়ে যান। চরিতার্থ হন মহারাণী ক্ষেমা তাঁর বাণী শুনে, পূর্ণ হয় তাঁর মনস্কাম। আদেশ করেন নৃপতি, কেউ স্পর্শ করতে পারবে না এই স্বর্ণমৃগের অঙ্গ। সেই থেকে নিষিদ্ধ বারাণসীধামে পশু-পক্ষীর অঙ্গে আঘাত।

তার পাশেই, বিদুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনী দেখি। জন্ম নেন বোধিসত্ত্ব বিদূর পণ্ডিত হয়ে, নিযুক্ত হন মন্ত্রী, ইন্দ্রপ্রস্থের এক নৃপতির। নৃপতিকে তিনি শুধু ঐহিকের কর্তব্য সম্বন্ধেই উপদেশ দেন না, সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থিকের কথাও

বলেন, শোনান তত্ত্বকথা। জম্বুদ্বীপের আরও অনেক রাজা তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে বাস করেন, তাঁর মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শোনেন।

একদিন চারিজন রাজার মধ্যে তর্ক হয়, আছেন তাঁদের মধ্যে নাগরাজও। তর্ক হয় তাঁদের মধ্যে গুণে কে শ্রেষ্ঠ। মীমাংসা হয় না সে তর্কের, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থের নৃপতির শরণাপন্ন হন। বলেন, আছেন নাকি এক জ্ঞানী তাঁর রাজসভায়, সক্ষম হবেন যিনি এই সমস্যার মীমাংসা করতে।

উপদেশ দেন নৃপতি তাঁদের বিদুর পণ্ডিতের কাছে যেতে। মানেন তাঁরা রাজার উপদেশ, সন্তুষ্ট হন বিদুর পণ্ডিতের মীমাংসায়, মেনে নেন তাঁর অভিমত।

পাতালে বসে শোনেন এই বার্তা নাগরাণী, বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণেও বিদুর পণ্ডিতের আলোচনা শোনবার।

রাজা বলেন, অসম্ভব এই প্রস্তাব।

কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেন পুণ্যক, যক্ষ সেনাপতি, প্রণয়ী তিনি নাগরাজ কন্যার। শর্ত হয়, যোগ্য হবেন তিনি নাগিনীর পাণিগ্রহণে, সক্ষম হন যদি তিনি বিদুর পণ্ডিতকে নাগরাজ্যে আনয়নে। পুণ্যক ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের নৃপতিকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করেন। বিদুর পণ্ডিতকে পণ রাখা হয়। নাগরাজ্যে যান বিদুর পণ্ডিত, সফল হয় নাগরাণীর বাসনা।

পূর্ণ অবদানের চিত্র দেখি। রজিলা নামে এক বণিক ছিল। এক দৈত্য তাঁর জাহাজ আক্রমণ করে, চূর্ণবিচূর্ণ করতে তাঁর অর্ণবপোত। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পূর্ণ এসে হাজির হন। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁর অন্তঃকরণ, তাঁকে দেখে দৈত্য পলায়ন করে। হয় না কোন ক্ষতি বণিকের। পূর্ণ বলেন, ঐ পোত-ভরতি চন্দন কাষ্ঠ দিয়েই, নির্মাণ কর এক মন্দির, পদার্পণ করবেন সেই মন্দিরে পরমজ্ঞানী। সেই চন্দন কাঠ দিয়েই নির্মিত হয় এক সুন্দরতম মহিমময় মন্দির। সত্যই পদার্পণ করেন সেই মন্দিরে বুদ্ধ, করেন তথাগত। অপরূপ এই চিত্রটি দেখি মুগ্ধ হয়ে।

দেখি একে একে মোরগের শিক্ষা আর অসিহস্তে একটি বোধিসত্ত্বের মূর্তিও, অঙ্কিত প্রাচীরের গাত্রে। সুন্দরতম এই বোধিসত্ত্বের মূর্তিও, বৈশিষ্ট্য অজন্তার চিত্রশিল্পীর।

স্থপতি আর চিত্রশিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

তৃতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। দেখি একে একে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দির। সবগুলিই বিহার, সমসাময়িক প্রথম ও দ্বিতীয় গুহামন্দিরের, নির্মিত হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, নির্মাণ করেন চালুক্য রাজারা। পড়ে সমপর্যায়েও, পরিকল্পনায় ও অঙ্গের সুন্দরতম অনুপম শিল্পসম্ভারে ও মূর্তি-সম্ভারে। পড়ে স্তম্ভের নিখুঁত গঠনসৌষ্ঠবে, আর তার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্পদেও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্থপতির, অপরূপ, মহিমময় অনুপম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের।

বৃহত্তম আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে চতুর্থ গুহামন্দিরটি। চতুষ্কোণ এই মন্দিরের সভাগৃহটি বিস্তৃত হয়ে আছে সাতাশি ফুট চৌরস পরিধি নিয়ে, বুকে নিয়ে আছে আটাশটি অপরূপ সুষ্ঠু গঠন স্তম্ভ, রচিত শৈলমালার অঙ্গ কেটে। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য মহিমময় মূর্তির সম্ভার অঙ্গে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম লতাপল্লব। রচিত দেখি প্রধান প্রবেশ পথের কাছে মূর্তি দিয়ে একটি বৌদ্ধ প্রতীক, বৈশিষ্ট্য পরবর্তী যুগের মহাযান স্থাপত্যের। অসম্পূর্ণ এই মন্দিরটি, সময় হয় নাই তাকে রূপ দেওয়া। হ'ত যদি সম্পূর্ণ, হ'ত এই বিহারটি বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার বুকে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের নিদর্শন।

দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, বেরিয়ে এসে একে একে ষষ্ঠ ও সপ্তম গুহামন্দির দেখি। সবগুলিই বিহার, সমসাময়িকও, ৪৫০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। দ্বিতল ষষ্ঠ গুহামন্দিরটি, খুব সম্ভব তার নির্মাণ সুরু হয় সপ্তম গুহামন্দির নির্মাণের পরে। বুকে নিয়ে আছে এই দুইটি মন্দিরই কয়েকটি সুন্দরতম ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি। অনবদ্য গঠনসৌষ্ঠবে এই মূর্তিগুলি জীবন্ত আছে বিভিন্ন ভঙ্গীতে। দেখি অপরূপ এই মন্দির দুইটির সম্মুখভাগের শিল্পসম্ভারও। সূক্ষ্মতম তাদের স্তম্ভের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, সুন্দরতম তাদের শীর্ষদেশের মূর্তিসম্ভারও, প্রতীক বৌদ্ধ স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্তির, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বৌদ্ধ ভাস্করেরও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

অষ্টম গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম প্রাচীনতম এই গুহামন্দিরটি, সমসাময়িক নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ, গুহামন্দিরের, নির্মিত হয়

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা নির্মাণ করেন। নাই তার অঙ্গে কোন প্রকৃষ্ট শিল্পসম্পদ।

অষ্টম গুহামন্দির দেখে নবমে উপনীত হই। একটি হীনযান চৈত্য, বৌদ্ধ ধর্মমন্দির, এই মন্দিরটি অন্যতম প্রাচীনতম গুহামন্দির অজন্তার। সুস্পষ্ট তার অঙ্গে কাঠের কাজের চিহ্ন। ক্ষুদ্রতর দশম গুহামন্দিরের, দেখি জীর্ণ তার সম্মুখভাগ—পরিণত হয়েছে ধ্বংসে।

নবম গুহামন্দির দেখে দশমে উপনীত হই। একটি চৈত্য, প্রাচীনতম গুহামন্দির অজন্তার, লেখা আছে তার অঙ্গের লিপিতে, নির্মিত হয় এই মন্দিরটি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। ছিয়ানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ, একচল্লিশ ফুট প্রস্থ এই মন্দিরটির উচ্চতা ছত্রিশ ফুট। দেখি রচিত এই চৈত্যের ভিতরে একটি কেন্দ্রস্থল, তার প্রান্তদেশে বৃত্তাংশে একটি দাগোবা বা স্তূপ বুদ্ধের স্মৃতির আধার। দেখি গলিপথ ও কেন্দ্রস্থলের চতুর্দিকে। উনচল্লিশটি সুন্দর স্তম্ভ দিয়ে তাদের কেন্দ্রস্থল থেকে পৃথক করা হয়েছে। নাই এই স্তম্ভের নিম্নতম প্রদেশ, নাই শীর্ষদেশও। দেখে মনে হয় ছিল কিছু কাঠের কাজও, ভাজার চৈত্যের মত। বুকে নিয়ে ছিল অপরূপ চিত্রসম্ভারও, দেখি তার অবশিষ্ট প্রাচীরের গাত্রে। মহামহিমময় ছিল এই চৈত্যর সম্মুখভাগ, ছিল নবম গুহামন্দিরের সম্মুখভাগও। আজ তারা হারিয়েছে তাদের পূর্ব গৌরব, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে।

দশম মন্দির দেখে আমরা একে একে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্দির দেখি। অন্যতম প্রাচীনতম হীনযান বিহার তারাও, সমসাময়িক নবম ও দশম গুহামন্দিরের। নির্মিত হয় তাদের মধ্যে একাদশ সবার শেষে। একাদশ বিহারের অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রে মূর্তিসম্ভার দেখি। দেখি একটি গর্ভগৃহ ও সভাগৃহের প্রত্যন্ত প্রদেশে। নির্মিত হয় সেগুলি পরবর্তী কালে, নির্মাণ করেন মহাযান বৌদ্ধ স্থপতি। নাই কোন দর্শনযোগ্য দ্বাদশ ও ত্রয়োদশে।

তার পরে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গুহামন্দির দেখি। অসম্পূর্ণ চতুর্দশ, নির্মিত হয় খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, পলায়ন করেন যখন বৌদ্ধ স্থপতি কাঞ্চীর পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের ভয়ে ভীত হয়ে, পরিত্যাগ করে যান

অজন্তা। রচিত হয় ত্রয়োদশ গুহামন্দিরের উপরে। সমসাময়িক পঞ্চদশ সপ্তম গুহামন্দিরের, পড়ে সমপর্যায়েও, পরিকল্পনায় আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে।

উপনীত হই ষোড়শ গুহামন্দিরে। সমসাময়িক এই গুহামন্দিরটি সপ্তদশের, পড়ে সমপর্যায়েও, নির্মিত হয় ৪৭০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, নির্মাণ করেন বাকাটক বংশের শেষ রাজা, হরিসেনের সুযোগ্য মন্ত্রী বরাহদেব। হরিসেন অলঙ্কৃত করেন বাকাটক সিংহাসন ৪৬৫ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নির্মিত হয় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই সপ্তদশ গুহামন্দিরও, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর অধীনস্থ এক রাজা কর্তৃক। লেখা আছে তাদের অঙ্গের শিলালেখে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দির দুইটি গুপ্ত যুগের স্থপতির আর ভাস্করের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজন্তার চিত্রশিল্পীরও। পরিণত হয়ে আছে এক স্বপ্নপুরীতে, এক রহস্যলোকে, এক অমরাবতীতে। পেয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের ও চিত্রশিল্পের দরবারে।

আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই মন্দিরের সম্মুখভাগের অপরূপ শিল্পসম্ভার, দেখি স্থপতির এক সুন্দরতম সৃষ্টি, স্তম্ভযুক্ত অলিন্দে উপনীত হই। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখি তার বুকের স্তম্ভের শ্রেণী। চতুষ্কোণ এই স্তম্ভের নিম্নতম প্রদেশ, অষ্টকোণ স্তম্ভদণ্ড। তাদের অঙ্গে শোভা পায় অনবদ্য, সূক্ষ্মতম লতাপল্লব, শীর্ষদেশে নিখুঁত, সুষ্ঠু-গঠন মূর্তির সম্ভার, মূর্তি বুদ্ধের, মূর্তি বোধিসত্ত্বেরও।

অনুরূপ এই বিহারটি, প্রথম গুহামন্দিরের (বিহারের), বিস্তৃত হয়ে আছে তার চতুষ্কোণ সভাগৃহটি পঁয়ষট্টি ফুট চৌরস পরিধি নিয়ে। বেষ্টন করে আছে তার সম্মুখ ভাগ একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ তিন দিকে ষোলটি চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ। অনবদ্য সুন্দরতম কুড়িটি স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে বিভক্ত হয়ে আছে সভাগৃহের কেন্দ্রস্থল, তিন দিকের গলিপথের বেষ্টনী থেকে। বিভক্ত হয়ে আছে প্রথম গুহামন্দিরের কেন্দ্রস্থলও অনুরূপ সুন্দরতম স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে, হয়ে আছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের কেন্দ্রস্থলও।

সভাগৃহের প্রত্যন্ত দেশে, শৈলমালার অন্তরতম প্রদেশে, রচিত হয়েছে একটি সুপ্রশস্ত গর্ভগৃহ, বসে আছেন সেই গর্ভগৃহে এক মহামহিমময় বুদ্ধ। অপরূপ এই বুদ্ধমূর্তিটি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের।

স্তব্ধ বিস্ময়ে, ঘুরে ঘুরে দেখি মন্দিরের অঙ্গের স্থপতির, আর ভাস্করের

তুলনাহীন সাধনার দান। তার পর বাম দিক থেকে দেখতে সুরু করি, তার প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের অতুলনীয় চিত্রসম্ভার।

প্রথমেই অঙ্কিত দেখি সুতোসোমা জাতকের কাহিনী। ইন্দ্রপ্রস্থের, কুরুবংশের এক নৃপতির প্রথমা পত্নীর গর্ভে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় সুতোসোমা। যৌবনে উপনীত হয়ে তিনি শিক্ষালাভের জন্য তক্ষশিলায় গমন করেন। পারদর্শিতা লাভ করেন সর্ববিদ্যায়, এক বিখ্যাত আচার্যের নিকট। রাজার মৃত্যু হলে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। একদিন এক পদ্মের সরোবরে স্নান সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের সময়, এক নরখাদক দস্যু তাঁকে আক্রমণ করে। তার গৃহে নিয়ে যায়। বহুকষ্টে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি দস্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করেন। প্রাসাদে ফিরে এসে দেবতার পূজা ও অর্চনা করেন, আবার ফিরে যান বুদ্ধ দস্যুর আলয়ে। পালিত হয় তাঁর প্রতিশ্রুতি।

বিস্মিত হয় দস্যু। কল্পনাতীত তার কাছে বোধিসত্ত্বের এই সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে প্রত্যাবর্তন। এই দস্যুই তাঁর সহপাঠী ছিল তক্ষশিলায়, অধিষ্ঠিত ছিল একদিন বারাণসীর সিংহাসনেও! পরিণত এখন সে এক নরখাদকে। দ্রবীভূত হয় দস্যুর কঠোর হৃদয় বোধিসত্ত্বের মধুর ব্যবহারে, শোনে সে তাঁর ধর্মের বাণী, অশ্রুসিক্ত হয় তার নয়ন, বিস্মিত হয় নরখাদক, শেষে পরিবর্তিত হয় সে একেবারে। বোধিসত্ত্বের কৃপায় ফিরে পায় সে তার রাজসিংহাসন। তার পাশেই আরও একটি জাতকের কাহিনী অঙ্কিত দেখি, প্রদর্শক বলতে পারে না তার কাহিনী।

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে দেখি নন্দের পরিবর্তনের দৃশ্য, পরিবর্তিত হন নন্দ সঙ্ঘের জীবনযাত্রায়। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ। ভুলিয়ে নিয়ে আসেন বুদ্ধ তাঁকে তাঁর প্রিয়তমা, রূপবতী ভার্যার কাছ থেকে, হস্তে দিয়ে তাঁর নিজের ভিক্ষাপাত্র। তাঁরা সঙ্ঘে উপনীত হন। মুণ্ডিত হয় নন্দের কেশ আর শ্মশ্রু, দীক্ষিত হন তিনি সঙ্ঘের ধর্মে। অভ্যস্ত ঐশ্বর্য আর বিলাসের জীবনে, প্রবৃত্তি নাই নন্দের ভিক্ষুর জীবনযাপনে। তিনি ফিরে যেতে চান রাজপ্রাসাদে, প্রিয়তমা পত্নীর কাছে। বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে তিনি একদিন সঙ্ঘ থেকে পলায়ন করেন, পরিত্যাগ করেন সঙ্ঘ। প্রাসাদে

যাওয়ার পথে এক আম্রকুঞ্জে উপনীত হন। জানতে পারেন বুদ্ধ। মহাকাশ দিয়ে উড়ে এসে তিনি কুঞ্জ থেকে কিছু দূরে অবতরণ করেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে নন্দ এক বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হন। বুদ্ধ নিকটে আসেন, মহাশূন্যে উত্থিত হয় বৃক্ষটিও। প্রকাশিত হন নন্দ। তাঁকে ধরে নিয়ে যান বুদ্ধ, নিয়ে যান সঙ্ঘে। সফল হয় না তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা।

বিপরীত দিকেও অনুরূপ একটি প্যানেলের অঙ্গে দেখি বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর কয়েকটি দৃশ্য। দৃশ্য দেখি মায়াদেবীর গর্ভধারণের। অনুরূপ এই দৃশ্যটি দ্বিতীয় গুহামন্দিরের দৃশ্যের।

তার পাশেই ঋষি অসিত, নিযুক্ত তিনি বুদ্ধের জন্মপত্রিকা রচনায়, তাঁর সামনে উপবিষ্ট রাজা ও রাণী, উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করেন। বলেন অসিত, এই পুত্রই হবেন বুদ্ধ, হবেন তথাগত। সন্তুষ্ট নন পিতামাতা এই সংবাদে, নয় তাঁদের অভিলষিতও। তাই করেন সৃষ্টি নানা বিঘ্নের, রচিত হয় প্রতিবন্ধক প্রতিপদে। প্রাণপণ চেষ্টা করেন যাতে পুত্র বুদ্ধ না হতে পারেন।

তার পাশেই দেখি বিদ্যালয়ে বসে আছেন বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে শাক্য-পরিবারের আরও অনেক বালক। প্রদর্শন করেন তিনি বিভিন্ন জ্ঞানের পরিচয়, অজ্ঞাত গুরু বিশ্বামিত্রের কাছেও। বিস্মিত হন গুরু, নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি মহাজ্ঞানী শিষ্যের প্রতি।

অপরূপ সুন্দরতম এই দৃশ্যগুলি দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

পাশেই বুদ্ধের প্রথম ধ্যানমগ্ন হওয়ার দৃশ্য দেখি। বুদ্ধ পিতার সঙ্গে হলে যুক্ত ষণ্ডের প্রতিযোগিতা দেখতে যান। দেখেন, শ্রান্তিতে অবসন্ন এই ষণ্ডেরা, নির্গত হয় রক্ত তাদের স্কন্ধ থেকে। ক্লান্ত পরিচালকেরাও প্রখর সূর্যের তাপে। আর দেখেন, ভক্ষণ করছে পাখীরা কীট, নির্গত-ধরিত্রীর বুক থেকে। এক সীমাহীন দুঃখে ও করুণায় পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ। এক জম্বু-বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে তিনি ধ্যানমগ্ন হন, অভিভূত হন এক অলৌকিক ভাবাবেশে। নির্গত হন রাজপুরুষেরা রাজপুত্রের সন্ধানে। দেখেন, বুদ্ধ বসে আছেন এক বৃক্ষের নীচে, বিস্তৃত তার ছায়া তাঁর মস্তকের উপর। সংজ্ঞা নাই বুদ্ধের। অপরূপ এই দৃশ্যটিও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অজন্তার চিত্রশিল্পীর। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

দেখি তার পাশেই, পুত্র হবে সন্ন্যাসী, ভাবতেও এক অপরিসীম ব্যথায় পরিপূর্ণ হয় নৃপতি শুদ্ধোদনের অন্তঃকরণ। তাই তাঁকে বাস করতে হয় অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে, কাটাতে হয় বিলাসে আর ব্যসনে। অবরুদ্ধ তিনি অন্তঃপুরে, অনুমতি নাই প্রাসাদের বাইরে যাওয়ারও। বিদ্রোহী হন পুত্র। অনুরোধ করেন তিনি সারথী চন্দকে তাঁকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, করেন অনুনয়ও। সম্মত হন চন্দ তাঁর প্রস্তাবে, তাঁকে নগর পরিক্রমায় নিয়ে যান। যান বুদ্ধ রথ-আরোহণে। যান চারবার। দেখেন নিদারুণ দুঃখের দৃশ্য, দৃশ্য জরার আর মৃত্যুর। স্থির করেন, রাজপ্রাসাদের আনন্দের জীবন তাঁর জন্য নয়। পরিত্যাগ করে যেতে হবে এই জীবন, নিযুক্ত হতে হবে সংসারের দুঃখবিমোচনের কাজে, করতে হবে প্রাণ পণ। তবেই তিনি লাভ করবেন নির্বাণ, হবেন তথাগত, পরম জ্ঞানী। মোক্ষলাভ করবে জীবও।

তার পাশেই সংসার পরিত্যাগ করে চলেছেন সিদ্ধার্থ। উপনীত হয়েছেন মগধের রাজধানী রাজগৃহের বিপণিতে। সংবাদ পেয়ে উপনীত হন সেখানে নৃপতি বিম্বিসারও। প্রথমে স্তুতি করেন, তার পর বলেন রাজা, দেবেন তিনি সন্ন্যাসীকে অর্ধেক রাজত্ব, পারত্যাগ করেন যদি তিনি সন্ন্যাসধর্ম, পরিণত হন গৃহস্থে। কিন্তু অচল বুদ্ধের প্রতিজ্ঞা, মোহ নাই তাঁর ঐশ্বর্যে, লোভ নাই রাজত্বে। প্রত্যাখ্যান করেন তিনি মহারাজার প্রস্তাব, পরিত্যাগ করে যান রাজগৃহ। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, বুদ্ধ হওয়ার পর, প্রথমেই তিনি রাজগৃহে পদার্পণ করবেন। পবিত্র হবে রাজগৃহ তথাগতের চরণস্পর্শে, ধন্য হবেন মহারাজা বিম্বিসারও তাঁর দর্শন লাভ করে।

তার পাশেই দেখি, সংসার পরিত্যাগ করে গিয়ে বুদ্ধ নিযুক্ত কঠোর তপস্যায়, কাটান উপবাসে আর অনিদ্রায়। কিন্তু লাভ করেন না জ্ঞানের আলোক। মনস্থ করেন তখন, খাদ্য গ্রহণ করে দেহ ধারণ করবার। এক পল্লী ভূস্বামীর গৃহে সুজাতা জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে উপনীতা হয়ে তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন, বুদ্ধ তাঁর কাছে খাদ্য প্রার্থনা করছেন। খাদ্য নিয়ে বুদ্ধের সন্ধানে যান সুজাতা। দেখেন, এক বট-বৃক্ষের নীচে এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। তিনি সেই সন্ন্যাসীকে খাদ্য নিবেদন করেন। গ্রহণ করেন সন্ন্যাসীও

সেই আহার্য। ধন্যা হন সুজাতা। ভাবেন সন্ন্যাসীও, এই তবে ভগবানের নির্দেশ। পরমুহূর্তেই নিমগ্ন হন ধ্যানে।

তার পাশেই চিত্র আর এক কাহিনীর। সাত দিন বুদ্ধ মহাভাবে নিমগ্ন। হন তিনি ক্ষুধার্ত। উড়িষ্যাবাসী বণিক ভ্রাতৃদ্বয়, ট্রাপুসা আর বল্লিকা, বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে অতিক্রম করেন সেই পথ। গমন করেন তাঁরা এক আম্রকুঞ্জের নিকট দিয়ে। সেই কুঞ্জের অভ্যন্তরেই উপবিষ্ট বুদ্ধ। বলেন তাঁদের কুঞ্জের প্রতিহারী, এই কুঞ্জের ভিতরই বসে আছেন উপবাসী বুদ্ধ। তাঁরা নিবেদন করেন তাঁকে মধু আর ছাতু। পরম পরিতৃপ্ত হন বুদ্ধ সেই ছাতু আর মধু আহার করে। ধন্য হন বণিক ভ্রাতৃদ্বয়ও, সার্থক হয় তাঁদের জীবন।

অপরূপ এই দৃশ্যগুলি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বৌদ্ধ-চিত্রশিল্পীর, রচনা করেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী।

উপনীত হই সপ্তদশ গুহামন্দিরে। সমসাময়িক এই গুহামন্দিরটি ষোড়শ গুহামন্দিরের, পড়ে সমপর্যায়েও, অঙ্গে নিয়ে আছে মহাযান বৌদ্ধস্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বৌদ্ধভাস্করেরও—সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের। সাজান অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, এই দুইটি গুহামন্দিরকেই শ্রেষ্ঠ ভূষণে, অনবদ্য অলঙ্করণে। উজাড় করে দেন জীবনের সমস্ত সাধনা, হৃদয়ের সীমাহীন ঐশ্বর্য, মনের অপরিসীম মাধুরী। পরিণত হয় তারা অমরাবতীতে, এক স্বপ্নলোকে, অলোকসুন্দর রহস্যলোকে। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের আর চিত্রশিল্পের দরবারে। হয় বিশ্বজিৎ।

অনবদ্য সুন্দরতম এই মন্দিরের স্তম্ভগুলিও, অনুরূপ ষোড়শ গুহামন্দিরের স্তম্ভের গঠনসৌষ্ঠবে আর অঙ্গের ও শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারে আর মূর্তিসম্ভারে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্দিরের স্থপতির আর ভাস্করের অনবদ্য সুন্দরতম সৃষ্টি দেখে, আমরা তার প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার দেখতে সুরু করি। বাম দিক থেকে অগ্রসর হই।

সংসারচক্র ও গন্ধর্বদের দেখে আমরা দুইটি জাতকের কাহিনী চিত্রিত দেখি। বোধিসত্ত্ব এক হস্তীরাজের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অধীনে

তাঁর আট হাজার হস্তী। বাস করেন তাঁরা হিমালয় পর্বতে, সদ্দান্ত সরোবরের তীরে, এক স্বর্ণ-বর্ণ গুহায়। চতুর্দিকে তার শ্বেত, নীল আর লাল বর্ণের প্রস্ফুটিত পদ্ম। বেষ্টিত হয়ে থাকেন দিগন্ত-প্রসারিত স্বর্ণশীর্ষ ধানের ক্ষেতে, আর ঘন বনবীথি আর অটবীতে। বিভিন্ন তাদের রঙও। সুবিশাল সেই হস্তীর আকৃতি। তার মুখের দুই পাশ থেকে নির্গত হয় দীর্ঘ রজ্জুর আকার শুভ্র দন্ত।

তাঁর দুই রাণী। ক্ষুব্ধ হন তাদের মধ্যে একজন তাঁর ব্যবহারে, হন ক্রুদ্ধাও। প্রার্থনা করেন, জন্মান যেন তিনি পরজন্মে এক পরমা রূপবতী তরুণী হয়ে। হন বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী। মুগ্ধ হন নৃপতি তার রূপে, হন তাঁর আজ্ঞাবহ। প্রেরণ করেন তিনি বারাণসী থেকে রাজশিকারী, সঙ্গে নিয়ে বিষাক্ত তীর। সেই তীরের আঘাতে মৃত্যু বরণ করেন হস্তীরাজ। তাঁর দন্ত উৎপাটন করে নিয়ে যায় শিকারী। হন তিনি সেই দন্তের অধিকারী, নির্গত হয় সেই গজদন্ত থেকে ছয় প্রকারের রশ্মি। তারপর, অনাহারে মৃত্যু হয় রাণীর।

সফল হয় তার প্রার্থনা। তিনি পরজন্মে বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেরিত হন রাজশিকারীও। লাগে তাঁর দীর্ঘ সাত বৎসর হিমালয়ে উপনীত হতে। বিদ্ধ হন হস্তীরাজ বিষাক্ত তীরে, কিন্তু সক্ষম হন না শিকারী তাঁর দন্ত উৎপাটন করতে। তখন তিনি নিজেই আপন দন্ত উৎপাটন করেন, উপহার দেন সেই দন্ত শিকারীকে। ফিরে গিয়ে শিকারী সেই দন্ত রাণীকে দেন। বসে আছেন তখন রাণী বাতায়নে, হস্তে নিয়ে একটি বহুমূল্য মণি-মুক্তা-খচিত ব্যজনী। স্থাপন করেন রাণী সেই গজদন্ত নিজের অঙ্কে। হস্তীরাজের কথা মনে পড়ে। ভেসে ওঠে মনের মণিকোঠায় একে একে কত প্রেমের সম্ভাষণ, কত অতুলনীয় ভালবাসার কাহিনীও। এক সীমাহীন বিয়োগ-ব্যথায় পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ। অসহনীয় সেই ব্যথা। মৃত্যুবরণ করেন রাণী সেই দিনই। পরিসমাপ্তি হয় তাঁর জীবনের।

তার পাশেই মহাকপি জাতকের কাহিনী দেখি। বোধিসত্ত্ব বানররাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অধীনে তাঁর আশি হাজার বানর। একদিন এক

মৎস্যজীবী বারাণসীর রাজাকে একটি আম্রফল উপহার দেন। সুলভ নয় অমন সুগন্ধযুক্ত আম। লুব্ধ হন নৃপতি। জিজ্ঞাসা করেন তার প্রাপ্তিস্থান। তার সঙ্গে একটি বনে উপনীত হন। দেখেন, বানরেরা বৃক্ষে আরোহণ করে আম খাচ্ছে। রাজা অনুচরদের আদেশ করেন, বেষ্টন করতে সেই অরণ্য, হত্যা করতে সমস্ত বানরকে।

এই বনের পিছনে, প্রবাহিতা একটি কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, তার অপর পারে আরও একটি গভীর অরণ্য। সেখানেও বৃক্ষারূঢ় অনেকগুলি বানর, আম্রভক্ষণে রত। বানররাজ বোধিসত্ত্ব প্রজাদের প্রাণরক্ষার একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। বানর দিয়েই সেই স্রোতস্বিনীর বুকে একটি সেতু নির্মিত হয়। সেই সেতু দিয়ে একে একে সকল বানর অতিক্রম করে নদী, উপনীত হয় অপর পারে। কিন্তু আহত হন বানররাজ, সক্ষম হন না অপর পারে যেতে। মুগ্ধ বিস্ময়ে নৃপতি এই দৃশ্য দেখেন। ভাবেন, নিশ্চয়ই হবেন ইনি কোন বানররূপী দেবতা। দ্রুতগতিতে বানররাজের নিকট উপনীত হয়ে নিযুক্ত হন তাঁর শুশ্রূষায়। শোনেন অনেক তত্ত্বকথাও, জীবিত থাকেন যতক্ষণ বানররাজ। দেহান্তে, করেন তাঁর ঔর্ধ্বদেহিক কাজ।

অগ্রসর হয়ে বিশ্বান্তর জাতকের কাহিনী দেখি। মহারাজ শিবির পুত্র, সঞ্জয়ের রাণী যুস্ততির গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। জন্মাবার আগেই রাজার করকোষ্ঠী বিচার করে জ্যোতিষী বলেন, হবেন এই পুত্র একজন অসামান্য দাতা, সীমাহীন হবে সেই দান। তার পরিচয় পাওয়া যায় শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই। মাতৃগর্ভ থেকে সম্পূর্ণ নির্গত হওয়ার পূর্বেই উচ্চারিত হয় শিশুর কণ্ঠ থেকে, মাগো, আছে কি কিছু দেওয়ার মত। বিস্মিত হয়ে মাতা শিশুর হস্তে একটি টাকার থলি অর্পণ করেন। বিতরণ করে শিশু সেই অর্থ। আট বছর বয়সে বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণে দান করবেন তিনি এমন সম্পদ, যা তাঁর নিজস্ব, বিতরণ করবেন নিজের কর্ণ অথবা চক্ষু অথবা হৃদয়। বর্ধিত হয় বয়স বাড়ে তাঁর দানের স্পৃহাও। অনাবৃষ্টি হয় কলিঙ্গদেশে, জ্বলে যায় ক্ষেতের সমস্ত ফসল, দুর্ভিক্ষ আর মহামারিতে ছেয়ে ফেলে সমস্ত কলিঙ্গদেশ, দান করেন বোধিসত্ত্ব কলিঙ্গরাজকে তাঁর ঐন্দ্রজালিক হস্তীটি। সেই সঙ্গে তাঁর বহুমূল্য সাজ-সরঞ্জাম আর মণিমুক্তা-খচিত অঙ্গের আবরণ।

মহাক্রুদ্ধ হয় প্রজারা, তাঁর জীবন হয় বিপন্ন। শেষে হন তিনি নির্বাসিত। সঙ্গী হন তাঁর পত্নী মাদ্রীদেবী আর পুত্র ও কন্যা। যাত্রার পূর্বে তিনি দান করে দিয়ে যান তাঁর যথাসর্বস্ব, থাকে না কিছু অবশিষ্ট, কিন্তু অবশিষ্ট থাকেন চার ব্রাহ্মণ। তাঁদের তিনি দান করেন তাঁর রথের অশ্বদ্বয়। সেই রথে চড়েই, তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে নির্বাসনে যাত্রার উপক্রম করছিলেন। তাই পদব্রজেই সুরু হয় তাঁদের যাত্রা।

তখন দেবতারা এগিয়ে আসেন তাঁকে পরীক্ষা করতে। তাঁর পুত্র কন্যাদের নিয়ে গিয়ে, জুজাকা নামে এক নির্দয় ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করেন। নিষ্ঠুর সেই ব্রাহ্মণ, প্রহৃত হয় তাঁর পুত্র ও কন্যা হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায়। রাত্রি সমাগমে তাদের পথের উপর শুইয়ে রেখে, ব্রাহ্মণ বৃক্ষে আরোহণ করে, রাত্রি যাপন করে, থাকে না তার বন্যজন্তুর আক্রমণের ভীতি। তখন তাদের পিতামাতার ছদ্মবেশে, দেবতারা সেখানে উপনীত হন। মুক্ত করেন তাদের হস্তপদের বন্ধন, অঙ্কে তুলে নিয়ে করেন কত যত্ন, কত আদর, অদৃশ্য হয়ে যান দেবতারা রাত্রি অবসান হওয়ার পূর্বেই। প্রভাত হলে ব্রাহ্মণও বৃক্ষ থেকে অবতরণ করেন। আবার সুরু হয় তাদের উপর অত্যাচার। অবশেষে তারা তাদের পিতামহের আলয়ে উপনীত হয়, লাভ করে নিরাপদ আশ্রয়, পরিসমাপ্তি হয় তাদের অশেষ দুঃখের আর অপরিসীম কষ্টের।

শঙ্কা জাগে দেবতা শঙ্করের মনে, সময় হয়েছে এখন বোধিসত্ত্বের নিজের পত্নীকেও বিতরণ করবার। তাই তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে নিজেই মাদ্রীকে প্রার্থনা করেন, নইলে দান করবেন তাঁকে অন্য কোন প্রার্থীকে। একে একে প্রিয় পুত্র, কন্যা ও প্রিয়তমা ভার্যাকে দান করেন বোধিসত্ত্ব, লাভ করেন শ্রেষ্ঠ দাতার আসন জগতে।

কিছুদিন পরে, মাদ্রীকে ফিরে পেয়ে, সংসার পরিত্যাগ করে গিয়ে সস্ত্রীক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। অবশেষে সঞ্জয় আর যুস্থতি তাদের আশ্রম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। মিলন হয় তাঁদের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে। লাভ করেন রাজ-সম্মান ও বোধিসত্ত্ব।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি চিত্রশিল্পীর এক অনবদ্য মহান সুন্দরতম সৃষ্টি। দেখি এক বহু-বিস্তৃত ঘটনার নিখুঁত সমাবেশ প্রাচীরের গাত্রে। নিবেদন করি

শ্রদ্ধার অঞ্জলি শিল্পীকে। সুতোসোমা জাতকের কাহিনী দেখে, উপস্থিত হই সারিপুত্রের প্রশ্নের দৃশ্যের সামনে।

দেখি, বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন সোপানশ্রেণীর সর্বনিম্ন ধাপে। ঐ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করেই তিনি স্বর্গধামে উপনীত হয়ে দেবতাদের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করেন। বাণী প্রচারিত হলে বুদ্ধ ধরিত্রীতে ফিরে আসেন। প্রাচীনতম সারিপুত্র বয়সে, তাই তিনিই প্রথমে বুদ্ধকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তার পরে অন্য সকলে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোদ্গলানা ইতিপূর্বেই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। পরিচয় দিয়েছেন উপালিও তাঁর অপরিসীম ধর্মজ্ঞানের। দেন নাই শুধু সারিপুত্র। মনীষী তিনি, অধিকারী বহুমুখী প্রতিভার, অভিজ্ঞ সমস্ত জ্ঞানেও। জ্ঞানের গরিমায় বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান। প্রশ্ন করেন তাঁকে বুদ্ধ একের পর এক। উত্তর দেন সারিপুত্র। নির্ভুল সেই উত্তর। বিস্মিত হন উপস্থিত সকলে, নিবদ্ধ তাঁদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি।

উপনীত হই একেবারে শেষ প্রান্তে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই সম্মুখের চিত্রটি দেখে। দাঁড়িয়ে আছেন এক অনিন্দসুন্দর মহামহিমময় বুদ্ধ। অনবদ্য সুন্দরতম তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব, দাঁড়িয়ে আছেন এক অপরূপ ভঙ্গিতে। প্রদীপ্ত তাঁর আনন অলোকসুন্দর দ্যুতিতে, নয়নে অপরিসীম করুণার আভাস। দাঁড়িয়ে আছেন দেবতা বুদ্ধ প্রাণবন্ত। বিপরীত দিকে সোপানের উপর উপবিষ্টা পত্নী যশোধরা, অঙ্কে নিয়ে শিশুপুত্র রাহুলকে। গোপার শিরে শোভা পায় মুক্তার সিঁথি, কবরীতে মুক্তার হার, কর্ণে হীরককুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে বহুমূল্য বাজু, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ। অনুরূপ ভূষণে ভূষিত শিশুটিও। ঈষৎ প্রসারিত তাঁদের মস্তক, নিবদ্ধ তাঁদের দৃষ্টি বুদ্ধের প্রতি। উদ্ভাসিত তাঁদের আনন ঐশ্বরীক দীপ্তিতে, বিকশিত তাঁদের নয়ন অন্তরের ভাষায়। যেন বসে আছেন এক পূজারিণী মাতা, অঙ্কে নিয়ে শিশু সন্তান, পূজা করেন বুদ্ধকে। পূজা করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিঃশেষ করে দিয়ে, করেন ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে, শ্রদ্ধায় অবনত মস্তক। অপরূপ এই দৃশ্যটি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অজন্তার বৌদ্ধ চিত্র-শিল্পীর, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বেরও, নিদর্শন এক অমর-কীর্তির। রচনা করেন শিল্পী হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড়

করে দিয়ে, তাই হন বিশ্বজিৎ। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই দৃশ্যটি, শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। মনে মনে ভাবি, কি আছে আমার, কি দিয়ে এই মহামহিমময় পরম-সুন্দরকে বরণ করি। কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দুইটি ছত্র :

ওহে সুন্দর, মরি মরি,
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি।

প্রদর্শকের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে। ফিরবার পথে প্রথমেই সর্বজাতকের কাহিনী দেখি। একদা বারাণসীর রাজা মৃগয়া করতে যান, সঙ্গে যান তাঁর সৈন্যসামন্ত আর পারিষদবর্গ। আদেশ করেন তিনি তাঁদের, সম্পূর্ণ বেষ্টন কর অরণ্য, থাকে যেন না কোন ছেদ, সক্ষম হয় না যেন কোন মৃগ পলায়ন করতে। বেষ্টিত হয় অরণ্য রাজার আদেশে। বোধিসত্ত্ব তখন এক হরিণশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন সেই অরণ্যে। পুরোধা তিনি, দেখেন রুদ্ধ পলায়ন-পথ। তিনি ধাবিত হন রাজার দিকে, অতি দ্রুত তাঁর গতি। রাজা নিক্ষেপ করেন শর, ভ্রষ্ট হয় সেই লক্ষ্য, কিন্তু ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন বোধিসত্ত্ব। নৃপতি ভাবেন নিশ্চয়ই বিদ্ধ হয়েছে তাঁর হরিণ শিশুটির অঙ্গে। পারিষদবর্গও তাঁকে ধরবার জন্য ছুটে আসেন। মুক্ত হয় পিছনের পথ। সেই পথ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে নির্গত হয় হরিণশিশু, পলায়ন করে অরণ্যের অভ্যন্তরে। স্তব্ধ বিস্ময়ে রাজা তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর দ্রুতগতিতে অনুসরণ করেন পলায়মান হরিণশিশুটিকে, পথের মাঝখানে একটি গভীর গহ্বর, আবৃত লতা-পল্লবে, অদৃশ্য হন তাদের অন্তরালে। অতি সন্তর্পণে হরিণশিশুটি অতিক্রম করে সেই গহ্বর। কিন্তু অবগত নন রাজা তার অস্তিত্ব, নিমজ্জিত হন তিনি তার অতল গহ্বরে। ফিরে আসে হরিণশিশুটি, দেখে আবদ্ধ নৃপতি গহ্বরে, সক্ষম নন তিনি বহির্গমনে। অতি কষ্টে রাজাকে উদ্ধার করে সে তাঁকে বনের বাইরে পারিষদদের কাছে পৌঁছে দেয়। তিরস্কৃত হন রাজা তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য, শোনেন ধর্মকথাও।

তার পাশেই মাতৃপোষক জাতকের কাহিনী দেখি। রাজত্ব করেন বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নৃপতি। বোধিসত্ত্ব তখন শ্বেতহস্তী হয়ে হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিশাল তাঁর দেহ। মাতা তার অন্ধ।

প্রতিদিন তিনি মাতার জন্য বিভিন্ন সুখাদ্য পাঠান। খেয়ে ফেলে সেই খাদ্য অন্য হস্তীরা। বঞ্চিতা হন মাতা। তাই তিনি মাকে নিয়ে চন্দ্রোনা পাহাড়ে গিয়ে বাস করেন। সুখের ও শান্তির হয় তাঁদের জীবন। পথ হারিয়ে বন বিভাগের এক কর্মচারী মহারণ্যে ঘুরে বেড়ান সাত দিন—সাত রাত্রি। কিন্তু মেলে না পথের সন্ধান। দেখতে পেয়ে বোধিসত্ত্ব তাকে নিজের পৃষ্ঠে তুলে বনের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। যাওয়ার সময় সে চিহ্নিত করে যায় প্রতিটি বৃক্ষ, উপনীত হয় বারাণসীতে।

মৃত্যু হয় রাজহস্তীর। প্রেরিত হয় লোক দিকে দিকে, উপযুক্ত হস্তীর অনুসন্ধানে। বাহির হন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ কর্মচারী, রাজশিকারীকে সঙ্গে নিয়ে উপকারী হস্তীটিকে ধরিয়ে দেবার জন্য—উপনীত হন সেই পর্বতে। মহাশক্তিশালী শ্বেতহস্তী, সক্ষম তিনি বিনা আয়াসে ধ্বংস করতে রাজশিকারীকে আর তার সঙ্গীকে। কিন্তু ধর্মের পূজারী বোধিসত্ত্ব, অনিচ্ছুক জীবহত্যায়, তিনি আশ্রয় নেন একটি পদ্মের সরোবরে। ধৃত হন সেখানে। নিয়ে যায় তাঁকে বারাণসীতে রাজ-হস্তীশালায়। সজ্জিত হন তিনি বহুমূল্য ভূষণে। পরিবেশিত হয় বিভিন্ন সুখাদ্যও। কিন্তু অভুক্তা তাঁর মাতা, তাই স্পর্শ করেন না জলবিন্দুও বোধিসত্ত্ব। বিস্মিত হন নৃপতি। তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁর নিজ আবাসে প্রেরণ করেন।

মাতৃসকাশে ফিরে এসে নিকটবর্তী একটি পুষ্করিণী থেকে শুঁড় দিয়ে জল তুলে মাতৃ অঙ্গে সিঞ্চন করেন। জ্ঞান লাভ করেন মাতা, সন্তানকে চিনতে পারেন। শতমুখে রাজার সুখ্যাতি করেন, তাঁর সততার জন্য।

ক্রমে আবদ্ধ হন রাজা ও বোধিসত্ত্ব এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বে। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নৃপতি, যতদিন বোধিসত্ত্ব জীবিত থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্থাপন করেন সেখানে একটি প্রস্তরে তৈরি হস্তীর প্রতিমূর্তি। প্রতি বৎসরে সমাগত হয় সেখানে যাত্রীরা, নিবেদন করে হস্তীর মূর্তিকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি। ক্রমে মহাপ্রসিদ্ধ হয় এই উৎসবটি, খ্যাতিলাভ করে হস্তী-উৎসব নামে।

তার পরেই, মৎস্য জাতকের কাহিনী দেখি।

বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন কোশল রাজ্যের শ্রাবস্তী নগরের একটি পুষ্করিণীতে। অনাবৃষ্টি হয় দেশে। জলে যায় ক্ষেতের

বুক, শস্যহীন হয় ক্ষেত। শুষ্ক হয় নদী, হয় স্রোতস্বিনী আর পুষ্করিণীও, জলহীন হয়। মৎস্যরা কর্দমের অন্তরালে আশ্রয় নেয়। উপনীত হয় চিল, বায়সও আসে, ভিন্ন হয় কর্দম তাদের চঞ্চুর আঘাতে। নির্গত হয় মৎস্যকুল কর্দমের অন্তরাল থেকে, ভক্ষিত হয় সকলে। করুণায় আর সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয় বোধিসত্ত্বের অন্তঃকরণ। মনস্থ করেন তিনি তাদের প্রাণ রক্ষা করবার। কর্দমের অন্তরাল থেকে নির্গত হয়ে নিযুক্ত হন তিনি কঠোর তপস্যায়। সন্তুষ্ট হন তাঁর তপস্যায় দেবরাজ। বৃষ্টি নামে ধারায়, প্লাবিত হয় নদ-নদী, স্রোতস্বিনী, পুষ্করিণী সেই বৃষ্টির জলে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় সহধর্মীরাও। মৃত্যুর পর, বোধিসত্ব নিজের নির্বাচিত ধামে গমন করেন।

তার পাশেই শ্যামা জাতকের কাহিনী। এক শিকারীর সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন বোধিসত্ত্ব। তাঁর নাম রাখা হয় সুবন্ন শ্যামা। আশ্রমবাসী তাঁর পিতামাতা, অন্ধও, প্রতিফল পূর্বজন্মের এক মহাদুষ্কৃতির। তাই তাঁদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় শ্যামার উপর, দূর হয় তাঁদের অক্ষমতার ব্যথাও শ্যামার যত্নে।

একদিন নদীর গর্ভ থেকে জল নিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় বিষাক্ত শরে বিদ্ধ হয় তাঁর দেহ। তাঁকে হরিণ মনে করে নিক্ষেপ করেন সেই তীর বারাণসীর নৃপতি। মৃত্যুবরণ করেন শ্যামা, তাঁর অন্ধ অসহায় পিতামাতার জন্য বিলাপ করতে করতে। বিগলিত হয় রাজ অন্তঃকরণ, প্রতিজ্ঞা করেন পুত্রাধিক যত্নে তিনি পালন করবেন বোধিসত্ত্বের পিতা-মাতাকে। এমন সময় এক দেবী সেখানে উপনীত হন। তাঁর করস্পর্শে পুনর্জীবিত হন শ্যামা, দূর হয় তাঁর পিতামাতার অন্ধত্বও।

তার পাশেই মহিষ জাতকের কাহিনী। বোধিসত্ব মহিষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাশক্তিশালী তিনি, লঙ্ঘন করেন পাহাড়-পর্বত, শৈলমালাও। একদিন আহার সমাপনে তিনি একটি বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়ান। এক বানর সেই বৃক্ষের শাখা থেকে নেমে এসে তাঁর পিঠের উপর বসে, লেজ দিয়ে তাঁর শিং জড়িয়ে ধরে। তার পর মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। পড়ে বারংবার। ধৈর্য আর দয়ার অবতার বোধিসত্ত্ব, নিষেধ করেন না বানরকে, বলেন না

নিবৃত্ত হতে। দাঁড়িয়ে থাকেন অচল-অটল, ভ্রূক্ষেপ নাই তাঁর বানরের উৎপাতে।

আর এক দিন উপনীত হয় সেখানে অপ একটি মহিষ। বন্য তার প্রকৃতি, নয় সে বোধিসত্ত্ব। বানর ভাবে এসেছে বুঝি তার খেলার সঙ্গী, যার সঙ্গে সে খেলা করেছে দিনের পর দিন। উপবেশন করে তার পৃষ্ঠের উপর, সুরু করে খেলাও। কিন্তু সহ্য করে না দ্বিতীয় মহিষটি বানরের অত্যাচার। তাকে সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করে শিং দিয়ে বিদ্ধ করে তার উদর। পদদলিত করে তার দেহও। বিচূর্ণ হয় তার সর্বাঙ্গ। মৃত্যুবরণ করে বানর, লাভ করে আপন দুষ্কর্মের সমুচিত প্রতিদান।

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে সিংহল অবদানের কাহিনী অঙ্কিত দেখি। দেখি নিমজ্জিত হয় সাগরের অতল জলে একটি অর্ণবপোত। দেখি, যাপন করেন জীবন নৃপতি বিজয় সিংহ ঐশ্বর্যের মধ্যে, কাটে বিলাসে আর ব্যসনে, আনন্দে আর উৎসবে নিমগ্ন হয়ে, সঙ্গে নিয়ে রক্ষকুলরাণী।

মুক্তির চিত্রও দেখি। মুক্তি সেই অতুল ঐশ্বর্যময় জীবন থেকে। এক শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে শূন্য দিয়ে পলায়ন করেন নৃপতি বিজয়। তাঁকে বিলাসের জীবনে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর অনুসরণ করেন রক্ষকুলরাণী, প্রবেশ করেন তিনি সিংহকল্পের অন্তঃপুরে। তার পরেই দেখি, মৃত্যু হয় রাণীর। মৃত্যুবরণ করে একে একে সমস্ত সভাসদবৃন্দ আর পারিষদবর্গ। শুধু রক্ষাপান নৃপতি, অমিত তাঁর সাহস, অপরিসীম শৌর্য, তুলনাহীন প্রত্যুৎপন্নমতি। তিনি জয় করেন সিংহাসন। সবশেষে দেখি, তাঁর বিজয়ের অভিযান। যুদ্ধ করেন নৃপতি দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে। এই দ্বীপেই তাঁর অর্ণবপোত নিমজ্জিত হয়। পরাজিত হয়ে অধিবাসীরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই মহিমময় পরিকল্পনা—আর তার অনবদ্য রূপদান। রং আর তুলির সাহায্যে রচনা করেন অজন্তার চিত্রশিল্পী প্রাচীরের অঙ্গে এক পুরাকাহিনী, করেন হৃদয়ের রমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের অপরিসীম মাধুর্য। অনবদ্য তার প্রতিটি দৃশ্য, জীবন্ত প্রতিটি অংশ। প্রাণবন্ত কেন্দ্রস্থলের হস্তীযূথ, তুলনাহীন গঠনসৌষ্ঠবে। জীবন্ত রাজা রাণী, পারিষদবর্গরাও। তাই অপরূপ—লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন, বিশ্বের চিত্রশিল্পের

দরবারে। সম্ভব হয়েছিল নাকি এমন চিত্র অঙ্কন, শুধু রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপে, সম্ভব করেছিলেন তখনকার সেখানকার ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীরা। নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি শিল্পীকে।

তার পাশেই শিবি জাতকের কাহিনী দেখি। বোধিসত্ত্ব অরিষ্টপুরের রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় শিবি। রাজার নন্দন শিবি, দয়ার অবতার, দান করেন তিনি বহু অর্থ প্রার্থীকে। একদিন বাসনা জাগে তাঁর মনে, দান করবেন এমন বস্তু, যা একেবারে তাঁর নিজস্ব, নিজের দেহের অংশ, হৃদয় অথবা নয়ন। ভিখারীর ছদ্মবেশে, দেবতা শক্র তাঁকে পরীক্ষা করতে সেখানে উপনীত হন। প্রার্থনা করেন প্রথমে একটি নয়ন, শেষে দ্বিতীয়টিও। নিজের হস্তে উৎপাটন করেন শিবি নিজের নেত্র, দান করেন ভিক্ষুককে। অসহনীয় এই দৃশ্য, সহ্য করতে পারেন না উপস্থিত সভাসদবর্গ আর মন্ত্রিগণ, পারেন না মহিলারাও। অশ্রুশিক্ত হয় তাঁদের নয়ন। কিন্তু মমতাহীন দেবতা, তিনি চক্ষু নিয়ে দেবলোকে প্রয়াণ করেন। কিছুদিন পরে, ফিরে এসে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। ফিরে পান নয়ন বোধিসত্ত্ব, জয়ী হন এক অতি নিষ্ঠুর পরীক্ষায়।

তার পাশেই, চিত্র দেখি আরও একটি কাহিনীর—মহাকপি জাতকের। বাস করে কাশীতে এক ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী। একদিন সমাপ্ত হয় হল-কর্ষণ, নিযুক্ত হয় ব্রাহ্মণ অন্য কাজে, মুক্ত করে দিয়ে জোয়াল বলদের স্কন্ধ থেকে।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় ষণ্ড তার অজ্ঞাতসারে, শেষে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে, অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের বলদের কথা মনে পড়ে, অনুসন্ধান করে চতুর্দিক। কিন্তু মেলে না বলদ। পরিশেষে সে প্রবেশ করে অরণ্যে, তার অন্বেষণে। পথ হারিয়ে কাটায় অনাহারে সাত দিন সাত রাত্রি। অবশেষে, সামনে একটি ফলে-ভরতি বৃক্ষ দেখে, সেই বৃক্ষে আরোহণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু দুর্বল দেহ, সাতদিনের অনশনে আর ক্লান্তিতে, স্খলিত হয় তার পদ। পতিত হয় সে বৃক্ষ থেকে, নিমজ্জিত হয় ভূতলে, হয় সংজ্ঞাহীনও। কাটে আরও কয়েকদিন উপবাসে আর অনাহারে।

বোধিসত্ত্ব তখন কপি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন সেই অরণ্যে। উদ্ধার করেন তিনি ঐ ভাগ্যহীনকে। নিদ্রায় অভিভূত হন বোধিসত্ত্ব, তাঁর

মস্তক লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে একটি প্রস্তরখণ্ড সেই ব্রাহ্মণ। জাগরিত হয়ে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষে আরোহণ করেন। সেখান থেকে ব্রাহ্মণকে অরণ্যের বহির্গমনের পথ নির্দেশ করেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে যান গভীর অরণ্যের অন্তরালে। কুষ্ঠ হয় ব্রাহ্মণের, লাভ করে তার মহাপাপের উপযুক্ত প্রতিফল।

মুগ্ধ হই দেখে এইসব জাতকের কাহিনী, শিল্পীর অনুপম গৌরবময় সৃষ্টি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত অনবদ্য দৃশ্য, মহিমোজ্জ্বল, প্রদীপ্ত, নিয়ে যায় কোন এক সুদূর অতীতের কোলে। ভুলে যাই বর্তমান, বিস্মৃত হই ভবিষ্যৎ, লুপ্ত হয় পারিপার্শ্বিকতাও। সম্বিৎ ফিরে আসে গাইডের কথায়, বলে, পাশেই দেখুন বুদ্ধের এক অতিকায় হস্তী দমনের দৃশ্য।

বুদ্ধের পিতৃব্য পুত্র দেবদত্ত। সহ্য করতে পারেন না তিনি বুদ্ধের অসামান্য সফলতা, বিষবৎ তাঁর কর্ণে বুদ্ধের যশোগান, এক সীমাহীন ঈর্ষায় জর্জরিত হয় তাঁর অন্তঃকরণ। বুদ্ধকে হত্যা করবার জন্য তিনি প্রেরণ করেন এক রোষদীপ্ত অতিকায় হস্তী। কিন্তু সক্ষম হয় না হস্তী স্পর্শ করতে বুদ্ধের অঙ্গ, থাকেন তিনি অক্ষত অবস্থায়। বিফল হয় দেবদত্তের প্রচেষ্টা। এর আগেও তিনি তিনবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হয় নাই তাঁর উদ্যম। হয় নাই কোন ক্ষতি বুদ্ধের।

দেখি, রাজকুমারীর প্রসাধনের দৃশ্য। স্বর্ণ-মুকুর হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন রাজকন্যা এক অপরূপ ভঙ্গিতে, দর্শন করেন মুখ দর্পণে। নাই কোন বসন তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গে। শিরে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, কণ্ঠে মণিমুক্তাখচিত হার আর মুক্তার মালা, বিস্তৃত সেই হার তাঁর অনাবৃত যৌবনপুষ্ট, পীনোন্নত বক্ষ পর্যন্ত। তাঁর মণিবন্ধে শোভা পায় চুড় আর মাণিক্যখচিত কঙ্কণ। আবৃত তাঁর কটিদেশ আঁট সূক্ষ্ম পায়জামায়, আবদ্ধ কোমরবন্ধ দিয়ে, বিস্তৃত জানু পর্যন্ত। পরিদৃশ্যমান তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব তার অন্তরাল থেকে। তার উপর শোভা পায় মূল্যবান চন্দ্রহার। নূপুর দিয়ে ভূষিত তাঁর পদযুগল। দাঁড়িয়ে আছেন এক যৌবনমদেমত্তা মদিরাক্ষী, রহস্যময়ী, বিকশিত তাঁর অন্তরের রহস্য তাঁর আননে আর নয়নে, হিল্লোলিত তাঁর সর্বাঙ্গে। নিযুক্তা তিনি প্রসাধনে। তাঁর দুই পাশে দুই কিঙ্করী দাঁড়িয়ে, দক্ষিণে চামর হস্তে, বামে হস্তে নিয়ে প্রসাধনের পাত্র। সজ্জিতা তাঁরাও

বজ্রপাণিরও। শোভন, সুন্দরতম, মহিমময় এই মূর্তিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভাস্কর্যের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, সৃষ্টির এক মহাগৌরবময় যুগের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। মন্দিরের সৃষ্টিকর্তাকে প্রণতি জানিয়ে, ঊনবিংশ গুহামন্দিরে উপনীত হই।

একটি মহাযান চৈত্য এই গুহামন্দিরটি, নির্মিত হয় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। সমসাময়িক অষ্টাদশ ও বিংশতি গুহামন্দিরেরও, বুকে নিয়ে আছে গুপ্ত স্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠতম দান। সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির অজন্তার, সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতেরও, নাই এই চৈত্যের সম্মুখভাগে, পূর্ববর্তী চৈত্যের কাঠের কাজ। ব্যবহৃত হয় প্রস্তর তার পরিবর্তে। বিদায় গ্রহণ করে কাঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যে, অধিকার করে প্রস্তর কাষ্ঠের স্থান।

নির্মাণ করেন অজন্তার মহাযান বৌদ্ধ স্থপতি আরও একটি চৈত্য, নির্মিত হয় ষড়বিংশতি গুহামন্দির, পরবর্তীকালে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর এই চৈত্যটি, সুন্দরতরও। উচ্চতায় আটত্রিশ ফুট ও প্রস্থে বত্রিশ ফুট এই চৈত্যের বহির্ভাগ। বিস্তৃত হয়ে আছে তার অভ্যন্তর ভাগ ছেচল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও চব্বিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে।

দেখি, আছে এই চৈত্যের সম্মুখভাগের কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র প্রবেশপথ, তিনটি নয়; ব্যতিক্রম অন্য বৌদ্ধ চৈত্যের সঙ্গে।

দেখি, এই চৈত্যের সম্মুখভাগে, স্থপতি নির্মাণ করেন আটটি অষ্টকোণ-স্তম্ভের শ্রেণী, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী, পাদদেশে, কুলুঙ্গির ভিতর, দণ্ডায়মান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি। রচিত হয় দ্বিতল সেই স্তম্ভের উপর। প্রবেশপথের সম্মুখে, চারিটি কুষণ-শীর্ষ-স্তম্ভযুক্ত একটি অপরূপ অলিন্দ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। দুই থাকে রচিত ছাদ, ছাদের শীর্ষদেশে, দুইটি বৃত্তাকার গম্বুজ, অঙ্গে সারি সারি চৈত্য গবাক্ষ। শোভা পায় রেল ও চৈত্য গবাক্ষের নীচে। ভূষিত অনুরূপ অলঙ্করণে, চৈত্যের সম্মুখভাগের এক তলায় ছাদের অঙ্গও। প্রবেশ পথের দুই পাশে, দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। দেখি, স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীরের গাত্রে, মূর্তি কত বুদ্ধের, কত বোধিসত্ত্বেরও, দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গীতে। দেখি, সুন্দরতম, অনবদ্য মূর্তিসম্ভারে ভূষিত সম্মুখভাগের সর্বাঙ্গ, মূর্তি বোধিসত্ত্বেরও। প্রবেশপথের শীর্ষদেশে, দ্বিতলের কেন্দ্রস্থলে, রচিত

হয় অনবদ্য, মহামহিমময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি চৈত্য গবাক্ষ, বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ-চৈত্যের, প্রবেশপথ মন্দিরে আলোবাতাসেরও। চৈত্য গবাক্ষের দুই পাশেও দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। দেখি, দ্বিতলের ছাদের শীর্ষদেশে, কার্নিসের অঙ্গে আর চৈত্য গবাক্ষের দুই পাশে ও সারি সারি ক্ষুদ্রতর চৈত্য গবাক্ষ আর মূর্তির সম্ভার। দেখি, মুগ্ধবিস্ময়ে স্থপতির আর ভাস্করের সুন্দরতম সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি। প্রবেশ করি মন্দিরের ভিতরে।

দেখি, পনেরটি এগার ফুট উচ্চ, কুষণ-শীর্ষ, ঘন সন্নিবিষ্ট অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয় মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে, চতুর্দিকের গলিপথ থেকে। যুক্ত হয় তাদের সঙ্গে প্রবেশপথের দুইটি অনুরূপ স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তম্ভগুলির দণ্ড, সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম শিল্পসম্পদ, শীর্ষে বিশাল বন্ধনী। স্তম্ভের বন্ধনীর উপরে, প্রাচীরের গাত্রে, কার্নিসের নীচে, পাঁচ ফুট প্রস্থ পাড়। বেষ্টন করে আছে পাড় সমস্ত কেন্দ্রস্থলটিকে, বিভক্ত হয়ে আছে অনবদ্য খোবে। সবার উপর দাঁড়িয়ে আছে খিলানযুক্ত, অর্ধগোলাকৃতি ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট শিরাকৃতি কড়ি, রচিত জীবন্ত প্রস্তর কেটে, কাঠ দিয়ে নয়।

অপরূপ, সুন্দরতম মূর্তিসম্ভারে অলঙ্কৃত প্রতিটি স্থান, ভূষিত প্রাচীরের গাত্র, পাড়ের অঙ্গ আর স্তম্ভের বন্ধনী। মূর্তি বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের; বসে আছেন তাঁরা অগভীর প্রকোষ্ঠের মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছেন কারুকার্যসমন্বিত চন্দ্রাতপের নীচে, আছেন কুলুঙ্গির ভিতরেও, আছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে। রচিত হয় কত দেবদেবীর মূর্তিও, কেউ উড়ন্ত, কেউ উড্ডীয়মান জন্তুর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। মূর্তি দিয়ে রচিত হয় এক সুন্দরতম পরিবেশ, এক রহস্য লোক, রচনা করেন শ্রেষ্ঠ গুপ্ত ভাস্কর। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

স্তূপের নিকটে উপনীত হই, দেখি দাঁড়িয়ে আছে স্তূপটি কেন্দ্রস্থলের প্রান্তদেশে, বৃত্তাকার অংশের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, একটি অনুচ্চ বেদীর উপর। দাঁড়িয়ে ছিল বেদীর দুই পাশে দুইটি প্রমাণাকৃতি প্রহরীর মূর্তি। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সেই মূর্তি দুইটি কালের করালে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে একেবারে।

বাইশ ফুট উচ্চ এই স্তূপটি রচিত একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে, দাঁড়িয়ে আছে এক মহামহিমময় মূর্তিতে, স্পর্শ করে আছে ছাদের অঙ্গ। অর্ধগোলক এই স্তূপটি, রচিত গম্বুজের আকারে, শীর্ষে নিয়ে আছে হারমিকা, তিনটি

ক্রমশীর্ণায়মান ছত্র ও একটি ক্রমহ্রস্বায়মান পাত্র। বিলীন হয়ে যায় তারা ছাদের অন্ধকারময়, পবিত্র, সুগম্ভীর পরিবেশে। কিন্তু অনাবৃত এই গম্বুজের সম্মুখভাগ, অর্ধাবৃত এলোরোর বিশ্বামিত্রের স্তূপের সম্মুখভাগও। দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে স্তম্ভযুক্ত কুলুঙ্গির ভিতর, সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে ভূষিত, অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রাতপের নীচে, এক মহামহিমময় বুদ্ধ। দাঁড়িয়ে আছেন দেবতা বুদ্ধ, তার প্রতীক নয়। সুরু হয় মূর্তির পূজা, বৌদ্ধ চৈত্যে, সুরু করেন মহাযান সম্প্রদায়, পরিত্যক্ত হয় হীনযান সম্প্রদায়ের স্মৃতির পূজা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গুপ্ত ভাস্করের। বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে নিষ্ক্রান্ত হই মন্দির থেকে।

একে, একে, একবিংশতি, দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি, চতুর্বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি গুহামন্দির দেখি। নির্মাণ করেন এই গুহামন্দিরগুলি চালুক্য রাজারা ৫৫০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, বুকে নিয়ে মহাগৌরবময় সৃষ্টি বৌদ্ধ স্থপতির আর ভাস্করের, প্রতীক এক মহাগৌরবময় যুগের, তার চরম উৎকর্ষের, পূর্ণ পরিণতির। বুকে নিয়ে আছে এই গুহামন্দিরগুলিও সুন্দরতম স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও মূর্তিসম্ভার, মূর্তি কত বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের। মহামহিমময় এই মূর্তিগুলি, জীবন্ত, প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভাস্কর্যেরও।

অভিনব একবিংশতি গুহামন্দিরটি। দেখি, রচিত তার অলিন্দের দুই প্রান্তদেশে, দুইটি ক্ষুদ্রতর উপাসনা মন্দির, দুইটি স্তম্ভ আর দুইটি উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে। সভাগৃহের প্রান্তদেশে, গর্ভগৃহের দক্ষিণে আর বামেও অনুরূপ দুইটি মন্দির, পৃথক হয়ে আছে সভাগৃহের সঙ্গে, দুইটি স্তম্ভ ও দুইটি উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে। অনবদ্য, সুন্দরতম এই উপাসনা মন্দিরগুলি, অপরূপ স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভগুলির অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর তাদের শীর্ষদেশের অলঙ্করণও। স্তম্ভের শীর্ষদেশে, মুক্তার আকারে রচিত হয় পাড়। পাড়ের অঙ্গে, বুদ্ধের জীবনের কত কাহিনী, রচিত মূর্তি দিয়ে। দেখি, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি পাত্র, অঙ্গে পল্লব। সুরু হয় মন্দিরে পাত্র পল্লব স্তম্ভের নির্মাণ এখান থেকেই। সুরু করেন বৌদ্ধস্থপতি। দেখি, বিস্ময়ে মূক হয়ে।

দেখি, অসমাপ্ত চতুর্বিংশতি গুহামন্দির। হ'ত যদি সম্পূর্ণ, লাভ করত পূর্ণরূপ, ভূষিত হ'ত অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে, অলঙ্কৃত হ'ত মূর্তিসম্ভারে,

পরিণত হ'ত ভারতের শ্রেষ্ঠ বিহারে। অসমাপ্ত তৃতীয়, পঞ্চম, চতুর্দশ, সপ্ত, অষ্ট ও উনত্রিংশৎ গুহামন্দিরও। সম্পূর্ণ হয় নাই ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে, পল্লব নরসিংহ বর্মণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের জন্য, পলায়ন করেন অজন্তার স্থপতি আর ভাস্কর, পরিত্যাগ করে যান অজন্তা। অন্যতম বৃহত্তম বিহার অজন্তার, চতুর্বিংশতি গুহামন্দির, বিস্তৃত হয়ে আছে পঁচাত্তর ফুট চৌরস পরিধি নিয়ে, বুকে নিয়ে কুড়িটি অনবদ্য, সুন্দরতম স্তম্ভ। দেখি, এই মন্দিরের অলিন্দে বহু পাত্র-পল্লব স্তম্ভও। উন্নততর সংস্করণ তারা একবিংশতি মন্দিরে নির্মিত পরীক্ষামূলক আদি পাত্র-পল্লব স্তম্ভের।

ক্রমে বাড়ে এই স্তম্ভের প্রচলন মন্দিরে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি মধ্যযুগের স্থাপত্যে। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এই মন্দিরের অঙ্গের অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, অনুপম অলঙ্করণও। দেখি, মহিমময় বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের মূর্তিও। মূর্তি উড়ন্ত দেব-দেবীর, কিন্নরীর আর গন্ধর্বেরও। দেখে বিস্মিত হই, এক মহামহিমময় পরিকল্পনার সুন্দরতম রূপদান। পরম সুন্দরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ষড়বিংশতি গুহামন্দিরে উপনীত হই।

মহাযান সম্প্রদায়ের অজন্তার শেষ চৈত্য এই গুহামন্দিরটিও, চালুক্য রাজারা নির্মাণ করেন ৬০০ থেকে ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। উপনীত হয় এই সময়েই বৌদ্ধস্থাপত্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে শেষ পরিণতি।

দৈর্ঘে আটষট্টি, প্রস্থে ছত্রিশ আর উচ্চতায় একত্রিশ ফুট, এই চৈত্যটি-বুকে নিয়ে আছে ছাব্বিশটি বার ফুট উঁচু ঘন-সন্নিবিষ্ট স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভ, প্রথম গুহামন্দিরের স্তম্ভের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে আছে বুদ্ধের মূর্তি, মূর্তি বোধিসত্ত্বের আর দেব-দেবীরও।

অনুরূপ এই চৈত্যটির অভ্যন্তরভাগ পরিকল্পনায় আর নির্মাণ পদ্ধতিতে, উনবিংশ গুহামন্দিরের অভ্যন্তরভাগের। কিন্তু বিস্তৃততর ও সূক্ষ্মতর এর স্তম্ভের বন্ধনীর অঙ্গের ও তার শীর্ষদেশের পাড়ের অঙ্গের মূর্তিসম্ভার। যুক্ত হয় খোবের (প্যানেলের) ফাঁকে ফাঁকে ও অগভীর কুলুঙ্গি। মূর্তি দিয়ে রচিত হয় তার অঙ্গে, কত কাহিনী, কাহিনী কত বুদ্ধের জীবনের, কাহিনী কত পুরাণেরও। দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে।

প্রান্তদেশে, বৃত্তাকার অংশের কেন্দ্রস্থলে, দাঁড়িয়ে আছে স্তূপ, এক

মহামহিমময় মূর্তিতে, অঙ্গে নিয়ে বিস্তৃত শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা ও ক্রম হ্রস্বায়মান ছত্র। সম্মুখে, অনুপম অলঙ্করণে সমৃদ্ধ, স্তম্ভযুক্ত চন্দ্রাতপের নীচে, সিংহাসনে বসে আছেন মহামহিমময়, দেবতা বুদ্ধ।

কেন্দ্রস্থলের প্রাচীরের গাত্রে, স্তম্ভের অন্তরালে দেখি বুদ্ধের পরিনির্বাণের মূর্তি। দেখি মহানির্বাণে শায়িত দেবতা বুদ্ধ। দুই প্রান্তে অজস্র ফুলে ভরতি বৃক্ষের কেন্দ্রস্থলে শয়ন করে আছেন মহামহিমময় বুদ্ধ, স্থাপিত তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ ভূতলে। বিস্তৃত তাঁর দক্ষিণ পদ বাম পদের উপর। বেষ্টিত হয়ে আছেন তিনি শিষ্যবর্গে। অশ্রুসিক্ত তাদের নয়ন, বিষাদে আচ্ছন্ন তাদের আনন। উর্ধ্বে গন্ধর্বেরা নিযুক্ত সঙ্গীতে। ছড়িয়ে পড়ে সুমধুর সঙ্গীতের লহরী আকাশে বাতাসে, প্রতিধ্বনিত হয় চারিদিক। নিমগ্ন থাকেন বুদ্ধ মহাধ্যানে। শেষে লাভ করেন পরিনির্বাণ, হয় মোক্ষলাভ। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এক সুন্দরতম সৃষ্টি বৌদ্ধ ভাস্করের, এক অমর কীর্তি, নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দিই ডালি উজাড় করে। দেখতে যাই প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার।

দেখি, অঙ্কিত প্রাচীরের গাত্রে বুদ্ধের প্রলোভনের দৃশ্য। অনুরূপ এই দৃশ্যটি প্রথম গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের প্রলোভনের দৃশ্যের, বর্ণ-সুষমায় আর অঙ্কন-শৈলীতে। দেখি মুগ্ধ হয়ে, বিস্ময়ে মূক হয়ে, শ্রদ্ধা অবনত মস্তকে। ভাবি কোথায় পান অজন্তার স্থপতি এমন মহিমময় পরিকল্পনা, কেমন করে দেন তাদের এমন অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম রূপ। কী যন্ত্র দিয়ে কাটেন জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ, নির্মাণ করেন মন্দির তার অন্তরতম প্রদেশে। রচনা করেন প্রাচীর, শোভিত করেন তার গাত্র, কত বুদ্ধ মূর্তি দিয়ে, কোথাও দাঁড়িয়ে, কোথায় বসে, কোথাও বা শুয়ে, পরিনির্বাণ মূর্তিতে কোথাও পদ্মাসনে বসে, হস্তে নিয়ে অভয় মুদ্রা, কোথাও সিংহাসনে হস্তে নিয়ে বরদা মুদ্রা। মূর্তি কত পদ্মপাণি আর বজ্রপাণিরও, বিভিন্ন আর বিচিত্র তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গীও। তাঁদের শিরে শোভা পায় সুউচ্চ বহুমূল্য শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, অঙ্গে মূল্যবান বসন। জীবন্ত তাঁরা, ফুটে ওঠে তাঁদের আননে তাঁদের অন্তরের ভাষা। বেষ্টিত তাঁরা সহচরবর্গে। গড়েন কত গন্ধর্ব, কত বামনের মূর্তি, জীবন্ত তারাও, প্রতিফলিত হয় তাদের চোখে-মুখে তাদের অন্তরের ভাষাও, হিল্লোলিত হয় তাদের সর্বাঙ্গে। মূর্তি

কত হিন্দু দেবতার আর দেবীরও, বিকশিত তাদের নয়ন আর আননও অন্তরের ভাষায়, কত নৃত্যপরায়ণা নর ও নারী, নৃত্য করেন তাঁরা অনবদ্য ছন্দে। কার্নিসের নীচে প্রাচীরের গাত্রে মূর্তি দিয়ে রচিত হয় পাড়, পাড়ের অঙ্গে কত কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর, কাহিনী কত পুরাণেরও।

অলঙ্কৃত করেন সেই মন্দির স্তম্ভ দিয়ে। কি যন্ত্র দিয়ে প্রস্তরের অঙ্গ কেটে রচনা করেন স্তম্ভ? শোভিত করেন তাদের সর্বাঙ্গ, তাদের শীর্ষদেশ আর বন্ধনীর অঙ্গ কত অনুপম, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে, ভূষিত করেন কত অনবদ্য মূর্তিসম্ভারেও। রচনা করেন এক সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক নন্দনকানন মন্দিরে। করেন যুগের পর যুগ, এক মহাগৌরবময় সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি।

সাজান মন্দিরের সম্মুখভাগ আর প্রবেশপথও, অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণে আর নিখুঁত সুষ্ঠু গঠন মূর্তিসম্ভারে ও লতা-পল্লবে। সাজান হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের অপরিসীম মাধুরী। সৃষ্টি করেন এক-একটি অমরাবতী, রহস্যলোক।

কোন্ তুলি দিয়ে আর কি বর্ণ-সুষমায় শোভিত করেন চিত্রশিল্পী, তার প্রাচীরের গাত্র, ছাদের অঙ্গ আর সম্মুখভাগ। অঙ্কিত করেন জাতকের কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব-জীবনের, কাহিনী তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাবলীরও। সঙ্গে নিয়ে কত রাজপ্রাসাদ, কত রাজসভা, কত উদ্যান, কত বন-উপবন। অঙ্কিত করেন কত বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের মূর্তিও। ভূষিত বোধিসত্ত্বেরা বহুমূল্য ভূষণে, বিকশিত তাঁদের নয়নে আর আননে অন্তরের ভাষা। অঙ্কিত হয় কত নৃত্যপরায়ণা রাজনর্তকী—সজ্জিতা বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে, কত পরমা রূপবতী নারী। আনত তাদের শির, রহস্যময় তাদের আনন, তাদের আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে, গ্রীবা-ভঙ্গীতে, তাদের অনাবৃত যৌবন পরিপুষ্ট, পীনোন্নত-বক্ষে, আর হিল্লোলিত অবসন্ন দেহ-বল্লরীতে কামনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

আদর্শবাদী তাঁরা, সুদূরপ্রসারী তাঁদের কল্পনা, বহু বিস্তৃত বিষয়বস্তু, মহাশক্তিশালী অঙ্কন পদ্ধতি আর নিখুঁত বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে হয় এক অপরূপ সমন্বয়, এক সুষ্ঠু সামঞ্জস্য, অজন্তার মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে ও ছাদের

অঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, কল্পনার সঙ্গে সত্যের, সুষমার সঙ্গে ছন্দের আর সুস্পষ্ট কামনার। গৌরবান্বিত হয় অজন্তা, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে, করে চিত্রশিল্পের দরবারেও। হয় বিশ্বজিৎ।

জানাই অসংখ্য প্রণাম অজন্তার স্থপতিকে আর ভাস্করকে, প্রণতি জানাই চিত্রশিল্পীকেও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, হয় নাই ম্লান।

পরিসমাপ্ত হয় অজন্তা দর্শন। দেবদিবাকর যান অস্তাচলে। ম্লান হয়ে আসে তাঁর রশ্মি, মৃদু রক্তিম বর্ণ ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে। ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, সঙ্গীরা ফিরে যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে গিয়ে বসি। দৃষ্টিনিবদ্ধ হয় পশ্চিম দিগন্তে, সম্মুখে সুউচ্চ শৈলমালার শীর্ষদেশে।

ভেসে ওঠে চোখের সামনে এক উজ্জ্বল দৃশ্য। দেখি বহু উর্ধ্বে শূন্য দিয়ে অগ্রসর হয় একটি অপরূপ রথ। সারথি তার দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মা। বেষ্টিত রথের তিনদিক শৈলমালা দিয়ে, বুকে নিয়ে ঘনবনবীথি, শীর্ষে নিয়ে তুষার কিরীট। একদিকে সজ্জিত বিভিন্ন আর বিচিত্র যন্ত্রপাতি—কুঠার, হাতুড়ী, ছেনি, নানা আকৃতির বাটালি ও আরও কত সূক্ষ্মযন্ত্র। রথের শীর্ষদেশে সবুজ পতাকার অঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—মহত্তের পুরস্কার, তার নীচে অজন্তার স্থপতি। ভিতরে উপবেশন করে আছেন স্থপতি আর ভাস্করের দল, হস্তে নিয়ে যন্ত্রপাতি। তাঁদের শিরে শোভা পায় সবুজ শিরোভূষণ, প্রতীক সাফল্যের গৌরবের।

দেখি তার অনুগমন করে অনুরূপ একটি রথ। সারথি তার স্বর্গের চিত্র-শিল্পী। সাতটি বর্ণের—শ্বেত, রক্তিম, গোলাপী, কালো, বেগুনী, পীত ও সবুজ-সংমিশ্রণে রচিত রথের তিনদিকের আবরণ, একদিকে শোভা পায় তুলি, বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের আকার। শীর্ষদেশে রক্তিম ধ্বজার অঙ্গে কালো অক্ষরে লেখা—মহত্ত্বের পুরস্কার, তার নীচে অজন্তার চিত্র-শিল্পী। ভিতরে তুলি হস্তে উপবিষ্ট চিত্র-শিল্পীর দল, শিরে নিয়ে রক্তবর্ণ শিরোভূষণ, প্রতীক বিজয়ের।

মনের পর্দায় ঝঙ্কৃত হয় বিশ্ব-কবির চারিটি ছত্র :

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।"

নবম পরিচ্ছেদ

ঔরঙ্গাবাদ

১। ঔরঙ্গাবাদের চৈত্য ২। ঔরঙ্গাবাদের বিহার

পরের দিন ভোরে উঠে চা ও জলযোগ শেষ করে, আবার আমরা ট্যাক্সি চড়ে রওনা হই। দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয় ঔরঙ্গাবাদ শহরে।

দেখি, মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের তৈরী সম্রাট-পত্নী, সম্রাজ্ঞী রাবিয়া দুরানীর সমাধি মন্দির, সমাপ্ত ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। নির্মিত এই সমাধি-মন্দিরটি সাজাহান বাদশাহ রচিত আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ তাজমহলের অনুকরণে, অন্যতম বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের। তাই পরিচিত নকল তাজমহল নামেও। তার ক্ষুদ্রতর আর নিকৃষ্ট সংস্করণ। প্রবেশপথে অতিকায় সিংহদরজা, নির্মিত মোগল পদ্ধতিতে। সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের বুক চিরে উপনীত হয় পথ, সমাধি-মন্দিরের সোপানশ্রেণীতে। পথের পাশে সরোবর আর বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পসম্ভার। রচিত এই সমাধি-মন্দিরটিও শ্বেত মার্বেল প্রস্তরে, শীর্ষে নিয়ে গম্বুজ, চারি পাশে দ্বার, শোভা পায় চারিটি মিনারও চাতালের চার প্রান্তে। কিন্তু নাই তার অঙ্গে স্থপতির সুন্দরতম অনুপম, শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় তাঁর হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে। নাই প্রেমিকশ্রেষ্ঠ সাজাহানের একনিষ্ঠা। নাই তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তরের বুকে, প্রেমিকের অন্তর বেদনার চিরন্তন প্রকাশ। সকরুণ নয় তার আকাশও এক নিত্য উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসে। তাই লাভ করে নাই শ্রেষ্ঠত্ব, হয় নাই অমর।

দেখি, তাঁর নিজের সমাধি-মন্দিরও। এইখানেই ধরিত্রীর বুকে, প্রখ্যাত মুসলমান ফকির, বুরাহুদ্দিনের সমাধির পাশে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে আছেন ভারতের মহাপরাক্রমশালী, শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীব, শ্রান্তদেহে, ভগ্নহৃদয়ে, অনুশোচনায় জর্জরিত অন্তঃকরণে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চের সকাল। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছেন ঔরঙ্গজীব, আহমদ নগরের শিবিরে, সুদূর প্রবাসে। বহু বৎসরের অমানুষিক

পরিশ্রমের ক্লান্তিতে আর আশাভগ্নে, অবসন্ন তাঁর দেহ আর মন। উচ্চারিত হয় "আল্লা-হ আকবর" তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েন, প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ হন চির নিদ্রায় অভিভূত। নিয়ে আসা হয় তাঁর মরদেহ দৌলতাবাদে, সমাধিস্থ হয় এইখানে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাঁর বিদ্রোহী পুত্রদের কাছে চিঠি লেখেন। আজম্‌কে লেখেন, আমি একাই এসেছি, যাচ্ছিও একা। আমার দেশের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করি নি, করি নি কিছু প্রজার হিতের জন্যও, তাই নাই কোন ভবিষ্যতের আশা, নাই ভরসাও।

কামবক্সকে লেখেন, সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি আমার যত অপকীর্তির বোঝা, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি যা আজও রয়েছে অপূর্ণ, লাভ করে নাই পরিণতি, হয় নি সম্পূর্ণ। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই আমি আমার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম।

অভিভূত হয়ে সমাধি-মন্দির দেখি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি যুগের ইতিহাস। অত্যাচার আর ধ্বংসের কালিমায় কালো হয়ে আছে সেই ইতিহাসের প্রতিটি পাতা। ধ্বংস কত হিন্দু মন্দিরের, কত বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহারের, কত জৈন বস্তির। বুকে নিয়ে ছিল তারা কত স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অন্ধ্র, দ্রাবিড়, সুঙ্গ, গুপ্ত, বাকাটক, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট আর হোয়সল স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের। তাদের বহু শত বৎসরের সাধনার দান। বুকে নিয়েছিল কত অমূল্য সম্পদ। তাই বুঝি এমন দুঃখপূর্ণ, এমন মর্মান্তিক, এমন হৃদয়বিদারক এই মৃত্যু।

সম্বিৎ ফিরে পাই সিংহ মহাশয়ের ডাকে। সমাধিক্ষেত্রে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে মোটরে গিয়ে বসি। শহর অতিক্রম করে ঔরঙ্গাবাদের বৌদ্ধ গুহামন্দিরের সামনে উপনীত হই।

শহরের উত্তরে এক মাইল দূরে এক ফালি উঁচু, ঋজু, পর্বতের অঙ্গে, দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরগুলি, তিন সমষ্টিতে। আছে প্রথম সমষ্টিতে একটি চৈত্য, বৌদ্ধ ধর্ম-মন্দির ও চারিটি বিহার, দ্বিতীয়তে চারিটি বিহার, তৃতীয়তে তিনটি বিহার। নাই কোন চৈত্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমষ্টিতে।

আমরা প্রথমে তৃতীয় সমষ্টির মন্দিরগুলি দেখি। নাই কোন বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরগুলিতে। সমৃদ্ধিশালী নয় তারা স্থপতির শিল্পসম্ভারে, নয় ভাস্করের

মূর্তি-সম্ভারেও। খুব সম্ভব নির্মিত হয় এই মন্দিরগুলি, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অস্তমিত হতে থাকে যখন বৌদ্ধ স্থাপত্য, নিষ্প্রভ হয় বৌদ্ধ স্থপতির স্থাপত্য জ্ঞান।

দেখতে সুরু করি, প্রথম সমষ্টির মন্দিরগুলি। প্রথমে চতুর্থ গুহামন্দির দেখি। ক্ষুদ্রতর এই চৈত্যটি দাঁড়িয়ে আছে অর্ধ ভগ্ন অবস্থায়, চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও বত্রিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। দেখি অনুরূপ কার্লির চৈত্যের, এই চৈত্যের অভ্যন্তর ভাগ। রচিত হয় অর্ধ গোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদও কার্লির চৈত্যের অনুকরণে। দেখি বৃত্তাংশে গর্ভগৃহে অর্ধ গোলাকৃতি স্তূপও অনুরূপ কার্লির চৈত্যের, নাই তার অঙ্গে কোন বৌদ্ধ মূর্তি। বৌদ্ধ মূর্তি নাই প্রাচীরের গাত্রেও। দেখি, শোভিত সম্মুখ ভাগের প্রাচীরের গাত্র আর কেন্দ্রস্থলের চতুদিক অপরূপ তোরণ দিয়ে। তাই মনে হয়, নির্মিত এই চৈত্যটি হীনযান বৌদ্ধ যুগে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে।

তৃতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম, সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতম গুহামন্দির ঔরঙ্গাবাদের, নির্মিত হয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, গুপ্ত যুগে। মহা সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে এই বিহারটি, স্তম্ভের অঙ্গের শিল্পসম্ভারে ও শীর্ষদেশের মূর্তিসম্পদে। শোভিত হয়ে আছে তার প্রাচীরের গাত্রও, অনবদ্য, সুন্দরতম, মহিমময় মূর্তিসম্ভারে, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুপ্ত যুগের স্থপতির আর ভাস্করের।

একটি সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ অতিক্রম করে, আমরা মন্দিরের ভিতরে, কেন্দ্রস্থলের সভাগৃহে উপনীত হই। দেখি, বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ, নির্মিত হয়েছে তার চারিপাশে প্রকোষ্ঠ, বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। শোভিত স্তম্ভদণ্ড, সুন্দরতম, সুষ্ঠু গঠন মূর্তি দিয়ে, মূর্তি বুদ্ধের, মূর্তি বোধিসত্ত্বের, মূর্তি কত দেবদেবীরও—অলঙ্কৃত লতা-পল্লবেও। শোভা পায় স্তম্ভের শীর্ষদেশে অনুপম বন্ধনী, বন্ধনীর অঙ্গে সুন্দরতম মূর্তি। বন্ধনীর শীর্ষদেশে রচিত হয় পাত্র, পাত্রের ভিতরে পল্লবগুচ্ছ। পরিচিত এই স্তম্ভগুলি "পাত্র-পল্লব প্রতীক" স্তম্ভ নামে, অন্যতম সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ বৌদ্ধ স্থপতির। দেখেছি অলিন্দের বুকেও অনুরূপ স্তম্ভ, অনুরূপ গঠনে, অঙ্গের শিল্পসম্পদে আর শীর্ষদেশের মূর্তিসম্ভারে। দেখি সুবিশাল, মহামহিমময়

মূর্তি দিয়ে শোভিত সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্র, মূর্তি বুদ্ধের, মূর্তি বোধিসত্ত্বের, মূর্তি অতিকায় দেবদেবীরও, বসে আছেন তাঁরা কত বিভিন্ন ভঙ্গিতে, ভূষিত হয়ে আছেন কত বিচিত্র বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে, কত জড়োয়ার অলঙ্কারে। অনবদ্য এই মূর্তিগুলির সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

বিহারের প্রত্যন্ত দেশে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই গর্ভগৃহের মূর্তির সম্ভার দেখে। দেখি, সিংহাসনে বসে আছেন এক সুবিশাল বুদ্ধ, বসে আছেন মহামহিমময় মূর্তিতে, অপরূপ, সুষ্ঠু গঠন এই মূর্তিটি, একেবারে জীবন্ত। তাঁর সামনে মুখোমুখি হয়ে দুই দল প্রমাণ আকৃতির পূজারী, আছেন, তাঁরা জানুগতিতে। আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ, কয়েকটি রূপবতী নারীও আছেন। তাঁদের কারও হস্তে মাল্য, কেউ হস্তে ধরে আছেন পূজার উপচার, কেউ আছেন কৃতাঞ্জলিপুটে। সজ্জিত তাঁরাও বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে। তাঁদের শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, কর্ণে হীরক কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে মণিমুক্তা-খচিত বাজুবন্ধ, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণ। তাঁরা ভক্তিভরে, অবনত মস্তকে দেবতাকে পূজা করেন। প্রতিফলিত হয় তাঁদের চোখেমুখে, তাঁদের অন্তর-নিহিত অপরিসীম প্রগাঢ় ভক্তির উচ্ছ্বাস—তাঁদের অন্তরের ভাষা। প্রদীপ্ত হয় তাঁদের আনন, উদ্ভাসিত হয় নয়ন, বিকশিত হয় সর্বাঙ্গ ভক্তির পুলকে। অপরূপ এই মূর্তিসম্ভার, অনবদ্য, সুন্দরতম, মহামহিমময়, জীবন্ত। প্রাণময় তাদের প্রতিটি অঙ্গ, ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে, বাঙ্ময়, তাঁর হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্যে, আর মনের অপরিসীম মাধুরীতে। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মূর্তিসম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ মহাযান ভাস্করের, সর্ব ভারতের ভাস্করেরও। প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির। তাই সৌভাগ্যশালী হয় ভারত, বিশ্বের ভাস্করের দরবারে, শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি, যুগাবতার, মহামানব বুদ্ধকে। জানাই গুপ্ত রাজাদের, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা ভারতের। জানাই ভাস্করকেও। অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়।

দ্বিতীয় গুহামন্দির দেখি। অনুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের এই মন্দিরটি, সমসাময়িকও। এই বিহারটিও গুপ্তরাজারাই নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটিও সুন্দর স্তম্ভ ও মূর্তিসম্ভার, কিন্তু সুন্দরতম নয় তারা তৃতীয় গুহামন্দিরের স্তম্ভ আর মূর্তিসম্ভারের মত। নয় তেমন সমৃদ্ধিশালীও, ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে।

প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হই। অনুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের পরিকল্পনায় আর নির্মাণকুশলতায়, সমসাময়িকও। নির্মাণ করেন এই গুহামন্দিরটিও গুপ্তরাজারা। দেখি সুন্দরতর এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ। স্তম্ভের দণ্ডে শোভা পায় মূর্তিসম্ভার, শোভা পায় লতা-পল্লবও। শীর্ষদেশে রচিত হয় মূর্তি দিয়ে বন্ধনী, অনুরূপ বাতাপির (বাদামির) স্তম্ভের শীর্ষদেশের সুন্দরতম বন্ধনীর। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার, দেখি মূর্তিসম্ভারও। দেখি অলঙ্কৃত সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রও, সুবিশাল, মহিমময় মূর্তি দিয়ে, মূর্ত বুদ্ধের, মূর্তি বোধিসত্ত্বের, মূর্তি বিশালকায় দেবদেবীরও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

দেখি, একে একে পঞ্চম আর ষষ্ঠ গুহামন্দির। নির্মিত হয় এই বিহার-গুলিও ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীতে, গুপ্ত রাজারাই নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারগুলিও সুন্দরতম অনবদ্য স্তম্ভ আর বৃহৎ মহিমময় মূর্তিসম্ভার।

সব শেষে সপ্তম গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ঔরঙ্গাবাদের, সমসাময়িক এই মন্দিরটি তৃতীয় গুহামন্দিরের। পড়ে সমপর্যায়েও, স্তম্ভের শ্রেষ্ঠত্বে আর প্রাচীরের গাত্রের মূর্তসম্ভারের মহামহিমময়ত্বে। এই বিহারটিও গুপ্তরাজারা নির্মাণ করেন। দেখি রচিত হয় সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে প্রকোষ্ঠ, বেষ্টিত নয় সভাগৃহ প্রকোষ্ঠ দিয়ে। দেখি রচিত প্রকোষ্ঠের চারিপাশে প্রদক্ষিণের পথও। ব্যতিক্রম বৌদ্ধ বিহারের, পূর্বাভাষ এলোরার পরবর্তী কালের হিন্দু গুহামন্দির রামেশ্বরমের।

দেখি মুগ্ধ হয়ে এই বিহারের স্তম্ভগুলির অঙ্গের অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্পদ। দেখি তাদের শীর্ষদেশের আর বন্ধনীর অঙ্গের মহামহিমময় মূর্তিসম্ভার অনুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের স্তম্ভের। দেখি ঘুরে ঘুরে সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রের

বৃহৎ মূর্তিসম্ভারও। মহা-সমৃদ্ধিশালী তারা ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে তাঁর হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্যে আর অন্তহীন মাধুরীতে। তাই অনবদ্য, সুন্দরতম, মহামহিমময়, প্রতীক তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, শ্রেষ্ঠ কীর্তির, এক মহাগৌরবময় যুগের।

বপন করেন যে বীজ গুপ্তযুগের বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্কর নাসিকে আর কানেরিতে, পরিণত হয় সেই বীজ মহামহীরুহে, অজন্তাতে আর ঔরঙ্গাবাদে। সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে তাদের স্তম্ভে, করে তাদের মূর্তিসম্ভারেও। লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ।

স্থপতিকে আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধর্মশালায় ফিরে আসি। আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে ঔরঙ্গাবাদের মন্দিরের স্মৃতি, মনের মণিকোঠায়।

দশম পরিচ্ছেদ

এলোরা

১। বিশ্বকর্মা চৈত্য ২। দোতলা বিহার
৩। কৈলাস শৈব মন্দির ৪। দশাবতার বিষ্ণু মন্দির
৫। রামেশ্বরম্ শৈব মন্দির ৬। ইন্দ্রসভা জৈন মন্দির

তার পরের দিন ভোরে উঠে আগের দিনের মত প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ট্যাক্সির পিছনে বেঁধে নিয়ে এলোরা অভিমুখে রওনা হই।

এক ট্যাক্সিতে আমি ও আমার স্ত্রী, সকন্যা মিসেস হাজরা আর সিংহ সাহেব উঠি। দ্বিতীয়টিতে সপরিবারে কেদার, আমার কন্যা, আর চাকরটি। এক সঙ্গেই ট্যাক্সি ছাড়ে। আমরা আগে যাই। আমাদের অনুগমন করে কেদাররা।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় না পিছনের গাড়ীর চিহ্ন, হয়ে যায় অদৃশ্য। মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমাদের ট্যাক্সি দৌলতাবাদের দুর্গের সামনে এসে থামে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে দ্বিতীয় গাড়ীর অপেক্ষায় থাকি। অর্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয় কিন্তু দর্শন মেলে না দ্বিতীয় ট্যাক্সির। সম্ভব নয় এত অধিক সময় লাগা সাত মাইল অতিক্রম করতে। নিশ্চয়ই বিকল হয়েছে যন্ত্র, অচল হয়েছে গাড়ী। অথবা কোন আকস্মিক বিপদ হয়েছে। এক মহা আতঙ্কে কণ্টকিত হয় সর্বাঙ্গ। আছে সেই গাড়ীতে ছেলেমেয়েরা, কেদার আর হাজরা।

সিংহ সাহেব আমাদের গাড়ী নিয়ে যান। অতিবাহিত হয়ে যায় আরও আধ ঘণ্টা। এক সীমাহীন আতঙ্কে আর উৎকণ্ঠায় ছেয়ে ফেলে আমাদের অন্তকরণ, দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তাদের আসবার পথের পানে। হঠাৎ দিকচক্রবাল থেকে ভেসে ওঠে দুখানি গাড়ী, শেষে উপনীত হয় দুর্গের সামনে। ফেলি স্বস্তির নিশ্বাস। শুনি, সত্যই যন্ত্র বিকল হয়ে বাহন অচল হয়েছিল। কিন্তু ব্যাধি সামান্যই, তাই বিলম্ব হয় নাই নিরাময় হতে। ড্রাইভার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তারও ভরসা দেয়।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক মহিমময়, সু-উচ্চ গিরিশ্রেণী। সমস্ত পর্বত আর তার শীর্ষদেশ অলঙ্কৃত করে আছে একটি সুবিশাল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এই সেই দেবগিরির সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ। এই দুর্গই ছিল একদিন শত্রুর অনতিক্রমনীয়, ছিল দুর্ভেদ্যও। রাজত্ব করতে: এখানে দেবগিরির যাদব নৃপতিরা। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব-পুরুষ যদুর বংশধর তাঁরা, অবতীর্ণ হন দাক্ষিণাত্যের রঙ্গমঞ্চে, রাষ্ট্রকূট আর পরবর্তী চালুক্যরাজাদের অধীনে—সামন্ত রাজারূপে। দ্বাদশ শতাব্দীতে, কল্যাণের চালুক্যরাজাদের পতন হলে ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিল্লম দেবগিরিতে স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য। সিংঘন শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের পরাজিত করেন চোলদের। বিস্তৃত হয় যাদব রাজ্যের সীমানা, উত্তরে নর্মদা থেকে দক্ষিণে ক্ষণপ্রভা পর্যন্ত। পারদর্শী সঙ্গীতশাস্ত্রেও। তিনি ভাষ্য রচনা করেন তাঁর মন্ত্রী সারঙ্গধর প্রণীত সঙ্গীত গ্রন্থের। রাজত্ব করেন একে একে তাঁর দুই পৌত্র কৃষ্ণ আর মহাদেব। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্র অধিরোহন করেন দেবগিরির সিংহাসনে। বিদ্যোৎসাহী তিনি, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা চতুর্বর্গ চিন্তামণি প্রণেতা হেমাদ্রি, করেন মনীষী বোপদেব আর জ্ঞানেশ্বরও।

১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন। লুণ্ঠিত হয় দেবগিরি। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁব সেনাপতি মালিক কাফুর দ্বিতীয় বার দেবগিরি আক্রমণ করেন। পরাজিত হন রামচন্দ্র, নিহত হন তাঁর পুত্র, নিহত হন তাঁর জামাতা হরপালও ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে। দেবগিরি আসে দিল্লীর সম্রাট মুসলমান আলাউদ্দিনের অধিকারে। অবসান হয় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রের প্রভুত্ব, সুপ্ত থাকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

আলাউদ্দীনের হাতে পরাজিত হয়ে এই দেবগিরিতেই রামচন্দ্রের কাছে আশ্রয় নেন গুজরাটের রাজা বাঘেলা, রাজপুতবংশের দ্বিতীয় রায় কর্ণদেব, সঙ্গে নিয়ে পরম রূপবতী কন্যা দেবলাদেবী। হৃতা হন তাঁর পত্নী কমলাদেবী, পরিণতা হন সম্রাটের অন্যতমা প্রিয়তমা মহিষীতে। রাজা রামচন্দ্রের পরাজয়ের পর ধৃতা হন দেবলাদেবীও। বিবাহ হয় তাঁর সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, খিজির খানের সঙ্গে।

খিলজীর পতন হলে দেবগিরি তুঘলকদের অধিকারে আসে। ১৩২৭

খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুঘলক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পরিচিত হয় দেবগিরি দৌলতাবাদ নামে, অন্তর্হিত হয় ইতিহাসের পাতার অন্তরালে। নির্মিত হয় রাজপ্রাসাদ আর সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী। রচিত হয় কত উদ্যান শোভিত পত্র-পুষ্পে। পরিণত হয় দৌলতাবাদ এক বৃহৎ নয়নাভিরাম নগরে। নির্মিত হয় দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত সাত শত মাইল দীর্ঘ একটি প্রশস্ত রাজপথও। কিন্তু সম্ভব হয় না দিল্লীবাসীর সহজ আগমন। পথে মৃত্যুবরণ করে বহু দিল্লীবাসী। যারা এসে পৌছায় অক্ষত থাকে না তারাও। তাই ফিরে যেতে হয় সম্রাটকে দিল্লীতে। দৌলতাবাদে নিযুক্ত হন রাজ্যপাল।

পতন হয় দিল্লীর সুলতান, তুঘলকদের, দৌলতাবাদ বাহমনী রাজ্যের অধীনে আসে। ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদ আহম্মদ নগরের মালিক আহম্মদ বাবির অধিকারে আসে। তিনি ছিলেন গোদাবরীর উত্তরের পথ্রির হিন্দু নায়কের পুত্র, যোগ দেন মহম্মদ গাওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে। নিযুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী, মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর, হন জুনারের শাসনকর্তা। শেষে হন স্বাধীন নৃপতি। স্থাপিত হয় রাজধানী আহম্মদনগরে, নিজের নামানুসারে। এই দৌলতাবাদেই, ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনীরা নির্মাণ করেন একটি অপরূপ মিনার, পরিচিত চাঁদমিনার' নামে।

১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট সাজাহান সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে অধিকার করেন এই অনতিক্রমণীয় দুর্গ আহম্মদনগরের হাত থেকে। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগরও মুঘলের অধিকারে আসে। বন্দী হন রাজা হুসেন সাহ গোয়ালিয়রের দুর্গে। পরিসমাপ্তি হয় আহম্মদনগরে নিজামশাহী বংশের রাজত্বের।

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই দৌলতাবাদ থেকেই পরিচালিত হয় মুঘলের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের অভিযান। খান্দেশ, বেরার আর তেলিঙ্গানা একে একে তাঁদের অধিকারে আসে। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক ঔরঙ্গজীব নিযুক্ত হন দাক্ষিণাত্যের রাজ্যপাল। আবার সম্রাট হয়ে এই দৌলতাবাদের নিকটে অবস্থিত ঔরঙ্গাবাদে শিবির স্থাপন করেন ঔরঙ্গজীব ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এখান থেকেই একে একে জয় করেন গোলকুণ্ডা আর বিজাপুর। কিন্তু সম্পূর্ণ দমন

করতে পারেন না মহারাষ্ট্রদের। এই দুর্গেই, গোলকুণ্ডার সুলতান আবুল হাসানকে কাটাতে হয় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি। এইখানে বসেই, ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হয় মুঘল সাম্রাজ্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, বিস্তৃত হয় তার সীমানা কাবুল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত, কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত। কিন্তু সুখ নাই সম্রাটের মনে, নাই শান্তিও। বিদ্রোহী সেনাপতিরা, বিদ্রোহী নিজের পুত্রেরাও। বিজয়ের অভিযানের চাহিদা মেটাতে শূন্য রাজকোষ। বাংলার দেওয়ান, মুর্সিদকুলিখানের প্রেরিত অর্থের আগমনের প্রতীক্ষায় কাটাতে হয় দিন। তাতেই নির্বাহ হয় সংসারের খরচ। শেষে ৩রা মার্চ, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাপিত হয় তাঁর জীবন-প্রদীপ। আহম্মদনগরের শিবিরে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিশ্বাস। সমাধিস্থ হয় তাঁর মৃতদেহ, ঔরঙ্গাবাদে, প্রসিদ্ধ মুসলমান, সাধু বারুদ্দিনের সমাধির পাশে।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ মহারাষ্ট্রের অধিকারে আসে। অধিকারে আসে পেশোয়ার। অধিকার করেন তাঁর ভ্রাতা সদাশিবরাও।

মহারাষ্ট্রের পতন হ'লে, হায়দ্রাবাদের নিজামের অধিকারে আসে। স্থাপিত হয় ঔরঙ্গাবাদে তাদের দ্বিতীয় রাজধানী। অনুচ্চ শৈলশ্রেণীতে বেষ্টিত হয়ে আছে ঔরঙ্গাবাদ, প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, এক লীলা নিকেতনে।

পুত্র কন্যাদের কেদার আর সিংহ মহাশয়ের জিম্মায় রেখে আমরা আর সকলে সিংহদ্বার অতিক্রম করে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করি। বামে এক সুবিশাল জলশূন্য জলাশয় বেষ্টিত সু-উচ্চ পাড় ও সোপানের শ্রেণী দিয়ে। তার পাড়ে ভারতমাতার মন্দির, নির্মিত পরবর্তীকালে। দক্ষিণে সুপ্রশস্ত চত্বরে, উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মিনার, খুব সম্ভব চাঁদমিনার। নির্মাণ করেন এই সুন্দর মিনারটি বাহমনী রাজারা ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, বুকে নিয়ে ভারতীয়, তুর্কী, মিশরীয় আর পারস্যের প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন তাদের অনবদ্য, সুসামঞ্জস্য, সুন্দরতম সংমিশ্রণ, দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ভারতমাতার মন্দির দেখে, আমরা উঠতে থাকি দুর্গের শীর্ষদেশে। ঋজু আর উঁচু এই সোপানের শ্রেণী, সঙ্কীর্ণ, অসংস্কৃতও, কখন সোজা, কখনও সর্পিল গতিতে উঠেছে। তাই কষ্টসাধ্য এই আরোহণ, বিপদসঙ্কুলও, উঠতে হয় সাবধানে পদক্ষেপ করে, মন্থর গতিতে।

কিছুদূর উঠবার পর একটি চলমান সেতুর (ড্র ব্রিজ) নিকটে উপনীত হই। সেতু অতিক্রম করে একটি চত্বরে উপস্থিত হই। দাঁড়িয়ে আছে এই চত্বরে একটি লৌহ কামান, অঙ্গে নিয়ে ছাগমুণ্ড, তাই পরিচিত "র‍্যাম্‌স হেড" নামে।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে অতিক্রম করি একে একে কত অলিন্দ, কত কক্ষ, অঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন, উপনীত হই একটি সুড়ঙ্গের সামনে। আরোহণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হাজরা ও মিসেস বসু—অক্ষম অগ্রসর হতে, এইখানে বসে পড়েন।

ঘন তিমিরাবৃত সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে আমরা তিনজন একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে একটি উন্মুক্ত বাতায়নের পাশে এসে দাঁড়াই। গাইড বলে এইটিই "ভুলভুলিয়া", এখানে ভুলিয়ে নিয়ে আসা হত অবাঞ্ছিত নর-নারীদের। নিক্ষিপ্ত হত তারা এই বাতায়ন থেকে দুর্গের বাইরে, গড়িয়ে পড়ত সহস্র ফুট নীচু পর্বতকন্দরে, বিচূর্ণ হত তাদের দেহ, হত জীবনাস্ত। দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বহিঃ পানে। দেখি পর্বতের অঙ্গে গভীর শ্যাম অরণ্য, বুকে নিয়ে ঘন বনবীথি আর লতাগুল্ম, স্পর্শ করে সেই অরণ্য শৈলমালার পাদদেশ। পদতলে পরিখার বক্ষে প্রবাহিতা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। বিপরীত দিকে দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত। দেখা যায়, কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে প্রান্তরে। দেখি স্তব্ধ বিস্ময়ে মূক হয়ে প্রকৃতির এই উদ্দাম অপরূপ রূপ। সম্বিৎ ফিরে পাই গাইডের ডাকে। বলে, একেবারে শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছে যাদব রাজাদের নির্মিত দেবালয়, সেই মন্দিরে বিরাজ করেন বিষ্ণুর পাদপদ্ম। সাহসে বুক ভরে নিয়ে গাইডের অনুগমন করি। করেন লীলা হাজরাও, ধীরে ধীরে অতিক্রমণ করেন সোপানের শ্রেণী। সক্ষম হন না আমার স্ত্রী, সাফল্যমণ্ডিত হয় শুধু আমাদের দুজনের স্বর্গারোহণের প্রচেষ্টা। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রকোষ্ঠ, নাই তাতে কোন গবাক্ষ, রুদ্ধ তার প্রবেশ দ্বারও। গাইড বলে, এই গৃহেই মুসলমান রাজারা বারুদ রাখতেন, ছিল এই দুর্গের বারুদের গুদাম। পাঁচ বৎসর পূর্বে ঐ কক্ষ থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে সহস্র বৎসর পূর্বের তৈরী বহু শত মণ বারুদ, দগ্ধিভূত হয়েছে সেই বারুদ, পরিণত হয়েছে ভস্মে।

ধীরে ধীরে নেমে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি যাঁরা মাঝ রাস্তায় বসে থাকেন। বঞ্চিত যাঁরা স্বর্গারোহণের সৌভাগ্য থেকে।

দেখি চা প্রস্তুত, সামনের দোকানের বৃহৎ পপিতা তিনটি আর কমলালেবুগুলিও নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে আমাদের গাড়ির ভিতরে।

সমস্বরে, কলকণ্ঠে আমাদের বিজয় অভিযানের সম্বর্ধনা শেষ হলে চা পান করে আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি বিদ্যুৎ-গতিতে এলোরা অভিমুখে ছুটে। পিপল ঘাটের দু পাশের সুবিশাল পিপল বৃক্ষের ভিতর দিয়ে মাইল নয়েক রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি এলোরায় কৈলাসের মন্দিরের সামনে এসে থামে। শৈলমালার অঙ্গবেয়ে নৃত্য-চপল গতিতে নেমে আসে একটি নির্ঝর, সেই নির্ঝরের জলে সৃষ্টি হয় একটি কুণ্ড। সেই কুণ্ডের পাশে জিনিসপত্র নামিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসি। বার করা হয় খাবার, মাংস আর পরোটা সাজান হয় ডিসে, হয় জলে ভরতি দুইটি সোরাই, ডজনখানেক কলা আর কয়েকটি কমলালেবুও। কুণ্ডের জলে একে একে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে সকলে আহারে নিযুক্ত হই। আহার সমাপ্তে জিনিসপত্র গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়ে আমরা ষোড়শ গুহামন্দির কৈলাস দেখতে অগ্রসর হই। পরিচিত শিবের স্বর্গ নামেও। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি রাষ্ট্রকুট শ্রেষ্ঠ প্রথম কৃষ্ণ, ৭৫৭ থেকে ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। উপনীত হন এই সময়ে রাষ্ট্রকুট নৃপতিরা, উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, হন মহাসমৃদ্ধিশালীও।

আর্য ভারতের সৃষ্টি থেকেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম। পূজিত হন দেবদেবী। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। প্রধান ইন্দ্র, বরুণ, সবিতা, মারুত আর অগ্নি। পূজিতা হন শক্তিও—কালী, তারা আর দুর্গা। পূজিতা হন তাঁরা গৃহকোণে, হন মন্দিরেও, হিন্দুরা জন্মান্তর মানে। মানে আত্মার অবিনশ্বরতা আর দেহের মরণশীলতা। বার বার জন্ম নেয় আত্মা। মৃত্যু হয় দেহের, হয় না আত্মার—সহস্র কোটি জন্মের ভিতর দিয়ে লীন হয় পরম ব্রহ্মে—অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম।

অনার্যেরা পূজা করে ভূত, দানব আর নাগ অথবা সর্পকে।

জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব কপিলাবাস্তু নগরে, নৃপতি শুদ্ধোধনের ঔরসে মহারাণী মায়ার গর্ভে। তাঁর নাম রাখা হয় গৌতম। লালিত হন তিনি

ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে, বিলাসে ও ব্যসনে। ষোল বৎসর বয়সে পরম রূপবতী যশোধারার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জন্মায় এক রূপবান পুত্রও। নাম তার রাহুল।

একদিন প্রাসাদের বাইরে ভ্রমণে গিয়ে, তিনি রোগ, জরা ও মৃত্যুকে দেখেন। মিথ্যা মনে হয় রাজসুখ। সুখ পান না অতুল ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে জীবন যাপনে। এর আগেও তিনি এক এক কল্পে ত্রয়োবিংশবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ হবেন বলে। কিন্তু জন্মেছিলেন বোধিসত্ত্ব হয়ে। হতে পারেন নাই বুদ্ধ। মন প্রস্তুত ছিল। একদিন তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান। পরিত্যাগ করে যান স্নেহময় পিতামাতা, ফেলে রেখে যান পিয়তমা পত্নী আর প্রাণাধিক পুত্র রাহুলকেও। পরিত্যাগ করে যান ভবিষ্যৎ সিংহাসনের মোহ। তখন তাঁর উনত্রিশ বৎসর বয়স। বহু স্থানে ভ্রমণ করে গয়াতে উপনীত হন। নিমগ্ন হন ধ্যানে এক বটবৃক্ষের নীচে। নিযুক্ত থাকেন কঠোর তপস্যায় দীর্ঘ ষষ্ঠ বৎসর। লাভ করেন জ্ঞানের আলোক। হন পরম জ্ঞানী, হন তথাগত, হন বুদ্ধ। অবগত হন নির্বাণ লাভের উপায়, পথ মোক্ষলাভের—জন্মান্তরের কষ্ট বিদূরিত হবারও।

আসন ত্যাগ করে তিনি মুক্তির বাণী প্রচার করতে সুরু করেন। বলেন, নাই মুক্তি আনন্দে, উপভোগে, মুক্তি নাই কঠোর তপস্যাতেও। তিনি প্রচার করেন জগতবাসীর কাছে তাঁর মুক্তির বাণী—সে বাণী অহিংসার আর সাম্যের, শান্তির বাণীও। সৎ পথে থেকে, সৎ কার্যের ভিতর দিয়ে নির্বাণ লাভ করবার বাণী।

শোনে নাই এমন বাণী পূর্বে কেউ। বলে নাই আগে কেউ—কি করলে বিদূরিত হবে জন্মান্তরের দুঃখ, এক জন্মেই মোক্ষলাভ হবে। দলে দলে তাঁর শিষ্য হয়। শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কত রাজা, কত সম্রাট।

বুদ্ধ প্রচার করেন তাঁর বাণী, নগরে নগরে, একাদিক্রমে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তার পর আশী বৎসর বয়সে কুশী নগরে লাভ করেন মহানির্বাণ। তিরোহিত হন এক মহামানব—এক যুগাবতার।

অতিবাহিত হয় দীর্ঘ দ্বিশত বৎসর, বৌদ্ধধর্ম আবদ্ধ থাকে গঙ্গার উপত্যকায়—নালন্দায়, রাজগৃহে আর সারনাথে। বিস্তার লাভ করতে

পারে না আর্য ভারতে, প্রবলতম হিন্দু ধর্মের প্রতিযোগিতায়, তার বিরুদ্ধতায়। আসে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৭ অব্দ, মৌর্য সম্রাট অশোক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা হিন্দুকুশ থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধধর্ম, হয় ভারত সম্রাট অশোকের ধর্মে। প্রচারিত হয় বৌদ্ধধর্ম। প্রবেশ করে মহীশূর পর্যন্ত। প্রেরিত হন তাঁর পুত্র মহেন্দ্র আর কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে। প্রচারক যায় কাশ্মীরে, গান্ধারে, ব্রহ্মদেশে, যায় তিব্বতেও। পৃথিবীর প্রধান ধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধধর্ম।

লেখা হয় বুদ্ধের বাণী—বাণী অহিংসার আর সাম্যের, বাণী শান্তিরও, শৈলমালার অঙ্গে, লিখিত হয় প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের বুকেও। নির্মিত হয় সারা ভারতবর্ষে কত বৌদ্ধ স্তূপ, কত চৈত্য আর সঙ্ঘারাম বা বিহার। কত প্রস্তর নির্মিত রেলে শোভিত হয় স্তূপ, চৈত্য আর বিহারের অঙ্গ। গড়ে ওঠে বৌদ্ধ স্থাপত্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। সুন্দরতম মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য তাদের রূপদান। সাজান তাদের অঙ্গ বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্কর, কত বিভিন্ন অলঙ্করণে, কত অনবদ্য, অপরূপ সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে আর জীবিত মূর্তিসম্ভারে। শোভিত করেন যুগের পর যুগ। রচনা করেন কত গৌরবময় সৃষ্টি, কত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। আজও তার নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে সাঁচী, ভারহুত, নাসিক, আর কার্লি। আছে এলোরা আর অজন্তা। অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

বৌদ্ধ স্থপতিই প্রথমে জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে গুহামন্দির নির্মাণ সুরু করেন। নির্মিত হয় চৈত্য আর বিহার। সাজান তাদের অঙ্গ অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে, শোভন গঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভারেও। তাঁরাই আদি, তাঁরাই অগ্রণী। দানও তাঁদের অপর্যাপ্ত। এক পশ্চিম ভারতে, পশ্চিম ঘাটের শৈলমালার অঙ্গ কেটে, রেখে যান তাঁদের অক্ষয় কীর্তির নিদর্শন প্রায় পঞ্চাশটি স্থানে। নির্মাণ করেন সহস্র গুহামন্দির। প্রসিদ্ধতম আর শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে কার্লির, ভাজার, নাসিকের, জুনারের, কানেরির, অজন্তার আর এলোরার গুহামন্দির।

হিন্দু শিল্পীরাও বৌদ্ধদের অনুসরণ করেন, নির্মাণ করেন গুহামন্দির

শৈলমালার অঙ্কে এলোরাতে, এলিফ্যাণ্টাতে আর যোগেশ্বরীতে। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে এলোরার কৈলাস আর এলিফ্যাণ্টার শিব মন্দির, পরিচিত গণেশগুম্ফা নামেও।

পশ্চাদপদ হন নাই জৈন স্থপতিও। তাঁরা অবতীর্ণ হন রঙ্গমঞ্চে সবার শেষে। কিন্তু পর্যাপ্ত নয় তাঁদের দান। এই এলোরাই বুকে নিয়ে আছে তাঁদের কীর্তির নিদর্শনও। এই এলোরাই বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, বৌদ্ধ, হিন্দু আর জৈন স্থপতির আর ভাস্করের, নিদর্শন চিত্রশিল্পীরও, তাঁদের সুন্দরতম দান, অপরূপ সৃষ্টি, অমর কীর্তি। তাই এই বৈশিষ্ট্য এলোরার, লাভ করে এলোরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের দরবারে, অমর হয় ইতিহাসের পাতায়। অমরত্ব লাভ করে তার স্থপতি, ভাস্কর আর চিত্রশিল্পীও।

আরব দেশীয় ভুগোলবিদ্ মাসুদিই প্রথমে দশম শতাব্দীতে এলোরার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, মহাতীর্থ এলোরা, সমবেত হন এখানে কত দেশ-বিদেশের যাত্রী।

উল্লিখিত হয় এলোরা ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দেও। আলাউদ্দিনের মুসলমান সৈনিকেরা এলোরা দর্শনের পথে, বন্দী করেন গুজরাট রাজ দুহিতা ও দেবগিরির রামচন্দ্রের আশ্রিতা দেবলাদেবীকে।

M. Thenevot তাঁর 'Voyage des Indis' গ্রন্থে এলোরার প্যাগোডার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, অতি মানবের রচিত এই গুহামন্দিরগুলি।

তাঁর অনুগমন করেন Anaquil-du-Parron ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, Sir Charles Malet ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, Captain Suly ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে আর Col. Sykes ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। রচনা করেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Wonders of Ellora ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, মনীষী Fergusson আর Burgess দর্শন করেন এলোরা। তাঁরাই এলোরার গুহামন্দির সম্বন্ধে বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। রচিত হয় তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Cave Temples of India" ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। পুনরাবিষ্কৃত হয় এলোরা—হয় বিশ্বজিৎ।

মহা পবিত্র তীর্থ এলোরা, পরিচিত ভেলুর নামেও। নির্মিত হয় এখানে তেত্রিশটি গুহামন্দির। নির্মাণ করেন চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজারা। রাজত্ব

করেন তাঁরা দাক্ষিণাত্যে, প্রবল প্রতাপে, ৫৫০ থেকে ৭৫৩ আর ৭৫৩ থেকে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কেন্দ্রস্থলে সতেরটি হিন্দু গুহামন্দির ত্রয়োদশ থেকে উনত্রিংশৎ। তাদের দক্ষিণে প্রথম থেকে দ্বাদশ (বারটি) বৌদ্ধ গুহামন্দির। উত্তরে চারিটি জৈন গুহামন্দির, ত্রিংশৎ থেকে চতুর্ত্রিংশৎ।

প্রায় দেড় মাইল পরিধি নিয়ে বঙ্কিমভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে কাটা হয় পশ্চিমঘাটের বুক। নির্মিত হয় মন্দির। দুই প্রান্তে রচিত হয় দুইটি শৃঙ্গ, পৃথক হয় মন্দিরগুলি পশ্চিম-ঘাটের মূল শৈলমালা থেকে। নির্মিত হয় প্রথম ও দ্বিতীয় গুহামন্দির (বৌদ্ধ) ৫৮০ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তারাই আদি গুহামন্দির এলোরার। নির্মাণ সুরু হয় তৃতীয় ও চতুর্থ (বৌদ্ধ গুহামন্দির) ও একবিংশতি, পঞ্চবিংশতি ও সপ্তবিংশতি হিন্দু গুহামন্দির ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে, সমাপ্ত হয় ৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চম গুহামন্দির (বৌদ্ধ) ও উনত্রিংশৎ গুহামন্দির (হিন্দু) নির্মিত হয় ৫৮০ থেকে ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ বৌদ্ধ গুহামন্দির এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ হিন্দু গুহামন্দির নির্মিত হয় ৭০০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। নির্মাণ করেন সবগুলি মন্দিরই চালুক্য রাজারা। প্রেরিত হন স্থপতি আর ভাস্কর রাজধানী বাতাপি থেকে। তাই বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দির বাতাপির গুহামন্দিরের ছাপ।

রাষ্ট্রকুট নৃপতি দন্তীদুর্গ ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন পঞ্চদশ গুহামন্দির (হিন্দু) দশাবতার। নির্মিত হয় ষোড়ষ গুহামন্দির কৈলাস ৭৫৭ থেকে ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। নির্মাণ করেন রাষ্ট্রকুট-শ্রেষ্ঠ প্রথম কৃষ্ণ। ত্রয়োত্রিংশৎ ও চতুর্ত্রিংশৎ (জৈন গুহামন্দির) নির্মিত হয় ৭৫০ থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। নির্মিত হয় একত্রিংশৎ (জৈন) গুহামন্দির, সবার শেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে মন্দিরেরর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। রুদ্ধ হয় গতি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি মন্দিরের অপরূপ রূপ। দেখি শুদ্ধ হয়ে। বিস্মৃত হই পারিপার্শ্বিক। ভুলে যাই কোথায় এসেছি, কেন এসেছি। প্রসারিত হয় দৃষ্টি সুদূর অসীমের পানে। ছিন্ন হয় মনের বন্ধন। সম্মুখের মেঘ-চুম্বিত ধূসর গিরিশ্রেণীর বেষ্টনী অতিক্রম করে উর্ধ্বে নীলাকাশ ভেদ করে উপনীত হয় এক রহস্যালোকে, উপস্থিত হয় স্বর্গলোকে। উৎসবে মুখরিত স্বর্গ। মুখর দেবগণ, মুখর দেবীরাও। প্রতিধ্বনিত হয় তার আকাশ-বাতাস সুরললনার সুমধুর

সঙ্গীতে আর উর্বশীর নৃত্যে। অনবদ্য সেই নৃত্যের ছন্দ, নিখুঁত তার তাল। প্রতিহত হয় সেই মহানন্দের স্পন্দন হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে, আঘাত করে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। অভিভূত হয় মন, অবশ হয় দেহ।

সিংহ মহাশয়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। দেখি সুন্দরতম চিত্রসম্ভারে অলঙ্কৃত কৈলাসের বাহিরের প্রাচীরের গাত্র। অবশিষ্ট আছে কিছু চিত্রসম্ভার ভিতরের প্রাচীরের অঙ্গেও। কতক সংস্কৃত, কতক দ্বিতীয় বার অঙ্কিত। কিন্তু যেগুলি এখনও অক্ষত আছে, স্পর্শ করে নাই সংস্কারের তুলি, অনবদ্য তাদের বর্ণসুষমা, অনুপম তাদের গঠনসৌষ্ঠব, বহু বিস্তৃত তাদের বিষয়বস্তুও। তারা সমপর্যায়ে পড়ে অজন্তার গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর, প্রতীক শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পেরও। তাই পরিচিত কৈলাস "রঙমহল" নামেও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে শুধু এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে, বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্পের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যেরও। চারিদিকের বেষ্টনী থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৈলাস, এক মহামহিমময় মূর্তিতে। তিনদিকে পাহাড়ে বেষ্টিত হয়ে আছে অন্য গুহামন্দিরগুলি।

প্রশস্ত আর সুউচ্চ এই মন্দিরের সর্বনিম্ন তলা, সেখানে সারি সারি হস্তী, সিংহ ও ব্যাঘ্র দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি! কেউ নিযুক্ত যুদ্ধে, কেউ অপরকে দংশন করতে।

তাদের উপর একটি অতি প্রশস্ত কক্ষ (সভাগৃহ) নির্মিত হয়েছে। শোভিত সেই সভাগৃহ, সুষ্ঠু-গঠন ষোলটি অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে। সূক্ষ্মতম আর আর সুন্দরতম তাদের অঙ্গের শিল্পসম্পদ, জীবন্ত তাদের শীর্ষদেশের মূর্তিসম্ভার, মূর্তি দেবদেবীর। উদ্গাত হয়েছে আরও অনেক ক্ষুদ্র স্তম্ভ প্রাচীরের গাত্রে, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য অলঙ্করণ, শীর্ষে নিয়ে দেবদেবীর মূর্তি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। তার দুই পাশে দুইটি অলিন্দ, অনুপম তাদের অঙ্গের কারুকার্য। প্রবেশদ্বারে রচিত হয় তোরণ, শোভিত সেই তোরণ জোড়া চন্দ্রাতপ দিয়ে। মূল মন্দিরের সঙ্গেও একটি আচ্ছাদিত তোরণ সংযুক্ত হয়েছে। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম

তাদের অঙ্গের অলঙ্করণও। তোরণের দুই পাশে প্রাচীরের গাত্রে খোদিত হয়েছে বৃহৎ, সুন্দর, শোভন-গঠন মূর্তি সম্ভার—মূর্তি কত দেবদেবীর।

মূল মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে একটি সুপ্রশস্ত মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে, বেষ্টিত হয়ে আছে পাঁচটি ক্ষুদ্র মন্দির দিয়ে। এই মন্দিরে স্থপতির কল্পনা পেয়েছে পূর্ণ পরিণতি, লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ রূপ, তাই লাভ করেছে এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

দুশ ছিয়াত্তর ফুট দীর্ঘ, একশ চুয়ান্ন ফুট প্রস্থ একটি সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। রচিত এই প্রাঙ্গণটিও একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে। পিছনে একটি একশ সাত ফুট উঁচু পর্দা রচিত হয়েছে, সম্মুখেও পাহাড় কেটে রচিত হয়েছে অনুরূপ একটি সুবিশাল পর্দা। তার অঙ্গে সুবৃহৎ মূর্তি, খোদিত হয়েছে মূর্তি শিবের আর বিষ্ণুর। কেন্দ্রস্থলে একটি দীর্ঘ অলিন্দ, তার দুই পাশে প্রকোষ্ঠ।

অলিন্দ অতিক্রম করে, আমরা একটি মহামহিমময়ী গজলক্ষ্মীর মূর্তি দেখি। লক্ষ্মী বসে আছেন একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর, সঙ্গে নিয়ে দুইটি হস্তী, দেবীর বাহন।

প্রাঙ্গণে ফিরে এসে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করি। দেখি, সামনের দিকে, দুই প্রান্তে দুইটি বৃহৎ হস্তী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ, জীবিত এই হস্তীমূর্তিগুলি, শোভা করে আছে দক্ষিণ আর উত্তর প্রান্ত। রক্ষী তারা মন্দিরের।

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে আর একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হই। দৈর্ঘ্যে একশ চৌষট্টি ফুট, প্রস্থে একশ নয় ফুট এই প্রাঙ্গণটি বুকে নিয়ে আছে মন্দির। সম্মুখে মন্দিরের দিকে মুখ করে, সুউচ্চ মঞ্চের উপর বসে আছেন নন্দী (বৃষভ), দেবতার বাহন। একটি সেতু দিয়ে মণ্ডপটি সংযুক্ত হয়েছে মন্দিরের সঙ্গে। মণ্ডপের দুই পাশে, দুই পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু ধ্বজস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষে নিয়ে ত্রিশূল। সেতুর নীচেও দুইটি প্রস্তরনির্মিত মূর্তি দেখি। কালভৈরবরূপী শিবের মূর্তি, রোষদীপ্ত তাঁর আনন, বিস্তৃত অক্ষিতারকা, শায়িত তাঁর পদতলে, সপ্তমাতা। মূর্তি মহাযোগীরও, সঙ্গে নিয়ে দেবগণ ও মুনি ঋষি। মহিময় এই মূর্তি দুইটি।

সেতুর দুই পাশে সোপানের শ্রেণী, উপনীত হয়েছে সুপ্রশস্ত সভাগৃহে!

সোপানের প্রাচীরের গাত্রে, দক্ষিণ দিকে, খোদিত বিভিন্ন মূর্তি। মূর্তি দিয়ে রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী, হনুমান ও বানর সৈন্যের সাহায্যে রাম ও লক্ষ্মণের স্বর্ণলঙ্কা বিজয়ের। গল্প—রাম কর্তৃক লঙ্কাধীশ রাবণবধেরও। উত্তরে মূর্তি দিয়ে মহাভারতের কাহিনী। প্রাচীরের গাত্রে, কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের দৃশ্য খোদিত হয়েছে। সারথি হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়িয়ে আছেন কৌরবের আত্মীয়স্বজনরাও, নিযুক্ত তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে।

এই মূর্তিগুলির পিছন থেকে সর্বনিম্ন তলা সুরু হয়েছে। স্কন্ধে নিয়ে আছে এই তলাটি বহু বিবদমান আর যুদ্ধমান বন্য জন্তু। সীমাহীন তাদের সংখ্যা। এক প্রান্তে, লঙ্কাধীশ রাবণ, কৈলাসের নীচে দাঁড়িয়ে কৈলাস উত্তোলনে নিযুক্ত। তাঁর প্রবল প্রতাপে কম্পিত কৈলাস। ভীতা, ত্রস্তা পার্বতী দু হাত বাড়িয়ে মহাদেবের কণ্ঠ আকর্ষণ করে আছেন। তাঁর পিছন দিয়ে পলায়নরতা পরিচারিকাবৃন্দ। অপরূপ এই মূর্তিগুলি।

একটি দ্বার অতিক্রম করে একশ আঠার ফুট দীর্ঘ একটি অলিন্দে উপস্থিত হই। বেষ্টন করে আছে এই অলিন্দটি মন্দিরের পিছনের অর্ধাংশ। সুন্দরতম উদ্গত স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে এই প্রাঙ্গণটিকেও বারোটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা হয়েছে। শোভিত করা হয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ এক একটি অনবদ্য, মহিময়, খোদিত প্রস্তরমূর্তি দিয়ে। সবগুলিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাষ্ট্রকূট ভাস্কর্যের, এক মহা গৌরবময় সৃষ্টির প্রতীক। তাদের মধ্যে আছেন চতুর্ভুজা অন্নপূর্ণা, হস্তে নিয়ে জলপাত্র, দ্বিতীয় হস্তে তিনি একটি পুষ্পকোরক ধারণ করে আছেন। লক্ষ্মীর অনুকরণে কেশ বিন্যাস করেছেন। আছেন চতুর্ভুজ, বালাজি, হস্তে নিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম। নিধনকারী রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের, বিরাজ করেন বিষ্ণু হস্তে নিয়ে সপ্তফণাযুক্ত কালীয়র পুচ্ছ। কালীয়র হস্তে একটি অসি, বক্ষে স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের পদ, শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করছেন। চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বরাহও আছেন, ধারণ করে আছেন ধরিত্রীকে। পদতলে একটি সর্প লুটিয়ে পড়েছে। দেখি গরুড় বাহনে বিষ্ণুকে, ষড়ভুজ বামনকেও দেখি, হস্তে নিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আর অসি, স্থাপিত তাঁর পদ বলির মস্তকের উপর। হস্তে একটি স্বর্ণপাত্র। চতুর্ভুজ বিষ্ণুও আছেন, ধারণ

করে আছেন গিরিগোবর্ধনকে। শয়ন করে আছেন নারায়ণ এক বৃহৎ সর্পের উপর, তাঁর নাভি থেকে নির্গত হয়েছে সহস্রদল পদ্ম, তার উপর উপবিষ্ট চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। আছেন নরসিংহও, নখর দিয়ে বিদীর্ণ করেছেন হিরণ্যকশিপুর উদর। চতুর্ভুজ, চতুর্মুখ ব্রহ্মাও আছেন, নিযুক্ত তিনি লিঙ্গ উৎপাটনে। বৃষভ বাহনে চতুর্ভুজ শিবও আছেন। আছেন নন্দীর সঙ্গে অর্ধ-নারীশ্বর চতুর্ভুজ শিবও।

দক্ষিণের অলিন্দ দেখে আমরা পূর্বদিকের বারান্দায় উপনীত হই। দৈর্ঘ্যে একশ উননব্বই ফুট এই অলিন্দটি। এখানে রচিত হয়েছে উনিশটি প্রকোষ্ঠ। শোভিত প্রতিটি কক্ষ শিবের বিভিন্ন খোদিত প্রস্তর মূর্তি দিয়ে। কোথাও তিনি পার্বতীর সঙ্গে বিরাজ করেন, কোথাও একক। বিরাজ করেন ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর সঙ্গেও। অনবদ্য এই মূর্তিগুলির গঠন সৌষ্ঠবও প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের, তাদের বহুশত বৎসরের সাধনার দানের। প্রায় সবগুলি মূর্তিই চতুর্ভুজ।

বিরাজ করেন কাল ভৈরব, তাঁর এক হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন পার্বতীকে। কালভৈরব শিব একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসে আছেন। দেখি নয়নযোগিনী মূর্তিতেও, শিবের দক্ষিণ হস্তের ত্রিশূল স্পর্শ করেছে পার্বতীর মস্তক, বাম হস্তে, তাঁর বক্ষ। সিদ্ধ-যোগিনীরূপেও বিরাজ করেন, তাঁর মস্তকের উপর গন্ধর্বগণ, পদতলে পারিষদবর্গ। বালটুকা ভৈরবরূপে তিনি বামনের স্কন্ধের উপর নৃত্য করেন, তাঁর বাম হস্তে শোভা পায় একটি দীর্ঘ ত্রিশূল। ভূপাল ভৈরবরূপে তিনি কৌপীন পরিধান করেন, তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে শোভা পায় ত্রিশূল। বাম হস্তে তাঁর ভিক্ষার পাত্র, দক্ষিণ হস্তে তিনি ডমরু বাজান। পার্বতী আর নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভৈরবরূপেও বিরাজ করেন, তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় একটি বৃহৎ অজগর। দেখি তাঁকে মহাদেবের মূর্তিতেও সঙ্গে নিয়ে নন্দী। বিরাজ করেন হংস বাহনে চতুর্ভুজ, ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাও হস্তে নিয়ে কমণ্ডলু আর জপের মালা। শিবের জটা বেয়ে গঙ্গা অবতরণ করেন, শিবের মস্তকে শোভা পায় একটি গন্ধর্ব, কণ্ঠে সর্প। তাঁর বাম পাশে পার্বতী, তাঁর মস্তকের উপর ব্রহ্মা, দক্ষিণ পাশে একটি হস্তী দাঁড়িয়ে আছে। বিরাজ করেন প্রদীপ্ত লিঙ্গরূপী শিব,

তাঁকে ব্রহ্মা বরাহ আর বিষ্ণু বেষ্টন করে আছেন। আছেন চতুর্ভুজ শিবও, হস্তে নিয়ে ডমরু, ঘণ্টা আর গদা। দেখি শিব আর পার্বতী বসে আছেন, তাঁদের পদতলে নন্দী। বিরাজ করেন তিনি ষড়ভুজ সদাশিবের মূর্তিতে। রথারোহণে যুদ্ধ করনে ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে, সারথি তাঁর ব্রহ্মা, ধ্বজার অঙ্গে নন্দীর মূর্তি। ষষ্ঠভুজ বীরভদ্ররূপেও বিরাজ করেন, হস্তে নিয়ে ত্রিশূল ডমরু আর পাত্র। নিযুক্ত তিনি রত্নাসুর বধে, সঙ্গে আছেন কালী, পার্বতী আর ভৃঙ্গী। দেখি বিবাহ হয় হর পার্বতীর, পার্বতী দাঁড়িয়ে আছেন হরের বাম পাশে। শিবের হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্প, দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধারণ করেন পার্বতীর কর। তাঁদের নীচে ব্রহ্মা বসে আছেন।

সেখান থেকে আমরা উত্তরের অলিন্দে উপনীত হই। একশ' কুড়ি ফুট দীর্ঘ এই অলিন্দটি। এখানেও বারোটি প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। শোভিতও প্রতিটি প্রকোষ্ঠ বৃহৎ মূর্তি দিয়ে। অধিকাংশই শিবের মূর্তি। যমের হাত থেকে শিব মার্কণ্ডেয় ঋষিকে রক্ষা করছেন। উপবিষ্ট তিনি দুই জন কিরাতের সঙ্গে, তাদের একজনের হাতে শোভা পায় ধনু, অপরের হাতে সর্প। পাশাপাশি উপবিষ্ট শিব আর পার্বতী, নিযুক্ত তাঁরা দ্যূতক্রীড়ায়। তাঁদের নীচে এগার জন আর নন্দী বসে আছেন। আলিঙ্গন করছেন শিব-পার্বতীকে। মুখোমুখী হয়ে শিব আর পার্বতী বসে আছেন। উপবিষ্টা পার্বতী শিবের বাম উরুর উপরও। দেখি ঋষি মুচুকুন্দ বসে আছেন স্কন্ধে নিয়ে থলে। কণ্ঠে জড়িয়ে আছেন শিব অজগর সর্প, তাঁর দক্ষিণ পাশে নন্দী দাঁড়িয়ে। উপবিষ্ট শিব আর পার্বতী, তাঁদের পদতলে বাহন নন্দী। ভক্তপ্রবর রাবণ জানু পেতে বসে, শিবলিঙ্গকে পূজা করছেন। বেষ্টিত হয়ে আছে লিঙ্গটি তাঁর নিজ হস্তে কর্তিত তাঁর নয়টি মুণ্ড দিয়ে। সাজিয়েছেন তাদের পূজার উপকরণ স্বরূপ।

বাম দিকের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ চন্দ্রাতপে উপস্থিত হই। শোভিত তার ছাদের অঙ্গ আদি চিত্রসম্ভারে। অপরূপ তাদের বর্ণ সুষমা, অনবদ্য অঙ্কন পদ্ধতি। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন দুইটি অতিকায় দ্বারপাল, মহামহিমময় মূর্তিতে।

দ্বার অতিক্রম করে মণ্ডপে প্রবেশ করি। প্রস্থে সাতান্ন ফুট, গভীরতায় পঞ্চান্ন ফুট এই মণ্ডপটি। কেন্দ্রস্থলে একটি সুপ্রশস্ত বেদি শোভা পায়, চারকোণে

ষোলটি বিশাল চতুষ্কোণ স্তম্ভ, প্রতি কোণে চারটি করে। শোভিত করেছেন শিল্পী তাদের অঙ্গ অপরূপ অলঙ্করণে, জীবিত মূর্তিসম্ভারে ভূষিত তাদের শীর্ষদেশ, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের প্রতীক। দাঁড়িয়ে আছে ষোলটি উদ্গাত স্তম্ভও, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে সুন্দরতম মূর্তিসম্ভার। উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে, হর-পার্বতীর মূর্তি খোদিত, নিযুক্ত তাঁরা দ্যূতক্রীড়ায়। দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে বৃষভবাহনে শিব আর পার্বতী। বেদীর চার কোণে চারটি দ্বার। সেই দ্বার অতিক্রম করে চারটি 'ব্যালকনি'তে উপনীত হতে হয়। শোভিত করেছেন শিল্পী এই সব ব্যালকনির ছাদ আর স্তম্ভের অঙ্গ, সুন্দরতম বিভিন্ন লতা-পল্লবে ও পুষ্পে, রচিত হয়েছে এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের।

মণ্ডপের পূর্বপ্রান্তে তোরণের ছাদে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ লক্ষ্মীমূর্তি। তাঁর দক্ষিণে গণ সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মা বসে আছেন, বামে গন্ধর্ব সঙ্গে বিষ্ণু। এই তোরণের প্রবেশদ্বারে মকরবাহনে গঙ্গা, আর কূর্ম বাহনে যমুনা, দুই স্ত্রী দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছেন। বেদীর উপরে বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন, নাই কোন শিল্পসম্ভার গর্ভগৃহে।

দক্ষিণের সোপান দিয়ে অবতরণ করি, দেখি কত সুন্দর মূর্তি, মূর্তি গণপতির। ময়ূরবাহনে, শিশু অঙ্কে নিয়ে কার্তিকেয়র মূর্তি, ত্রিশূল হস্তে, ষণ্ডপৃষ্ঠে এক দেবীর মূর্তি। মূর্তি সরস্বতীর ও আরও কয়েকটি দেবীর, বসে আছেন তাঁরা এক মহা সম্মেলনে, পৃথক হয়ে আছেন প্রাচীরের গাত্র থেকে।

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে উপস্থিত হ'য়ে পূর্বপ্রান্তে একটি সুন্দর লক্ষ্মীর মূর্তি দেখি। হস্তে ধরেছেন লক্ষ্মী পদ্ম, তাঁর পশ্চাতে, লক্ষ্মীর বাহন, চারটি হস্তী দাঁড়িয়ে আছে।

সোপান অতিক্রম করে, একটি প্রশস্ত হল ঘরে (সভাগৃহে) উপনীত হই, সেখানে আছেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। আরও কিছু দূরে অগ্রসর হয়ে একটি প্রদক্ষিণের পথে পৌঁছাই। এখানেও একটি ষাট ফুট দীর্ঘ অলিন্দ রচিত হয়েছে বুকে নিয়ে পাঁচটি বিশাল স্তম্ভ। সেখানেও বিরাজ করেন কত শিব আর পার্বতী, মকর বাহনে গঙ্গা আর কূর্ম বাহনে যমুনাও। দেখি, এক অতি সুন্দর বরাহমূর্তি, হস্তে ধারণ করে আছেন বরাহ পৃথিবীকে।

আবার সভাগৃহে ফিরে আসি। এক প্রান্তদেশের দ্বার অতিক্রম করে ছাদে নির্গত হই। এইখানেই ছিয়ানব্বই ফুট উচু মন্দিরের শিখারা বা চূড়া নির্মিত হয়েছে।

দাঁড়িয়ে আছে শিখারা এক মহামহিমময় মূর্তিতে, বুকে নিয়ে অনবদ্য শিল্পসম্ভার। অলঙ্কৃত হয়ে আছে সুন্দরতম মূর্তিসম্ভারেও। প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের আর স্থাপত্যের, এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, দেখি স্তব্ধ হয়ে। নিম্নাংশে, উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। তাদের কোনটিতে শোভা পায় শিবের মূর্তি, কোনটিতে বিষ্ণুর। নিখুঁত এই মূর্তিগুলির গঠনসৌষ্ঠব, জীবন্ত। অপরূপ মূর্তি দিয়ে শোভিত প্রকোষ্ঠের ছাদের অঙ্গ ও প্রাচীরের গাত্র। তাদের উপর নির্মিত হয়েছে মন্দিরের ক্রমহ্রস্বায়মান সূক্ষ্মাগ্র চূড়া। চূড়ার অঙ্গের শিল্পসম্ভারে, প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের গাত্রে ও তাদের ছাদের অঙ্গের মূর্তিগুলির অনুপম গঠন-ভঙ্গিমায় এক অপরূপ সমন্বয় করা হয়েছে। রচিত হয়েছে এক বিরাট সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। এইখানেই দ্রাবিড়, স্থাপত্য আর ভাস্কর্য পেয়েছে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয়েছে উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে।

বহির্ভাগেও, পাঁচটি ক্ষুদ্র মন্দির রচিত হয়েছে। দেখি একে একে।

ফিরবার পথে আরও একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখি। দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন দ্বারপাল, গঙ্গা আর যমুনা। গর্ভগৃহে, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, খোদিত একটি ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর। অলঙ্কৃত করে আছেন তার বেদিও এক দেবতা, সঙ্গে নিয়ে এক দেবী। এক প্রান্তে বিষ্ণু বিরাজ করেন। তাঁর দুই হস্তে দুইটি পুষ্প। বরাহও আছেন। বিস্তৃত তাঁর হস্ত। শূন্যে ধারণ করে আছেন ধরিত্রীকে। কেন্দ্রস্থলে প্রদীপ্ত অগ্নি। তার একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন উমা, অপর দিকে পার্বতী। তাঁরা গণপতিকে ধরে আছেন। মহাদেব বসে আছেন; কণ্ঠে ধারণ করেছেন এক অজগরকে। তাঁর বাম পাশে বিষ্ণু উপবিষ্ট, দক্ষিণে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা। নরসিংহও আছেন। শায়িত তাঁর জানুর উপর দৈত্য হিরণ্যকশিপু। নিযুক্ত নরসিংহ তাঁর দুই হস্তের নখর দিয়ে তার উদর বিদীর্ণ করতে। তাঁর পদতলে, উপবিষ্ট গরুড়। দেখি একটি মহিমময় গণেশের মূর্তিও। যেমন তাঁর অঙ্গের সৌষ্ঠব, তেমনই জীবন্ত তাঁর মূর্তি। অপরূপ সুন্দরতম এই মূর্তিটি, দেখি নাই এমন সুন্দর গণেশের মূর্তি অন্য কোন

স্থানে, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের, এক অমর কীর্তির। দেখে মেটে না আশ, হয় না পরিতৃপ্তি।

ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি। ভাবি, এই তো স্বর্গের কৈলাস! নয় এ মর্তভূমি এলোরা। কৈলাস-শ্রেষ্ঠ দেবলোকেও, শিবের স্বর্গ, প্রিয়তম দেবতাদেরও, দাঁড়িয়ে আছে সম্মুখে, নিয়ে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য, তার অন্তহীন সুষমা। জানি না কে রচনা করেন এমন মহামহিমময় পরিকল্পনা, কোন্ শিল্পী দেন তাতে এমন সুন্দরতম নিখুঁত রূপ? সাজান তাকে তুলনাহীন শিল্পসম্পদে, ঢেলে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দেন মনের অপরিসীম মাধুরী, রচনা করেন মর্ত্যভূমে স্বর্গের কৈলাস। তাই লাভ করে কৈলাস শ্রেষ্ঠত্বের আসন, বিশ্বের শিল্পের দরবারে, লাভ করে যুগে যুগে।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি রাষ্ট্রকুট-শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে, জানাই শিল্পীদেরও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

একটি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে আমরা পঞ্চদশ গুহামন্দির, 'দশাবতারে' প্রবেশ করি। হিন্দু গুহামন্দির, একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত পাহাড় কেটে রচিত মন্দিরের প্রাঙ্গণটি। সম্মুখে রচিত হয়েছে একটি বৃহৎ প্রস্তরের পর্দা, কেন্দ্রস্থলে যজ্ঞশালা, প্রাচীরের ধার দিয়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আর জলাধার। পশ্চিম প্রবেশপথে একটি অপরূপ তোরণ। দাঁড়িয়ে আছে তোরণটি দুইটি সুন্দর স্তম্ভের উপর। শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে কয়েকটি জাফরি, জালির গবাক্ষ। কক্ষের অভ্যন্তরে চারটি অপরূপ স্তম্ভ শোভা পায়। অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে বাহিরের প্রাচীরের গাত্র। ছাদের চার কোণে চারটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে আর প্রান্তদেশে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি। অপরূপ তাদের গঠনসৌষ্ঠব, জীবন্ত—দেখে মুগ্ধ হই। দ্বিতল এই মন্দিরটি। পঁচানব্বই ফুট দীর্ঘ নিম্নতলটি। বুকে নিয়ে আছে চোদ্দটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আর দুইটি কক্ষ, পশ্চাতের প্রাচীরের দুই প্রান্তে। সামনের গলিপথে, উত্তর প্রান্তে, দ্বিতলে উঠবার সোপানের শ্রেণী আলোকিত ল্যাণ্ডিং-এর শীর্ষদেশের গবাক্ষ দিয়ে। ল্যাণ্ডিং-এর চতুর্দিকের প্রাচীরের গাত্রে দুফুট উঁচু এগারটি প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। খোদিত হয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠে

এক একটি সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তি—মূর্তি দেবতার, মূর্তি গণপতির। দেখি, শিবের উরুর উপর উপবিষ্টা পার্বতী, পদ্মফুল হস্তে বিষ্ণু, বসে আছেন শিব আর পার্বতী, সঙ্গে নিয়ে গণপতি আর নন্দী। গরুড় বাহনে বিষ্ণুও আছেন। বিরাজ করেন মহিষাসুরও, নির্গত হন তিনি মহিষাসুরের কর্তিত মস্তক থেকে। পড়ে না এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে, নইলে জন্মাবে অসুর প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে। দেখি চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী ভবানীর মূর্তি, তাঁর এক হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল, অপর হস্তে ডমরু। তপস্যায় নিযুক্তা চতুর্ভুজা, কালীও দেখি। তাঁর হস্তে শোভা পায় খাঁড়া, ত্রিশূল আর মাংসখণ্ড। আর দেখি, অর্ধনারীশ্বরকে, পুরুষ ও নারীরূপী শিব। তাঁর এক হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল অপর হস্তে তিনি ধারণ করেন একটি মুকুর।

আমরা ল্যাণ্ডিং-এর এই অপরূপ মূর্তিগুলি দেখে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হই। পঁচানব্বই ফুট দীর্ঘ ও একশ নয় ফুট গভীর এই কক্ষটিও। তার সঙ্গে একটি সুন্দরতম কারুকার্যসমন্বিত তোরণ। দাঁড়িয়ে আছে কক্ষটি বা সভাগৃহটির ছাদ চুয়াল্লিশটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর। সুন্দর এই স্তম্ভগুলি। সুন্দরতম তাদের মধ্যে, সম্মুখের দুইটি, অলঙ্কৃত তাদের সর্বাঙ্গ আর শীর্ষদেশ লতাপল্লব আর মূর্তি দিয়ে। মূর্তি সর্পের, মূর্তি বামন আর গন্ধর্বেরও। রচিত হয় এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, প্রস্তরের অঙ্গে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি, তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার।

সভাগৃহের প্রবেশদ্বারে দুই অতিকায় শৈব দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করি। দেখি একদিকে চতুষ্কোণ উদ্গত স্তম্ভের বেষ্টনীর ভেতর প্রাচীরের গাত্রে খোদিত হয়েছে বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্তি, অপর দিকে শিবের। মহামহিময় জীবন্ত এই মূর্তিগুলি। অনবদ্য তাদের গঠন-সৌষ্ঠব, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রতীক সৃষ্টির এক গৌরময় যুগের। আমরা উত্তর দিক থেকে দেখা সুরু করি। দেখি ভৈরব মূর্তিতে এক সুবিশালকায় শিবকে। পরিধানে তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, বাহুতে নরমুণ্ডের চুড়ি, বেষ্টন করে আছে তাঁকে একটি অতিকায় অজগর। প্রোথিত তাঁর হস্তের ত্রিশূল রত্নাসুরের বক্ষে। দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন অপর এক অসুরের পদযুগল। বিস্তৃত তাঁর

আনন। নির্গত তাঁর মুখগহ্বর থেকে বীভৎস, বৃহৎ দন্তগুলি। উন্মত্ত আনন্দে তিনি ডমরু বাজাচ্ছেন, আর অসুরের রক্ত সংগ্রহ করছেন। তাঁর পদতলে শায়িতা এলোকেশী, ভয়ঙ্কর দর্শনা কালী। বিশাল তাঁর আনন, কোটরে প্রবিষ্ট তাঁর অক্ষিতারা, তিনি এক হস্তে ধারণ করে আছেন একটি অসি, অপর হস্তে একটি পাত্র, প্রসারিত সেই পাত্র, পতিত হয় তার মধ্যে শোণিতবিন্দু। পিছনে দাঁড়িয়ে এক পেচক এই দৃশ্য দেখছে, দর্শন করছেন এক পাশ থেকে পার্বতীও। অসুরের পদতলে কয়েকটি দানব দাঁড়িয়ে, তারাও ভয়চকিত হয়ে এই ভীষণ দৃশ্য দেখছে। ভয়াল, ভয়ঙ্কর এই দৃশ্য। কিন্তু অপরূপ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, মনের মাধুরীতে আর হৃদয়ের ঐশ্বর্যে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেবতার এই ভয়াল রূপ।

দ্বিতীয় কক্ষে উন্মত্ত, তাণ্ডব নৃত্যে নিযুক্ত নটরাজ। নৃত্য করেন বহুভুজ নটরাজ। তাঁর দক্ষিণে উপবিষ্ট বাদকেরা, কারও হস্তে বীণা, কেউ ডমরু বাজান। নৃত্য করেন নটরাজ তালে তালে। বামে দাঁড়িয়ে পার্বতী এই নৃত্য দর্শন করেন। অপরূপ এই দৃশ্যটি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভাস্করের।

চতুর্থ কক্ষে পার্বতী আর শিব পাশা খেলায় নিযুক্ত, সঙ্গে আছেন গণপতি আর নন্দী।

পঞ্চম কক্ষে শিব আর পার্বতীর বিবাহ হচ্ছে। পার্বতী শিবের বামপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নীচে ব্রহ্মা উপবিষ্ট, নিযুক্ত তিনি পুরোহিতের কাজে। অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা এই বিবাহ দর্শন করছেন, এসেছেন তাঁরা বিভিন্ন বাহনে।

ষষ্ঠতে কৈলাসে উপনীত হয়ে, রাবণ মহাদেবের কাছে, অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করছেন।

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে দেখি, মার্কণ্ডেয়কে উদ্ধার করবার জন্য শিব লিঙ্গ থেকে নির্গত হচ্ছেন। রজ্জুবদ্ধ মার্কণ্ডেয়র কণ্ঠ, যম তাঁকে যমালয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত। দেখি, শিব আর পার্বতীকেও। এক হস্তে শিব নিজের কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করে আছেন, দ্বিতীয় হস্তে তাঁর জপের মালা। দক্ষিণে নন্দী দাঁড়িয়ে, পিছনে ভৃঙ্গী। উর্ধ্বে হস্তীপৃষ্ঠে এক ধ্যানমগ্ন ঋষি। তাঁর মস্তকের চতুর্দিকের দিব্যজ্যোতির বাম পাশে একটি মৃগ।

সভাগৃহ অতিক্রম করে, আমরা তোরণে উপস্থিত হই। বাম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিশালকায় গণপতি, মহামহিমময় মূর্তিতে। মেঝের উপর দুই প্রান্তে, দুইটি সিংহ বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

পিছনের প্রাচীরের গাত্রে, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর পার্বতী উপবিষ্টা। তাঁর দুই পাশে দুইজন সঙ্গীতজ্ঞা বসে আছেন। দ্বারে দুই চতুর্ভুজ দ্বারপাল দণ্ডায়মান, হস্তে নিয়ে গদা, সর্প আর বজ্র। ভিতরে একটি বেদি। বেদির উপর লিঙ্গ বিরাজ করেন। দ্বারের দক্ষিণ পাশে, শ্রী বসে আছেন, হস্তে নিয়ে পদ্ম। চারটি হস্তীর শুণ্ড থেকে বর্ষিত হচ্ছে বারি তাঁর মস্তকে। সঙ্গে আছে দু'জন পরিচারকও, হস্তে নিয়ে জলপাত্র, শঙ্খ আর চক্র। তোরণের দক্ষিণ প্রান্তে দেখি একটি বিষ্ণুমূর্তি, হস্তে নিয়ে ত্রিশূল, তাঁর পাশে গরুড় বসে আছেন।

দেখি, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে লিঙ্গের ভিতর শিব উপবিষ্ট, নির্গত হচ্ছে জ্যোতি সেই লিঙ্গ থেকে। বরাহ অবতারে বিষ্ণু, লিঙ্গের ভিত্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর সম্মুখের ভূমি খনন করেছেন। কিন্তু বিফল হয় তাঁর প্রচেষ্টা, কৃতাঞ্জলি পুটে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন লিঙ্গের সম্মুখে, নিযুক্ত থাকেন পূজায়। বিপরীত দিকে, উর্ধ্বে আরোহণ করে ব্রহ্মা দেখেন কোথায় এই লিঙ্গের সমাপ্তি। অক্ষমতার অপরাধে অপরাধী হয়ে তিনিও কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে স্তব করতে থাকেন। প্রমাণিত হয় মহেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব। রথে আরোহণ করে সবিতা যাচ্ছেন। চতুর্বেদ সেই রথের অশ্ব, সারথি ব্রহ্মা। যাচ্ছেন তিনি তারকাসুর নিধনে।

সবশেষে দক্ষিণের প্রাচীরের সম্মুখে উপস্থিত হই। দেখি ষড়ভুজ বিষ্ণুকে। তিনি বামপদ স্থাপন করেছেন বামনের স্কন্ধে, হস্তে ধারণ করে আছেন গিরি-গোবর্ধনকে, রক্ষা করছেন দেবরাজ, ইন্দ্রের প্রেরিত বৃষ্টির হাত থেকে ব্রজের ধেনুগণকে। দেখি শেষনাগের উপর বিষ্ণু শয়ন করে আছেন। শেষনাগের শিরে শোভা পায় সুবিশাল ফণা। বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত হয় একটি সহস্রদল প্রস্ফুটিত পদ্ম—তার উপর ব্রহ্মা উপবিষ্ট। সপ্তসখী পরিবৃতা হয়ে, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন। দেখি গরুড়-বাহনে বিষ্ণু। বরাহরূপী বিষ্ণুও দেখি, হস্তে নিয়ে পৃথ্বী, তাঁর পদতলে তিন নাগ বিরাজ করেন। দেখি বামন

অবতারে বিষ্ণুকে। পরিগ্রহ করে বামন এক মহামহিমময় মূর্তি, স্থাপিত হয় তাঁর এক পদ স্বর্গে, অপর পদ পৃথিবীতে, তৃতীয় পদে তিনি বলিরাজকে পাতালে প্রেরণ করেন। বলিরাজার হস্তে একটি পাত্র। পিছনে দাঁড়িয়ে গরুড় নিযুক্ত বলিবন্ধনে। সবশেষে নরসিংহ অবতারে বিষ্ণুকে দেখি। অষ্ট হস্তে তিনি হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। হিরণ্যকশিপুর এক হস্তে অসি অন্য হস্তে ঢাল।

"দশাবতার" দেখে আমরা চতুর্দশ গুহামন্দির রাবণ কা কাই দেখতে যাই। চোখের সামনে ভাসতে থাকে দশাবতারের মূর্তিসম্ভার, তুলনাহীন অপরাজেয় দান ভারতের ভাস্করের, তাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন।

রাবণ কা কাই, অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু গুহামন্দির এলোরার, বুকে নিয়ে আছে চুয়াল্লিশ ফুট প্রস্থ, সাড়ে বাহান্ন ফুট দীর্ঘ সভাগৃহ। দাঁড়িয়ে আছে সভাগৃহটি মন্দিরের সংলগ্ন, শোভিত হয়ে আছে ষোলটি সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। তাদের মধ্যে দুইটি সম্মুখে আর বারোটি কক্ষের ভিতরে। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি সূক্ষ্মতম লতাপুষ্প, শীর্ষে নিয়ে আছে আনমিত কর্ণ। বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি একটি পঁচাশী ফুট দীর্ঘ প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে। উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে, প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয়েছে প্রকোষ্ঠ। অপরূপ এই উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গের অলঙ্করণও, বিস্তৃত হয়ে আছে তাদের পাদদেশ থেকে বন্ধনী পর্যন্ত। প্রকোষ্ঠের ভিতরে শোভা পায় মূর্তি।

দেখি শোভিত দক্ষিণের প্রাচীর, বহু শৈব মূর্তি দিয়ে। সুন্দর তাদের গঠনভঙ্গিমা, শোভন তাদের প্রকাশ। দেখি মহিষাসুরী দুর্গা, নিযুক্তা মহিষাসুর নিধনে। মঞ্চের উপর বসে পাশা খেলছেন হরপার্বতী। শিবের পিছনে সপারিষদ গণপতি উপবিষ্ট। পার্বতীর পিছনে দুই নারী পরিচারিকা। পিছনে দাঁড়িয়ে ভৃঙ্গী, সেই খেলা দেখছেন।

দেখি তাণ্ডব নৃত্য করেন নটরাজ। নাচেন প্রলয় নাচনে। লুপ্ত হয় সৃষ্টি। তিনি বাদক, ঢক্কা আর বাঁশী বাজান। পশ্চাতে নরকঙ্কাল সঙ্গে ভৃঙ্গী, বামে পার্বতী, সঙ্গে নিয়ে মার্জার-আনন বিশিষ্ট গণ। তাঁর বামে উপবিষ্ট ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। দক্ষিণে হস্তীবাহনে দেবরাজ ইন্দ্র আর মেষবাহনে অগ্নি। তাঁরা দর্শন করেন এই ভয়ঙ্কর নৃত্য।

আর দেখি লঙ্কাধিপতি দশানন, বিংশ হস্ত রাবণ ধারণ করে আছেন শিবের স্বর্গ, কৈলাস। তাঁর শিরোভূষণে একটি জন্তুর মূর্তি শোভা পায়। প্রচেষ্ট তিনি কৈলাসকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে। ভীতা, চকিতা পার্বতী, মহাদেবকে দুই হস্ত দিয়ে বেষ্টন করে আছেন। মহাদেবের পদাঘাতে পিষ্ট রাবণ। পরিচারক পরিবৃত হয়ে শিব আর পার্বতী বসে আছেন, সঙ্গে আছেন চারিটি গণও, তাঁরা রাবণকে উপহাস করছেন।

দেখি ভৈরব মূর্তিতে শিব, দু হস্তে পরিধান করছেন ব্যাঘ্রচর্ম। প্রোথিত তাঁর দুই হস্তের ত্রিশূল রত্নাসুরের বক্ষে। অপর এক হস্তে তিনি ধারণ করেছেন অসি, তাঁর ষষ্ঠ হস্তে শোভা পায় একটি পাত্র। রত্নাসুরের রক্তে রঞ্জিত সেই পাত্র।

প্রদক্ষিণের পথে, তিনটি কঙ্কালমূর্তি দেখি। দেখি, চতুর্ভুজ কাল, বুকে জড়িয়েছেন সর্প। বিরাজ করেন কালী, মহাকালীরূপে। গণপতি নাড়ু ভক্ষণ করছেন, তাঁর পিছনে, তাঁর সপ্ত মাতা দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি, পেচক-বাহনে চামুণ্ডা, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্টা ইন্দ্রাণী, বরাহবাহনে বরাহী, গরুড়বাহনে বৈষ্ণবী, ময়ূরবাহনে কুমারী, বৃষভবাহনে মহাদেবী, হংসবাহনে সরস্বতী, দেখছেন এই দৃশ্য।

উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে, দেখি, ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চতুর্ভুজা ভবানী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হস্তে শোভা পায় একটি ত্রিশূল। দেখি, এক সুবিশাল প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মী গজে উপবিষ্টা। তাঁর হস্তে শোভা পায় শঙ্খ ও চক্র। তাঁর সম্মুখে নাগিনীরা, হস্তে নিয়ে জলপাত্র। দুপাশ থেকে দুই হস্তী শুঁড় দিয়ে সেই পাত্র থেকে জল তুলে নিয়ে প্রক্ষালন করিয়ে দিচ্ছে তাঁর হস্ত। আছেন বরাহ অবতারে বিষ্ণু, পদদলিত করছেন একটি ফণাযুক্ত সর্পকে, হস্তে ধারণ করে আছেন পৃথিবী, রুদ্ধ হয় ধরিত্রীর ধ্বংসের গতি। তাঁর দুই পাশে কৃতাঞ্জলিপুটে দুইটি নাগ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুও আছেন, বসে আছেন বৈকুণ্ঠে। তাঁর দুই পাশে তাঁর দুই প্রিয়তমা, লক্ষ্মী আর সীতা উপবিষ্টা, পদতলে বাহন গরুড় দাঁড়িয়ে। তাঁর নীচে কতকগুলি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞা বসে আছেন। একাসনে বিষ্ণু আর লক্ষ্মী বসে আছেন, তাঁদের মস্তকের উপর শোভা পায় একটি অপরূপ চন্দ্রাতপ। পদতলে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সাতটি বামন।

মন্দিরের দ্বারে দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। খোদিত হয়েছে আরও অনেক মূর্তি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ শুয়ে আবার কেউ উড়ে চলেছে। বিলম্বিত তাদের হস্তের মালা। গর্ভগৃহে, বেদির উপর দুর্গা বিরাজ করেন, বিগ্রহ এই মন্দিরের। সুন্দরতম এই মন্দিরের মূর্তিগুলিও, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের।

চতুর্দশ গুহামন্দির দেখে আমরা দ্বাদশ গুহামন্দিরে, "তিনতলায়" উপনীত হই। খুব সম্ভব ত্রয়োদশ গুহামন্দিরই প্রাচীনতম গুহামন্দির এলোরার, নির্মিত হয় স্থপতির আর মন্দির-নির্মাতাদের বাসের জন্য, বুকে নিয়ে একটি মাত্র নিরাভরণ কক্ষ।

এখান থেকে প্রথম গুহা পর্যন্ত সবগুলিই বৌদ্ধমন্দির। ত্রিতল এই মন্দিরটি, তাই পরিচিত তিনতলা নামে।

প্রাঙ্গণ থেকে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করে আমরা একতলার সভাগৃহে প্রবেশ করি। সম্মুখে শোভা পায় আটটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী।

শোভিত কেন্দ্রস্থলের স্তম্ভ দুটির অঙ্গ, অনুপম লতাপুষ্পে আর সূক্ষ্মতম পল্লবে। সম্মুখ সারির পশ্চাতেও দুইটি স্তম্ভের শ্রেণী নির্মিত হয়েছে। আছে প্রতিটি শ্রেণীতে আটটি করে স্তম্ভ। ভিতরেও রচিত হয়েছে ছয়টি স্তম্ভ। বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি সর্বসমেত ত্রিশটি স্তম্ভ।

মন্দিরের প্রবেশপথের বাম দিকের পশ্চাৎ দেওয়ালে রচিত হয়েছে একটি বৃহৎ কক্ষ। বিভক্ত সেই কক্ষটি নয়টি অংশে, শোভিত খোদিত অপরূপ মূর্তি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলে বুদ্ধ বিরাজ করেন। দু'পাশ থেকে তাঁকে দুই পরিচারক ব্যজন করছে। তাঁর দক্ষিণে পদ্মপাণি, বামে বজ্রপাণি। আরও তিনটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজনের হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ। আবদ্ধ সেই পুষ্পগুচ্ছ একটি গ্রন্থের সঙ্গে। দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তে শোভা পায় পদ্মের কোরক। তৃতীয় একটি ধ্বজা ধারণ করে আছেন। মস্তকের উপর এক রমণী উপবিষ্টা, হস্তে নিয়ে একটি পুষ্প। পদ্মপাণির দক্ষিণ পাশেও তিনটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের হস্তে একটি দীর্ঘ অসি, মস্তকের শিরোভূষণে স্থাপিত একটি সুষ্ঠু-গঠন ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি, কণ্ঠে বহুমূল্য মুক্তার মালা। অপর হস্তে শোভা পায় একটি মুদ্রাধার। খুব সম্ভব ইনিই জবালা, বৌদ্ধ

ধনদেবতা। অলঙ্কৃত করা হয়েছে অনুরূপ মূর্তির সমষ্টি দিয়ে এই মন্দিরের আরও অনেক স্থান।

তোরণের দুই পাশে সিংহাসনে বসে আছেন সারি সারি বুদ্ধ। মন্দিরের দুই দ্বারে দুই স্থূলকায় ব্যক্তি বসে আছেন, রক্ষক তাঁরা এই মন্দিরের। তাঁদের মধ্যে একজনের হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্পগুচ্ছ। মন্দিরের অভ্যন্তরে, গর্ভগৃহে, বেদির উপর উপবিষ্ট এগার ফুট উঁচু বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে। উর্ধ্বে, প্রাচীরের গাত্রে, এক এক দিকে পাঁচ বুদ্ধ বসে আছেন। নীচে, বামে, পুষ্পহস্তে পদ্মপাণি, তাঁর পাশে দীর্ঘ অসি হস্তে নিয়ে একটি নর। স্থাপিত অসিখানি একটি পুষ্পের উপর। তার পাশে আর একজন হস্তে নিয়ে পুষ্পগুচ্ছ আর গ্রন্থ। তার পাশেও একজন পদ্মের কোরক হস্তে। দক্ষিণে বজ্রপাণি। তাঁর পাশেও শোভা পায় কয়েকটি মূর্তি। কারও হস্তে শোভা পায় পুষ্প, কেহ হস্তে ধারণ করে আছেন একটি গ্রন্থ। উত্তরে একটি নারী উপবিষ্টা। শোভা পায় তাঁর বক্ষে একটি মেখলা। দক্ষিণে একটি চতুর্ভুজা নারী। তাঁর এক হস্তে শোভা পায় একটি বোতল, অপর হস্তে পুষ্প।

বেদির পাশ দিয়ে, সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে, ল্যাণ্ডিংয়ের সম্মুখে, একটি প্রকোষ্ঠে উপনীত হই। শোভা পায় প্রকোষ্ঠের সামনে দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ। দেখি পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, একটি সুউচ্চ সিংহাসনে বুদ্ধ বসে আছেন। তাঁর দুই পাশে পারিষদবর্গ। পদ্মপাণিও এক পাশে বসে আছেন। তাঁর এক পাশে একটি নর, অন্য পাশে একটি নারী, পুরুষটির পত্নী। দেখি, আরও অনেক ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্তি এই কক্ষের মধ্যে।

সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হই। রচিত হয়েছে একটি দীর্ঘ অলিন্দ, দ্বিতলের সভাগৃহের সামনে। অলিন্দের কেন্দ্রস্থলে, দুইটি অনবদ্য, সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে সভাগৃহের প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে। অলিন্দের দুই প্রান্তেও দুইটি প্রবেশ পথ আছে। সুদীর্ঘ এই সভাগৃহ, উচ্চতায় সাড়ে এগার ফুট। দুই শ্রেণীতে আটটি করে স্তম্ভ দিয়ে তিনটি গলিপথে বিভক্ত করা হয়েছে এই সভাগৃহকে। কেন্দ্রস্থলের তোরণের প্রান্তদেশে শোভা পায় বহু মূর্তি। শোভা পান দুই পাশে নারী পরিবেষ্টিত হয়ে পদ্মপাণি। তাঁদের একজনের হস্তে একটি বোতল, দাগবা ও একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার আলো করে' পদ্মপাণি আর বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন। অনবদ্য তাঁদের গঠনসৌষ্ঠব, অপরূপ তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, শ্রেষ্ঠ প্রতীক বৌদ্ধ ভাস্কর্যের। পদ্মপাণির হস্তে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। বজ্রপাণির হস্তে শোভা পায় বজ্র, কোটিদেশে বহুমূল্য রত্নখচিত মেখলা, কণ্ঠে মুক্তার মালা। মন্দিরের ভিতরে, গর্ভগৃহে, সিংহাসনে অধিরোহণ করে আছেন এক মহামহিমময় বুদ্ধ। তাঁর সম্মুখে, পাত্রহস্তে এক পরমারূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন। বিপরীত দিকেও এক ক্ষুদ্রকায়া নারী দাঁড়িয়ে; তার পদতলে, আরও একটি নারী শয়ন করে আছে। বুদ্ধের দুই প্রান্তে বিরাজ করেন পদ্মপাণি আর বজ্রপাণি মহিমময় মূর্তিতে।

সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রেও শোভা পায় একজন পুরুষ ও একজন নারী। ঊর্ধ্বে, তাদের উপর উপবিষ্ট সাত-বুদ্ধ।

উত্তর প্রান্তেও মহামহিমময় মূর্তিতে বুদ্ধ বসে আছেন। তাঁর পদতলে একটি চক্র, সম্মুখে দুইটি মৃগ, দুই পাশে বুদ্ধের পার্শ্বচরেরা।

সোপান অতিক্রম করে, সর্বোচ্চ তলায় উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি ভাস্করের অনবদ্য মহিমময় পরিকল্পনা, আর তার সুন্দরতম, আর সূক্ষ্মতম রূপদান। দেখি বৌদ্ধস্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মহান কীর্তি, এক মহান গৌরবময় যুগের, নিদর্শন তাদের পূর্ণ পরিণতির, চরম উৎকর্ষের।

দেখি, নির্মিত হয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের সারি, প্রতিটি সারিতে আটটি করে স্তম্ভ। বিভক্ত হয়েছে সভাগৃহটি পাঁচটি গলিপথে স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। রচিত হয়েছে দুইটি স্তম্ভ দিয়ে প্রবেশদ্বারও। অনবদ্য, সুন্দরতম এই স্তম্ভগুলি, বুকে নিয়ে আছে অনুপম শিল্পসম্ভার, শ্রেষ্ঠদান বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন এক অমর কীর্তির। বিস্মিত হয়ে দেখি, স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্পদ। তারপর দেখতে থাকি সভাগৃহটি।

দেখি, গলিপথের প্রান্তদেশের, কুলুঙ্গির ভিতরে, সিংহাসনে আরোহণ করে আছেন বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে। সঙ্গে আছে পারিষদবর্গ।

পশ্চাতের গলিপথের দক্ষিণ প্রান্তেও বুদ্ধ সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন। আছেন মহামহিমময় মূর্তিতে। তাঁর পদতলে শোভা পায় চক্র আর হরিণ, প্রতীক বারাণসীর হরিণ উদ্যানের। এই উদ্যানেই বুদ্ধ প্রথম প্রচার করেন

তাঁর বাণী। প্রতীক তাঁর ধর্মেরও। তিনি দক্ষিণ হস্তের অনামিকা আর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বাম হস্তের অনামিকা আর অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে আছেন। নিযুক্ত তিনি শিক্ষাদানে।

গলিপথের উত্তর প্রান্তে সিংহাসনে অধিরোহণ করে আছেন এক বুদ্ধ। সিংহাসনের কেন্দ্রস্থলে একটি সিংহমূর্তি। তাঁর এক পাশে এক ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, স্থাপিত তাঁর দুই হস্ত তাঁর অঙ্কে, নিযুক্ত তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য কঠোর ধ্যানে।

দেখি এক উড্ডীয়মান বুদ্ধ, দেবতাদের নিকট বাণী প্রচারের জন্য স্বর্গে যাচ্ছেন। নির্বাণ অভিলাষী বুদ্ধকেও দেখি। বিরাজ করে পরম শান্তি তাঁর চতুর্দিকে, এক মহা প্রশান্তি।

দেখি, এই মূর্তিগুলির দক্ষিণে, পিছনের প্রাচীরের গাত্রে উঁচু মঞ্চের উপর, সারি সারি সাতটি বুদ্ধ বসে আছেন, বিস্তৃত হয়ে আছেন মন্দিরের তোরণ পর্যন্ত। অনুরূপ তাঁদের আকৃতি, নিযুক্ত তাঁরাও ধ্যানে। তাঁদের মস্তকের উপর শোভা পায় এক একটি বট-পল্লব, বিভিন্ন তাদের আকৃতি। তাঁরা বুদ্ধ আর তাঁর অগ্রগামী ষষ্ঠ বোধিসত্ত্ব, জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সপ্তকল্পে, পরিচিত বিপাশা, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুদচন্দ, কনকমুণি, কশ্যপ আর শাক্যসিংহ নামে। জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বিশ্ববাসীকে জ্ঞানের আলোক দান করবার জন্য। বৌদ্ধ মতে, প্রবল থাকবে শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম পঞ্চ সহস্র বৎসর। প্রবলতম হবে তার পর আবার হিন্দুধর্ম আর্যাবর্তে, বিলুপ্ত হবে বৌদ্ধধর্ম। জন্মগ্রহণ করবেন তখন আর্য-মৈত্রেয়, আর এক বুদ্ধ। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে বৌদ্ধধর্ম, হবে পুনর্জীবিত, ফিরে পাবে লুপ্ত গৌরব। অঙ্কিত দেখি অজন্তার দ্বাবিংশ গুহামন্দিরের ছাদে অনুরূপ সাতটি বুদ্ধ। চিত্রে প্রচারিত হয় বৌদ্ধ মতবাদ।

তোরণের দক্ষিণ পাশেও সপ্ত ধ্যানমৌন বুদ্ধ বসে আছেন। তাঁদের শিরে শোভা পায় ছত্র। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন আদি বুদ্ধের অন্যতম, পরিচিত বীরচনা, অক্ষভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ নামে। পরে বোধিসত্ত্ব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, খ্যাতিলাভ করেছিলেন সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি আর বিশ্বপাণি নামে।

মন্দিরের তোরণের দ্বারে দুই ভীমকান্তি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে, তাদের শিরে শোভা পায় পাগড়ি, দুই হস্ত বক্ষের উপর স্থাপিত। প্রাচীরের প্রান্তদেশে, সুউচ্চ মঞ্চের উপর তিনটি রূপবতী নারী, স্থাপিত তাঁদের দক্ষিণপদ এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। আছেন তাঁদের মধ্যে একজন চতুর্ভুজা, মূর্তি কোন হিন্দু দেবীর। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রেও অনুরূপ একটি মূর্তি দেখি। সকলের হস্তেই শোভা পায় বৌদ্ধ প্রতীক—পুষ্প অথবা বজ্র। তাঁরা পদ্মাসনে বসে আছেন, ধারণ করে আছেন পদ্মগুলি এক একটি নাগিণী, শিরে নিয়ে ফণা। নাগিণীরা মৎস্যের সঙ্গে পদ্মবনে দাঁড়িয়ে আছেন। জলচর পক্ষীও আছে। তাঁদের উপরে প্রতি কক্ষে চারিটি করে বুদ্ধমূর্তি। পশ্চাতের প্রাচীরের দুই প্রান্তেও পাঁচটি করে।

গর্ভগৃহে সিংহাসনে বিরাজ করেন বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে। তাঁর বাম পাশে, পদ্মপাণি, পরিচিত অবলোকিতেশ্বর নামেও, মস্তকে ধারণ করেছেন অমিতাভকে। তাঁর পাশে তিনটি মূর্তি, প্রথমটির হস্তে শোভা পায় পুষ্প, দ্বিতীয়টির একটি গ্রন্থ ও একটি পুষ্প। তৃতীয়টি ধারণ করে আছেন একটি পুষ্পকোরক। বুদ্ধের দক্ষিণ পাশে বজ্রপাণি বিরাজ করেন, পরিচিত মৈত্রেয়ী নামেও। তাঁর হস্তে শোভা পায় বজ্র, কণ্ঠে বহুমূল্য মুক্তার মালা, অনামিকায় হীরের অঙ্গুরী। তিনি একটি পুষ্পবৃন্তে হেলান দিয়ে আছেন। তাঁর পাশেও দেখি কতকগুলি মূর্তি, অনুরূপ এক তলার মন্দিরের ভিতরের মূর্তির।

সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে এক নারী উপবিষ্টা। তাঁর বিপরীত দিকে এক স্থূলকায় পুরুষ, হস্তে নিয়ে মুদ্রাধার। জানুর উপরে স্থাপিত সেই মুদ্রাধারটি। তাঁর পদতলে রক্ষিত একটি কমণ্ডলু, গর্ভে নিয়ে পুষ্পগুচ্ছ। উপরে এক এক দিকে পাঁচটি করে বুদ্ধ উপবিষ্ট, দুই পাশের প্রাচীরের গাত্রে দুইটি করে। অনুরূপ এই বুদ্ধমূর্তিগুলি সভাগৃহের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রের বুদ্ধমূর্তির। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাস্করের এই মহিমময় সৃষ্টি, এই অমর কীর্তি দেখি।

ধীরে ধীরে, একাদশ গুহামন্দির, "দোতলাতে" প্রবেশ করি। বহুদিন পর্যন্ত এই মন্দিরটি ছিল দ্বিতল, তাই পরিচিত দোতলা নামে। পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে এই মন্দিরের সর্ব নিম্নতলে একটি এক'শ দুই ফুট অলিন্দ, একটি গর্ভগৃহ ও দুইটি প্রকোষ্ঠ। গর্ভগৃহে বুদ্ধ বিরাজ করেন, সঙ্গে

নিয়ে পদ্মপাণি আর বজ্রপাণি। বজ্রপাণির দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি বজ্র।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, দ্বিতলে উপনীত হই। সেখানেও অনুরূপ একটি অলিন্দ দেখি। শোভিত হয়ে আছে অলিন্দটি আটটি সুন্দর চতুষ্কোণ স্তম্ভ দিয়ে। রচিত হয়েছে পশ্চাতের দেওয়ালের অঙ্গে পাঁচটি প্রবেশপথ। দ্বিতীয় প্রবেশপথ দিয়ে আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। দেখি, গর্ভগৃহে সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন, এক মহামহিমময় বুদ্ধ। তাঁর দক্ষিণ হস্ত জানুর উপর স্থাপিত, বাম হস্ত স্থাপিত তাঁর অঙ্কে। সিংহাসনের সম্মুখে, জলপাত্র হস্তে, একটি পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশেও একটি সুন্দরী নারী শয়ন করে আছেন। বুদ্ধের বাম পার্শ্বের অনুচরের হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্পগুচ্ছ, তার উপর রক্ষিত একটি বজ্র। তিনিই বজ্রপাণি। তাঁর দুই পাশেও কয়েকটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কারও হস্তে শোভা পায় পুষ্প, কারও ফল। কেউ হস্তে ধারণ করে আছেন পুস্তক। কারও কণ্ঠে শোভা পায় বহু মূল্য জড়োয়ার হার, কারও হস্তে অসি। অনুরূপ "তিন তলার" পুরুষমূর্তির এই মূর্তিগুলি, বসনে আর ভূষণে। এই মূর্তিগুলির উপরে, উপবিষ্ট সপ্তবুদ্ধ। তাঁদের মস্তকের উপরে ছত্রাকারে শোভা পায় এক একটি বট বৃক্ষ।

কেন্দ্র স্থলের প্রবেশপথ অতিক্রম করে আমরা একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপে উপনীত হই। শোভিত হয়ে আছে এই প্রবেশপথটিও দুইটি অপরূপ, সুন্দরতম সুষ্ঠুগঠন স্তম্ভ দিয়ে। শীর্ষদেশে দুইটি গবাক্ষ রচিত হয়েছে। আলোকিত হয়েছে মণ্ডপ। মণ্ডপের প্রান্তদেশে, যোগাসনে বসে আছেন একটি বুদ্ধ। বজ্রপাণিও আছেন হস্তে নিয়ে বজ্র।

অনবদ্য কিন্তু চতুর্থ প্রবেশপথটি, বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, অনুপম অলঙ্করণ। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের। মুগ্ধ বিস্ময়ে, এই প্রবেশপথটির শিল্পসম্পদ দেখে আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করি।

এই গর্ভগৃহেও সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন এক মহিমময় বুদ্ধ। তাঁর পাশে বহু মূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত, আর কণ্ঠে মুক্তার হারে শোভিত পদ্মপাণি।

বজ্রপাণিও আছেন, হস্তে নিয়ে একটি পুষ্প আর গ্রন্থ। উর্ধ্বে সপ্তবুদ্ধ উপবিষ্ট। তাঁদের শিরে শোভা পায় বট-পল্লবের চন্দ্রাতপ।

গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রেও একটি মূর্তি দেখি, তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় বহুমূল্য হার। এক হস্তে তিনি ধারণ করেছেন একটি পুষ্প, অপর হস্তে মুদ্রাধার। পতিত হচ্ছে মুদ্রা ভূমির উপর। তাঁর বিপরীত দিকে একটি সুন্দরী নারী। খুব সম্ভব, তাঁরা এই মন্দিরের রক্ষক আর তাঁর পত্নী।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে তিন তলায় উপনীত হই। নির্মিত হওয়ার কথা ছিল এই তলাটিও দ্বিতলের অনুকরণে। কিন্তু সময় হয় নাই সম্পূর্ণ রূপদানের, রয়ে গিয়েছে অসমাপ্ত অবস্থায়। প্রাচীরের গাত্রে দেখি অনেকগুলি মূর্তি—বিভিন্ন তাদের আকৃতি। এক পাশে বুদ্ধ বসে আছেন, সঙ্গে নিয়ে শুধু দুইজন পার্শ্বচর।

নেমে এসে দশম গুহামন্দির 'বিশ্বকর্মা' দেখতে যাই।

বিশ্বকর্মা একটি চৈত্য বা বৌদ্ধ ধর্মমন্দির। আছে শুধু একটি মাত্র চৈত্য এলোরায়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ চৈত্যের, কিন্তু পড়ে না কার্লির চৈত্যের সমপর্যায়ে, নাই তার অনুপমত্ব ; মহিমময়ত্বও নাই।

একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে চৈত্যটি দাঁড়িয়ে আছে, বেষ্টিত হয়ে আছে অলিন্দ দিয়ে। সেই অলিন্দের স্তম্ভের শীর্ষদেশে কার্নিসের সংযোগস্থলে, পশ্চাদ্ধাবনের দৃশ্য খোদিত হয়েছে।

মন্দিরের ভিতরের কেন্দ্রস্থল আর তার চারিপাশের গলিপথের পরিধি পঁচাশি ফুট দীর্ঘ, তেতাল্লিশ ফুট প্রস্থ, উচ্চতা চৌত্রিশ ফুট। চোদ্দ ফুট উঁচু আটাশটি অষ্টকোণ স্তম্ভ দিয়ে, গলিপথ থেকে কেন্দ্রস্থলকে পৃথক করা হয়েছে। রচিত হয়েছে বন্ধনী স্তম্ভের শীর্ষদেশে। নাই সেই বন্ধনীর অঙ্গে কোন শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধশালী নয় তারা মূর্তি দিয়েও।

মন্দিরের শীর্ষদেশের গ্যালারিটি (মঞ্চটি) প্রবেশপথের দুইটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তম্ভ দুটিও অনবদ্য শিল্পসম্পদ, শীর্ষে নিখুঁত মূর্তিসম্ভার। অনুপম মন্দিরের সম্মুখ ভাগের শিল্পসম্ভারও, ভূষিত সুন্দরতম অলঙ্করণে। অর্ধচন্দ্রাকারে রচিত মন্দিরের

শীর্ষদেশ। তার দু'পাশে, মহাপরাক্রমশালী অশ্বপৃষ্ঠে তিনটি করে জীবন্ত সৈনিক, কেন্দ্রস্থলে প্রবেশপথ। যেমন মহান পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য রূপদান। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের শেষ প্রান্তে সমস্ত মন্দির জুড়ে, মন্দিরের স্তূপ বা দাগোবা (স্মৃতির আধার) দাঁড়িয়ে আছে, মহামহিময় মূর্তিতে, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা আর ছত্র। ব্যাস তার সাড়ে পনর ফুট, উচ্চতা সাতাশ ফুট। রচিত হয়েছে সতের ফুট উঁচু দাগোবার সম্মুখ ভাগ। তার অঙ্গে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান। শোভিত খিলানের অঙ্গ বটপল্লব আর বিভিন্ন আকৃতির গন্ধর্বের মূর্তি দিয়ে। সেই সুন্দরতম চন্দ্রাতপের নীচে এগার ফুট উঁচু মহামহিময় বুদ্ধ উপবিষ্ট, প্রসারিত তাঁর পদযুগল। সঙ্গে নিয়ে আছেন বুদ্ধ তাঁর সহচরবৃন্দ, পদ্মপাণি, বজ্রপাণি। দেখি স্তব্ধ হয়ে।

দেখি ছাদের নির্মাণ পদ্ধতি আর তার অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণ। খিলানের আকৃতিতে নির্মিত মন্দিরের অর্ধগোলাকৃতি ছাদটি। কেন্দ্রস্থলে একটি শিরদাঁড়া। যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে দুই প্রান্ত থেকে বহু শিরা, নির্গত সেগুলি পর্যায়ক্রমে এক একটি নাগ ও নাগিণীর বক্ষ থেকে। রচিত হয়েছে স্তম্ভের শীর্ষদেশে, কানিসের নীচে, প্রাচীরের গাত্রে সুপ্রশস্ত পাড়। বিভক্ত সেই পাড় দুই অংশে। শোভিত অগভীর নিম্নাংশ গণমূর্তি দিয়ে। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিচিত্র তাদের অঙ্গের গঠন। উর্ধ্বাংশে রচিত হয়েছে বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে বুদ্ধ বিরাজ করেন, সঙ্গে নিয়ে দুজন বোধিসত্ত্ব আর অনুচরবর্গ। বিভক্ত গ্যালারির অন্তরতম প্রদেশও তিনটি প্রকোষ্ঠে। অলঙ্কৃত এই প্রকোষ্ঠ তিনটিও অসংখ্য মূর্তিসম্ভার দিয়ে। অনবদ্য, সুন্দরতম তাদের গঠনসৌষ্ঠব, জীবন্ত। দেখে মুগ্ধ হই।

সম্মুখের অলিন্দের প্রান্তদেশে দেখি, রচিত দুইটি মন্দির, সঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রকোষ্ঠ। সেই সব মন্দিরে আর প্রকোষ্ঠেও কত বুদ্ধ শোভা পান, সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব আর পার্শ্বচর। মহিমময় এই মূর্তিগুলি ও জীবন্ত।

উত্তরের অলিন্দের প্রান্তদেশের, সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, উপরের গ্যালারিতে উপনীত হই। দেখি, দুই অংশে বিভক্ত এই গ্যালারিটিও। বহিরাংশে রচিত সম্মুখের অলিন্দের উপরিভাগ, ভিতরাংশে, সম্মুখের গলিপথের দ্বিতল। অপরূপ সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয়েছে এই অংশ

দুইটিও, রচিত হয়েছে তিনটি গবাক্ষ, প্রবেশপথ আলোবাতাসের। ব্যতিক্রম কার্লি ও ভাজার গবাক্ষের, রচিত হয় সেখানে একটি মাত্র বৃহৎ, অর্ধাচন্দ্রাকৃতি চৈত্যগবাক্ষ।

আমরা বাইরের মঞ্চ অতিক্রম করে ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি, শোভিত মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রও, বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী দিয়ে। মূর্তি দিয়ে রচিত সেই সব কাহিনী। নিখুঁত এই মূর্তিগুলিও—জীবন্ত। দেখি নারীর কত বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশবিন্যাসও। শ্রেষ্ঠ প্রতীক বৌদ্ধভাস্কর্যের এই মূর্তিগুলি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

গবাক্ষের দক্ষিণে মন্দিরের উপরিভাগেও অনেকগুলি গণমূর্তি দেখি। অপরূপ তাদের গঠনসৌষ্ঠবও। শোভিত দেখি মন্দিরের শীর্ষদেশে, উদ্গত পাড়ের অঙ্গ দুইটি মহিমময়, জোড়া মূর্তি দিয়ে। অনুরূপ এই মূর্তিগুলি প্রকোষ্ঠের ভিতরের জোড়া মূর্তির, শ্রেষ্ঠদান বৌদ্ধভাস্করের, এক পরমাশ্চর্য সৃষ্টি, এক মহাগৌরবময় যুগের। তাই আসেন এখানে দেশবিদেশ থেকে শিল্পী, স্থপতি আর ভাস্করও সমাগত হন, নিবেদন করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি বিশ্বকর্মারূপী বুদ্ধকে। আমরাও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নবম গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। অনবদ্য এই মন্দিরের সম্মুখভাগের শিল্পসম্পদও। রচিত হয় একটি সুন্দর ব্যাল্‌কনি, মন্দিরের বাইরের দিকে, ভিতরের দিকে একটি আচ্ছাদিত অলিন্দ, সংযোগস্থলে দুইটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। চতুষ্কোণ তাদের নিম্নাংশ, অষ্টকোণ উপরাংশ, শীর্ষদেশ নির্মিত আনমিত কর্ণের আকারে। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে তিনটি প্রকোষ্ঠ দেখি। কেন্দ্রস্থলটিতে বুদ্ধ বিরাজ করেন। তাঁর মস্তকের উপর গন্ধর্বেরা ও বামে পদ্মপাণি, সঙ্গে নিয়ে এক রূপবতী যুবতী আর দুজন গন্ধর্ব। দক্ষিণে বজ্রপাণি তাঁর সঙ্গেও দুজন রূপসী।

নবম মন্দির দেখে অষ্টম গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। এই মন্দিরেও দুটি প্রকোষ্ঠ ও একটি গর্ভগৃহ দেখি। ভিতরে একটি আটাশ ফুট দীর্ঘ, পঁচিশ ফুট প্রস্থ সভাগৃহ, বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ ও একটি প্রদক্ষিণের পথ। মন্দিরের দ্বারে দ্বারপাল। গর্ভগৃহে বেদীর উপর বুদ্ধ উপবিষ্ট, সঙ্গে নিয়ে

অনুচরবৃন্দ। তাঁর দক্ষিণে চতুর্ভুজ পদ্মপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর এক হস্তে চামর, অপর হস্তে পদ্ম, দক্ষিণ স্কন্ধে একটি অজিনাসন। পদতলে ভক্তবৃন্দ বসে আছে। পশ্চাতে একটি ক্ষীণাঙ্গী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে পুষ্প। তার মস্তকের উপর একটি গন্ধর্ব বসে। বুদ্ধের বামে বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে নিয়ে অনুরূপ সহচরবৃন্দ। প্রদক্ষিণের পথে, প্রাচীরের গাত্রে একটি অপরূপ সরস্বতী মূর্তি দেখি। বিপরীত দিকে একটি প্রকোষ্ঠ। আরও দুইটি প্রকোষ্ঠ পথের উপর নির্মিত হয়েছে। দেখি একটি বৃহৎ কুলুঙ্গী ও মন্দিরের পশ্চাৎভাগেও, তার সামনে দুইটি সুন্দরতম চতুষ্কোণ স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ।

বাইরের কক্ষটি একটি ঈষৎ উঁচু ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পরিধি তার আটাশ ফুট দীর্ঘ, সতের ফুট প্রস্থ। কক্ষের উত্তর প্রান্তে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে।

তার কেন্দ্রস্থলে একটি বেদী। বেদীর সম্মুখে দুইটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ। মন্দিরের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, দেখি, বুদ্ধ বসে আছেন। সঙ্গে আছেন অনুচরবর্গ, সজ্জিত তাঁরাও অনুরূপ বসনে আর ভূষণে। বুদ্ধের বাম পাশে, বজ্র হস্তে বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, পশ্চিমের প্রাচীরের গাত্রে পদ্মপাণি, সঙ্গে নিয়ে এক পরমা রূপবতী নারী।

একটি বৃহৎ ছিদ্র দিয়ে একটি উন্মুক্ত অঙ্গণে প্রবেশ করে দেখি, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কতকগুলি পুরুষ ও নারী মূর্তি।

অষ্টম গুহামন্দির দেখে আমরা সপ্তমে প্রবেশ করি। সাড়ে একান্ন ফুট দীর্ঘ আর সাড়ে তেতাল্লিশ ফুট গভীর এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ। তার দুই পাশও তিনটি করে প্রকোষ্ঠ দিয়ে বেষ্টিত। দাঁড়িয়ে আছে বিহারটি চারিটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর। নাই কোন শিল্পসম্ভার তাদের অঙ্গে, মন্দিরের গাত্রেও নাই।

সেখান থেকে আমরা ষষ্ঠ গুহামন্দিরে উপনীত হই। একটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, আমরা উপস্থিত হই সভাগৃহে। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই কক্ষটির পশ্চিমাংশ, পূর্বাংশে একটি প্রকোষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরাংশেও ছিল একটি সুউচ্চ সভাগৃহ, পৃথক করা হয়েছিল দুইটি স্তম্ভ ও অনেকগুলি উদ্গত স্তম্ভ

দিয়ে। অবশিষ্ট আছে শুধু একটি স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভগুলি। কেন্দ্রস্থলেও একটি সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে, পরিধি তার তেতাল্লিশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে ছাব্বিশ ফুট প্রস্থ। ভিতরেও একটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছে, তার সম্মুখে দুইটি অপরূপ চতুষ্কোণ স্তম্ভ। উত্তরাংশে একটি সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে, পরিধি তার সাতাশ ফুট প্রস্থ, উনত্রিশ ফুট দীর্ঘ। অনুরূপ এই সভাগৃহটি দক্ষিণাংশের সভাগৃহের, বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ।

দেখি, মন্দিরের সম্মুখের মণ্ডপে বহু মূর্তি। উত্তর প্রান্তে দেখি, পদ্মপাণির বেশে সজ্জিত একটি রূপবতী নারী। দ্বারপালে পরিণত হয়েছেন পদ্মপাণি, দাঁড়িয়ে আছেন উত্তরের দ্বারে। প্রহরী তিনি মন্দিরের উত্তর দ্বারের। দক্ষিণদ্বারে একটি পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর বাম হস্তে ধৃত একটি ময়ূর, খুব সম্ভব, তিনিই বিদ্যাদায়িনী স্বরস্বতী। তাঁদের পাশে তাঁদের অনুচরবর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মস্তকের উপর বটপল্লব, তাদের ফাঁকে ফাঁকে এক একটি রূপবতী নারী। অনবদ্য এই মূর্তিগুলির গঠনসৌষ্ঠব, জীবন্ত, শ্রেষ্ঠদান, বৌদ্ধ ভাস্করের অমর কীর্তি। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে, মহামহিমময় মূর্তিতে বুদ্ধ উপবিষ্ট সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব আর অনুচরবর্গ। দুই প্রাচীরের গাত্রেও, তিন সারিতে বুদ্ধ বসে আছেন, উর্ধ্বে প্রক্ষীপ্ত তাঁদের পদযুগল। প্রতি সারিতে তিন জন করে বসে আছেন। তাঁদের পদতলে, ভক্তের দল। তুলনাহীন এই মূর্তিগুলিও, প্রতীক এক গৌরবময় সৃষ্টির, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের।

ষষ্ঠ গুহামন্দির দেখে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পঞ্চম গুহামন্দিরের সামনে উপনীত হই। পরিচিত এই মন্দিরটি মারোয়ারা নামেও। কয়েকটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে একটি একশ সতের ফুট গভীর, আটান্ন ফুট প্রস্থ সভাগৃহে প্রবেশ করি। তার দু'পাশে কুলুঙ্গির আকারে নির্মিত হয়েছে দুইটি প্রকোষ্ঠ নিভৃতস্থল বিহারের। বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি, দুই সারিতে চব্বিশটি সুন্দরতম স্তম্ভ। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি থাকে থাকে আসন। স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি অনুচ্চ প্রস্তরের বেদী নির্মিত হয়েছে, রচিত হয়েছে কুড়িটি প্রকোষ্ঠও। খুব সম্ভব ছিল এই বিহারটি বৌদ্ধশ্রমণদের বিদ্যামন্দির। এই বেদীর উপর পুস্তক স্থাপন করে, বিদ্যার্থীরা

নিযুক্ত থাকতেন পাঠে। প্রবেশপথে একটি উপাসনা মন্দির, তার ভিতরে বুদ্ধ বসে আছেন। বিহারের পিছনে, মন্দিরের মধ্যেও উপবিষ্ট বুদ্ধ, মহিমময় মূর্তিতে সঙ্গে নিয়ে অনুচরবর্গ। দ্বারের দু'পাশে, খিলানের আকৃতিতে রচিত কুলুঙ্গির মধ্যেও বুদ্ধ অনুচরবর্গ নিয়ে বসে আছেন। উত্তরের কুলুঙ্গির ভিতরে পদ্মপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে নিয়ে আছেন দুই রূপবতী নারী। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ। দ্বিতীয় কুলুঙ্গির ভিতরে বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, সজ্জিত তিনিও বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে। তাঁর সঙ্গেও দুই পরমা রূপবতী নারী। মেঘের অন্তরাল থেকে গন্ধর্বেরা মালা হস্তে উড়ে আসছেন, পরাবেন সেই মালা তাঁদেব কণ্ঠে।

পঞ্চম গুহামন্দির দেখে, আমরা চতুর্থ গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। প্রাচীনতম বৌদ্ধ গুহামন্দিরের অন্যতম এই মন্দিরটি, অর্ধভগ্নাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। উনচল্লিশ ফুট গভীর, আর পঁয়ত্রিশ ফুট প্রস্থ অই মন্দিরটি, তার উত্তরপ্রান্তে, পদ্মপাণি বসে আছেন এক মহিমময় মূর্তিতে। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, বিরাজ করেন তার উপরে অমিতাভ। তাঁর বিশাল স্কন্ধের উপর স্তরে স্তরে নেমে এসেছে তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি। তাঁর বাম স্কন্ধে স্থাপিত একটি অজিনাসন, দক্ষিণ হস্তে মালা, বামে পদ্ম। তার দুই পাশে দুই পরমা রূপবতী নারী উপবিষ্টা, হস্তে নিয়ে মাল্য আর পদ্মের কোরক। পদ্মপাণির মস্তকের উপর বোধিসত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছেন, নারীদের মস্তকের উপর বুদ্ধ, হস্তে নিয়ে পদ্মফুল।

মূর্তিগুলি দেখে পশ্চাতের প্রাচীরের প্রবেশ পথ দিয়ে একটি প্রকোষ্ঠে উপনীত হই। দেখি দ্বারপালদের শিরোভূষণ, তাদের পাশে একটি বামনের মূর্তি। প্রকোষ্ঠ দেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি প্রচারকের মূর্তিতে বুদ্ধ সিংহাসন অলংকৃত করে আছেন। তাঁর মস্তকের উপর একটি বটপল্লব। বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে সজ্জিত হয়ে অনুচরবর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। দক্ষিণের প্রকোষ্ঠেও অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি দেখি। তাঁদের মধ্যে সপারিষদ বুদ্ধ আছেন, আছেন পদ্মপাণিও।

সেখান থেকে তৃতীয় গুহামন্দির দেখতে যাই। কিছুদূর এগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে একটি বিহারে উপনীত হই। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছেচল্লিশ ফুট,

উচ্চতায় এগার ফুট, বুকে নিয়ে আছে বারটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ। বিলম্বিত তাদের শীর্ষদেশের আনমিত কর্ণ, তাদের বৃত্তাকার স্কন্ধের উপর। অষ্টকোণ তাদের মধ্যে তিনটির স্কন্ধ। অপরূপ তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ—সুন্দরতম। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখি, রচিত হয়েছে বারটি প্রকোষ্ঠও, দুই পাশে পাঁচটি করে, বাসস্থান শ্রমণদের, পশ্চাতে দুইটি। পশ্চাতের প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে গর্ভগৃহ।

দেখি, উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে দুইটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি। প্রবেশপথের উত্তরে, দুইটি স্তম্ভের শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে গবাক্ষ, পদ্মপুষ্পে শোভিত তার অঙ্গ। উত্তর প্রান্তে, উপাসনা গৃহ। তার অভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর পদ্মাসনে বুদ্ধ বসে আছেন। শিরে ধারণ করে আছে সেই পদ্মটি নাগ আর নাগিনীরা, তাদের কারও শিরে শোভা পায় তিনটি ফণা, কারও পাঁচটি, কেউ সপ্তফণাযুক্ত। বুদ্ধের দুই পাশে, দুই চামরধারী দাঁড়িয়ে আছেন। সজ্জিত তাঁরাও বহুমূল্য শিরোভূষণে। থাকে থাকে বিলম্বিত তাঁদের বক্ষের উপর তাঁদের স্খলিত কুণ্ডল। তাঁদের হস্তে পদ্মফুল, মস্তকের উপর গন্ধর্বের দল।

দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে বিরাজ করেন পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর, বিভিন্ন মূর্তিতে। দেখি অগ্নিকে, নিযুক্ত পদ্মপাণির উপাসনায়। দেখি এক মহাপরাক্রমশালী দেবতা, দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মপাণির সম্মুখে, হস্তে নিয়ে অসি। অবনত তাঁর শির। বামেও তপস্যায় নিযুক্ত এক ব্যক্তিকে দেখি; তাঁর পশ্চাতে একটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। দেখি অনুরূপ অপর দুই ব্যক্তিকেও। তাঁদের এক জনের পিছনে ফণা বিস্তার করে দুইটি সর্প দাঁড়িয়ে আছে, অন্যটির পশ্চাতে একটি ক্রুদ্ধ হস্তী। মহাকালীকেও দেখি। উদ্যত মহাকালী বুদ্ধ ভক্তের উৎপীড়নে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই মূর্তিগুলি, পরমাশ্চর্য সৃষ্টি—বৌদ্ধ ভাস্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

তৃতীয় গুহামন্দির দেখে আমরা দ্বিতীয় গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। অলিন্দে উপনীত হই। দেখি, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ, অলঙ্কৃত তাদের সম্মুখ ভাগ গণমূর্তি দিয়ে। বিভিন্ন তাঁদের রূপ। অলিন্দের উত্তর প্রান্তে একটি স্থূলকায় পুরুষ উপবিষ্ট, তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট, কণ্ঠে মূল্যবান জড়োয়ার হার, হস্তে পুষ্পগুচ্ছ। সঙ্গে আছেন চামরধারী, হস্তে নিয়ে চামর। তাঁদের দক্ষিণে, বামে, পারিষদবর্গ বসে আছেন। তাঁদের

সঙ্গেও আছেন চামরধারীর দল। দক্ষিণ প্রান্তে অনুরূপ একটি নারীমূর্তি, সঙ্গে নিয়ে পরিচারিকা, তার শিরে শোভা পায় একটি মালা, হস্তে গন্ধর্ব। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী তাঁরা, এই মন্দিরের স্রষ্টা ও তাঁর পত্নী। দ্বারে, দুই বিশালকায় দ্বারপাল দণ্ডায়মান। তাদের শিরেও শোভা পায় শিরোভূষণ। তাদের মস্তকের উপর গন্ধর্বেরা। একটি নারী সমস্ত প্রবেশপথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয়েছে একটি দ্বার ও দুইটি গবাক্ষ। দ্বারের পাশ, গবাক্ষের তাক, আর প্রাচীরের সারা গাত্র পরিপূর্ণ বুদ্ধমূর্তি দিয়ে। দুই পাশে দুইটি মঞ্চ বা গ্যালারি। আটচল্লিশ ফুট চৌরস পরিধি এই মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে বারটি বৃহৎ চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর। নির্মিত স্তম্ভের শীর্ষদেশে চতুষ্কোণ প্রস্তরের আসন, স্থাপিত তাদের পাদদেশ সুউচ্চ বেদীর উপর, বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলির অঙ্গ আর তাদের শীর্ষদেশ, আর বেদীর চারিপাশ, অনুপম শিল্পসম্ভার, ভাস্করের বহু সাধনার দান, প্রতীক চরম উৎকর্ষের। শোভিত হয়ে আছে দু'পাশের গ্যালারির সম্মুখ ভাগও চারিটি করে স্তম্ভ দিয়ে, বিভিন্ন তাদের আকার, বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতি আর অঙ্গের অলঙ্করণ। বিভিন্ন প্রকারের লতাপুষ্প, গায়ক-গায়িকা আর বামনের মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে গ্যালারির সম্মুখ ভাগও। পশ্চাতের পাঁচটি কক্ষে, পঞ্চ বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে বসে আছেন। সঙ্গে নিয়ে আছেন চামরধারীর দল, হস্তে নিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম। মন্দিরের ভিতরেও দেখি, উপবিষ্ট এক বিশালকায় বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে চামরধারী। তাঁদের এক জনের দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্ম।

মন্দিরের দ্বারে তের ফুট উঁচু দুই অতিকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। বাম পাশেরটির পরিধানে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি, শিরে জটা, স্থাপিত সেই জটার উপর অমিতাভ বুদ্ধের ক্ষুদ্রমূর্তি। তার দক্ষিণ হস্তে একটি মালা, বাম হস্তে পদ্ম। ভূষিত দ্বিতীয় দ্বারপালটি মহামূল্য পরিচ্ছদে। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার শিরোভূষণ, তার উপরে একটি দাগোবা বা স্তূপ। তাঁর বাহুতে বহুমূল্য অনন্ত আর তাগা, মণিবন্ধে কঙ্কণ, কণ্ঠে মূল্যবান মণিমুক্তা-খচিত হার। হস্তে ধারণ করে আছেন তিনি একটি পুষ্পগুচ্ছ। তাঁদের উপরে, মালা হস্তে উড্ডীয়মান গন্ধর্বের দল। দ্বার ও দ্বারপালের মধ্যস্থলে

দাঁড়িয়ে আছেন একটি পরমা রূপবতী নারী, যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত তাঁর বক্ষ, তাঁর হস্তে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম।

মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন এক অতিকায় বুদ্ধ, প্রশান্ত তাঁর মূর্তি। স্থাপিত সিংহাসনটি চারিটি কেশরযুক্ত সিংহের মস্তকের উপর। দাঁড়িয়ে আছে তারা চারি কোণে। স্থাপিত বুদ্ধের পদদ্বয় একটি বৃত্তাকার বেদীর উপর। স্পর্শ করে আছেন বুদ্ধ তাঁর বাম হস্তের অনামিকা, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী দিয়ে। রূপ ধারণ করেছেন তিনি প্রচারকের। তাঁর মস্তকের কুঞ্চিত কুন্তলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ অর্ধাবৃত করেছে তাঁর মসৃণ ললাট। তাঁর মস্তকের চতুষ্পার্শ্ব থেকে নির্গত হচ্ছে জ্যোতি, উদ্ভাসিত হচ্ছে সারা মন্দির সেই জ্যোতির আলোকে। জ্যোতির পাশে গন্ধর্বের দল দাঁড়িয়ে আছে। সিংহাসনের দুই প্রান্তেও দুই চামরধারী দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে চামর। অনুরূপ বাইরের দ্বারপালও, আকৃতিতে অঙ্গের প্রসাধনে আর ভূষণে। প্রাচীরের গাত্রেও দুই বিশালকায় বোধিসত্ত্ব শোভা পান। বিলম্বিত তাঁদের দক্ষিণ হস্ত, প্রসারিত করতল। বাম হস্তে ধারণ করে আছেন তাঁরা অঙ্গের বসন। প্রান্তদেশে, চারি পূজারী পূজা করেন বুদ্ধকে।

দেখি মন্দিরের দুই পাশেও দুইটি করে যুগল কক্ষ, নির্মিত পাশের গলির সমান্তরালে। বাইরের প্রকোষ্ঠে আর সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে দেখি অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি। দেখি, বুদ্ধ বসে আছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে, সঙ্গে নিয়ে অনুচরবৃন্দ। মন্দিরের দ্বারপালের বিপরীত দিকেও এক পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন, সজ্জিত হয়ে আছেন মূল্যবান অলঙ্কারে। তাঁর মস্তকে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট হস্তে পদ্ম। সঙ্গে আছে পরিচারিকার দল। তাঁদের হস্তেও শোভা পায় পদ্ম। খুব সম্ভব ইনি মায়া, বুদ্ধজননী, হতে পারেন বুদ্ধের পত্নী যশোধরাও, কোন বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর—অথবা পদ্মপাণি। হতে পারেন অমিতাভও। তাঁদের সকলের প্রতীক ধারণ করে আছে এই মূর্তি।

এলোরার প্রাচীনতম গুহামন্দিরের অন্যতম এই মন্দিরটি, নির্মাণ সুরু হয় এই মন্দিরের খুব সম্ভব তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে, সমাপ্ত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, তুলনাহীন এই মন্দিরের শিল্পসম্পদ, অনবদ্য জীবন্ত এই মন্দিরের মূর্তিগুলি নিদর্শন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যেরও। সৃষ্টি এক

মহাগৌরবময় যুগের। স্থপতি আর ভাস্করকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ধীরে ধীরে মন্দির থেকে নির্গত হয়ে প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হই।

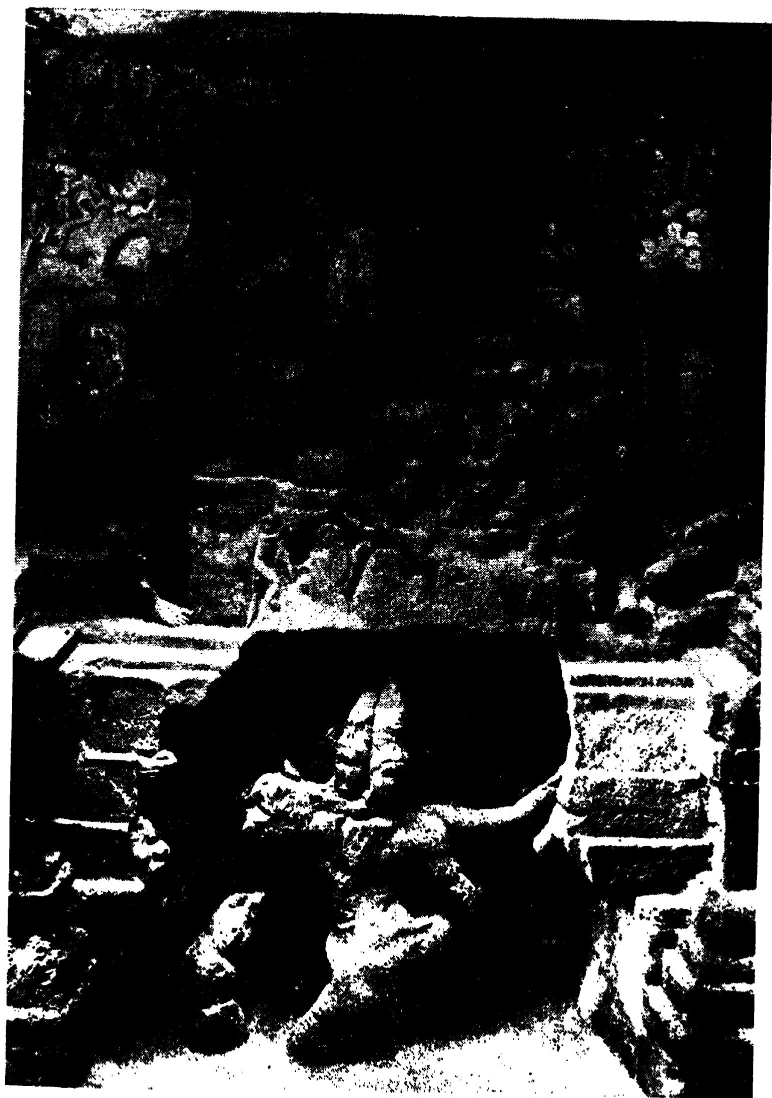
প্রাচীনতম বৌদ্ধ গুহামন্দির এলোরার, নাই এই মন্দিরে স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, নাই শিল্পসম্ভারও। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি একচল্লিশ ফুট প্রস্থ, বিয়াল্লিশ ফুট পরিধি নিয়ে। ছিল এই মন্দিরে (বিহারে) বৌদ্ধশ্রমণদের বাসের জন্য আটটি প্রকোষ্ঠ, এখন অবশিষ্ট আছে শুধু একটি মাত্র স্তম্ভ।

পরিসমাপ্তি হয় বৌদ্ধ গুহামন্দির দর্শনের। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা ও জলযোগ সমাপন করি। তার পর, প্রতীক্ষমান ট্যাক্সিতে চড়ে ষোড়শ গুহামন্দির কৈলাসের সামনে উপনীত হই। ট্যাক্সি থেকে নেমে, গভীর সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করে, সপ্তদশ গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রথিত ছিল এই মন্দিরটি, ছয় ফুট গভীর মৃত্তিকার অন্তরালে দৃশ্যমান ছিল শুধু তার স্তম্ভের শীর্ষদেশ। পরিচিত এই মন্দিরটিও ডুমারলেনা নামে।

শৈব মন্দির, বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি তিন সারি স্তম্ভের শ্রেণী, প্রতি সারিতে চারিটি করে, বিস্তৃত হয়ে আছে চৌষট্টি ফুট দীর্ঘ সাঁইত্রিশ ফুট গভীর পরিধি নিয়ে। মন্দিরের সামনে দুইটি বিশাল স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি তোরণ। ভগ্ন তাদের মধ্যে একটি স্তম্ভ। আচ্ছাদিত অলিন্দ দিয়ে বেষ্টিত মন্দিরের প্রাঙ্গণের তিন দিক, কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বার। অলিন্দের দুই প্রান্তে দুইটি প্রকোষ্ঠ, অলঙ্কৃত মূর্তি দিয়ে। দক্ষিণেরটিতে খোদিত হয় ব্রহ্মার মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে দুই নারী সহচরী। মেঘের অন্তরালে দুইটি গন্ধর্ব উপবিষ্ট। উত্তরেরটিতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে নারী পরিচারিকা।

নাই কোন শিল্পসম্ভার প্রান্তদেশের চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলির অঙ্গে, শীর্ষে নিয়ে আছে তারা শুধু বন্ধনী। কেন্দ্রস্থলের স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গে রচিত হয় স্থূলকায় বামনের মূর্তি, মূর্তি কত নারীরও। দেখি, একটি স্তম্ভের অঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী বিপরীত দিকে একটি পুরুষ। প্রতীক এই স্তম্ভটি দ্রাবিড় স্তম্ভের। অতিকায় এই স্তম্ভগুলি, নয় শোভন, সুন্দর দর্শন।

দ্রাবিড় পদ্ধতিতে অলঙ্কৃত, মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার, পর্যাপ্ত এই অলঙ্করণ। দ্বারে দুই দ্বারপাল দণ্ডায়মান, হস্তে নিয়ে পুষ্প, সঙ্গে নিয়ে আছে দ্বারপালেরা,



রাবণের কৈলাস উত্তোলন

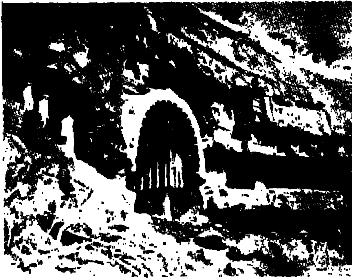
কৈলাস : এলোরা



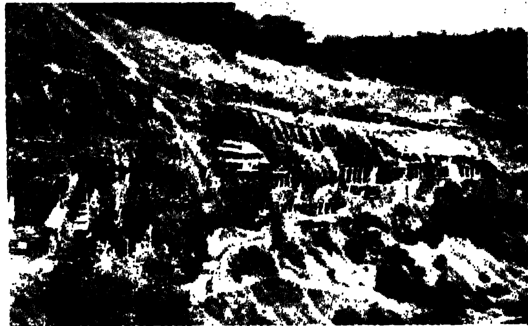
কার্লি : সম্মুখভাগ



কার্লি : অভ্যন্তর



ভাজা গুহা



অজন্তা : গুহাবলী

বামন আর গন্ধর্ব, তাদের অনুচর। গর্ভগৃহে, বেদীর উপর একটি অর্ধভগ্ন শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন। গর্ভগৃহের প্রাচীরের গাত্রে, সামনের গলিপথের দক্ষিণ প্রান্তে, একটি মহিষাসুরীর মূর্তি দেখি, উত্তর প্রান্তে একটি চতুর্ভূজ গণপতির। মহামহিমময় এই মূর্তি দুইটি—জীবন্ত।

সপ্তদশ গুহামন্দির দেখে, আমরা অষ্টাদশে প্রবেশ করি। দাঁড়িয়ে আছে অষ্টাদশ, একটি শৈব মন্দির, সপ্তদশের নিকটে, বিস্তৃত হয়ে আছে সাতষট্টি ফুট দীর্ঘ, পঞ্চান্নফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, সামনে নিয়ে আছে চারিটি অর্ধ সমাপ্ত কুৎসিত-দর্শন স্তম্ভ, দুই পাশে দুইটি গভীর কুলুঙ্গি, উপনীত হয় সেই কুলুঙ্গি মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে। মণ্ডপের পশ্চাতে গর্ভগৃহের সম্মুখে, নির্মিত হয় একটি তোরণ, আয়তন তার ত্রিশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে দশ ফুট প্রস্থ। নির্মিত হয় দুইটি স্তম্ভ তোরণের সম্মুখেও। নাই কোন শিল্পসম্পদ গর্ভগৃহের প্রাচীরের গাত্রে, নিরাভরণ স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভগুলিও। গর্ভগৃহের ভিতরে বৃত্তাকার বেদীর উপর মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন। বাইরে হোমকুণ্ডের পাশে, বাহন নন্দী—দেবতার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা ঊনবিংশতি গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম প্রাচীনতম গুহামন্দির এলোরার, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তার ছাদের অর্ধাংশ, নিশ্চিহ্ন হয়েছে সম্মুখের স্তম্ভগুলিও। দাঁড়িয়ে আছে কুলুঙ্গির সামনে শুধু চারিটি স্তম্ভ, গর্ভগৃহের সম্মুখেও চারিটি। তারা অন্ধ আর অসম্পূর্ণ, অনুকরণ এলিফ্যাণ্টার স্তম্ভের।

কিছুদূর আরোহণ করে, আমরা বিংশতি গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। এই মন্দিরের বিগ্রহও একটি শিবলিঙ্গ। অলঙ্কৃত মন্দিরের সম্মুখ ভাগের উত্তর দিক গণপতির মূর্তি দিয়ে, দক্ষিণ দিক মহিষাসুরীর। দেখি, নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই মন্দিরের সম্মুখভাগের দুইটি স্তম্ভই। গর্ভগৃহের চতুর্দিকে রচিত হয় সুপ্রশস্ত প্রদক্ষিণের পথ, দুই প্রবেশ পথে, দুইটি সুপ্রশস্ত কক্ষ; সামনের দিকে দুইটি করে স্তম্ভ, চতুষ্কোণ তাদের নিম্নাংশ অষ্টকোণ গ্রীবা। বিস্তৃত হয়ে আছে সমস্ত মন্দিরটি তিপ্পান্ন ফুট দীর্ঘ আর ত্রিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে।

বিভিন্ন সুন্দরতম লতা পল্লব দিয়ে অলঙ্কৃত করেন এলোরার মহা অভিজ্ঞ ভাস্কর গর্ভগৃহের দ্বার। দ্বারের দুই পাশে দুই দীর্ঘকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে

আছেন, সঙ্গে নিয়ে আছেন এক একটি ক্ষুদ্রকায়া নারী। দেখি মুগ্ধ হয়ে। নিকটবর্তী একবিংশতি গুহামন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি মহামহিমময় মূর্তিতে, একটি শোভন গঠন, সুবৃহৎ মঞ্চের অন্তরালে।

অন্যতম প্রসিদ্ধ হিন্দু, শৈব মন্দির এলোরার পরিচিত রামেশ্বরম নামেও। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দেখি, একটি মণ্ডপের মধ্যে, মঞ্চের উপর, দেবতার বাহন নন্দী (বৃষ) বসে আছেন।

দেখি, উত্তরে একটি মন্দিরের মধ্যে, মহামহিমময় মূর্তিতে গণপতি উপবিষ্ট। মন্দিরের সম্মুখে দুইটি সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত স্তম্ভ। গণপতির এক পাশে মকর-বাহনে এক দীর্ঘাঙ্গী নারী, সঙ্গে নিয়ে চামরধারিণীরা। বামন আর গন্ধর্বেরাও আছেন। বিপরীত দিকেও, কূর্মের পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপ একটি নারী।

স্তম্ভ দুটিকে সংযুক্ত করে রচিত হয়েছে একটি প্রস্তরের পর্দা, আবৃত হয়ে আছে স্তম্ভগুলির অর্ধাংশ। রচিত হয়েছে স্তম্ভের শীর্ষদেশে কমণ্ডলু, তাদের গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে পুষ্পবৃক্ষ। অবনত তাদের পল্লব, স্পর্শ করেছে দুপাশের মৃত্তিকা, প্রণতি জানাচ্ছে ধরিত্রী দেবীকে। পল্লবের নীচে এক গর্বিতা নারী মূর্তি সঙ্গে নিয়ে বামন। স্তম্ভের শীর্ষ দেশে বন্ধনীর অঙ্গে দানবের মূর্তি, তাদের মস্তকে শোভা পায় শৃঙ্গ। কার্নিশের নীচে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। বিরাজ করেন সেই প্রকোষ্ঠে গণদেবতা।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। সুপ্রশস্ত এই সভাগৃহটি, পরিধি তার উচ্চতায় ষোল ফুট, দৈর্ঘ্যে দু'শ একান্ন আর প্রস্থে উনসত্তর ফুট। সভাগৃহের দুই পাশে দুইটি উপাসনা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, পৃথক করা হয়েছে তাদের আসনশীর্ষ স্তম্ভ দিয়ে। অপরূপ এই স্তম্ভগুলি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম, আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে উপাসনা মন্দিরের চতুর্দিক।

দেখি দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে এক ভীষণদর্শন কঙ্কাল মূর্তি। নিবদ্ধ তার দৃষ্টি, পশ্চাতে অবস্থিত কালীমূর্তির দিকে। আকর্ষণ করে আছেন কালী তার কেশাগ্র। কালীর কণ্ঠে সর্পের মালা। তাঁর পশ্চাতে আরও একটি নারী

কঙ্কাল মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বেষ্টন করে আছে তার কণ্ঠদেশেও একটি সর্প। দাঁড়িয়ে দেখছি এই দৃশ্য। বীভৎস এই দৃশ্য, কল্পনাতীত!

মহাকালের সম্মুখে একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, পূজারীর ভঙ্গিতে। মিনতি জানাচ্ছে মহাকালকে।

দেখি, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে গণপতির মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে চতুর্ভুজা সপ্ত মাতা। অনুরূপ এই মূর্তিটি দশ অবতারের মূর্তির।

পূর্ব প্রান্তে নৃত্যপরায়ণ অষ্টভুজ শিব, নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়ে আছেন নটরাজন। মেঘের অন্তরালে দেবতারা বিরাজ করেন। কেউ ময়ূর বাহনে, কেউ হস্তী, কেউ বৃষ কেউ বা গরুড় বাহনে। দর্শন করেন এই দৃশ্য। দেখেন পার্বতীও, এই তাণ্ডব নৃত্য, সঙ্গে নিয়ে চার পরিচারিকা আর সঙ্গীতজ্ঞের দল। নৃত্য করেন মহাদেব—তাঁর পদতলে ক্ষুদ্রকায় ভৃঙ্গী।

উত্তরের উপাসনা মন্দিরের বাম প্রান্তে একটি দীর্ঘ মূর্তি দেখি। তাঁর এক হস্তে শোভা পায় একটি চিক, অপর হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি পক্ষীর স্কন্ধ। তাঁর দুই পাশে, দুই মেষ।

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে দেখি, সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন ব্রহ্মা। তাঁর সামনে ভূতলে জোড়াসনে উপবিষ্ট একটি পুরুষ। তার পিছনে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে।

হরপার্বতীর বিবাহের দৃশ্য দেখি। বাম প্রান্তে হোমাগ্নি সামনে নিয়ে ব্রহ্মা উপবিষ্ট। বিপরীত দিকে এক দীর্ঘশ্মশ্রু মুনি। তাঁর পশ্চাতে দুজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে হস্তে নিয়ে আছেন একজন একটি আধার। তারপর, উমা সঙ্গে নিয়ে একটি সখী, তার সঙ্গে জলপাত্র হস্তে একজন পুরুষ। আবদ্ধ গিরি-কুমারীর হস্ত, হরের হস্তে। তাদের সম্মুখে গণপতি বসে আছেন। হরের পশ্চাতে একটি বামন, সঙ্গে নিয়ে চার অনুচর, একজনের হাতে শোভা পায় একটি শঙ্খ।

দেখি, তপস্যাপরায়ণা হিমালয়-দুহিতাকেও। হোমাগ্নিতে বেষ্টিত হয়ে তিনি তপস্যায় নিযুক্তা। হবে দেবাদিদেবের সঙ্গে মহা মিলন। মন্থরগতিতে অগ্রসর হন মহাদেব, হস্তে নিয়ে একটি জলাধার। তাঁর পিছনে এক পুরুষ, মস্তকে তার পাত্রে ভর্তি পদ্ম, কিছু ফলও আছে। তার দক্ষিণে এক সুন্দরী

নারী, নিযুক্তা তিনি সামনের পুরুষটির সঙ্গে আলাপনে। খুব সম্ভব, এই পুরুষটিই মদন, বসন্ত সখা, রতিপতি—প্রেমের দেবতা। চূড়ার আকারে বিন্যস্ত তাঁর কেশপাশ, নির্গত হন তিনি একটি মকরের মুখগহ্বর থেকে, তাঁর অনুগমন করেন আর একটি পুরুষ। তাঁদের নীচে সারি সারি গণদেবতা দাঁড়িয়ে আছেন। অতুলনীয় তাঁদের গঠনসৌষ্ঠব।

পূর্ব প্রান্তে মহিষাসুরী মূর্তি দুর্গাকে দেখি, নিযুক্তা তিনি মহিষাসুর বধে। তাঁর সম্মুখে গদা হস্তে এক দৈত্য দাঁড়িয়ে আছেন, পশ্চাতে অসি হস্তেও একজন। উর্ধ্বে গন্ধর্বেরা বিরাজ করেন।

মন্দিরের প্রবেশপথের উত্তরে দেখি, লঙ্কাধীশ, পঞ্চানন রাবণ দাঁড়িয়ে আছেন কৈলাসের নীচে। তিনি মস্তকে ধারণ করে আছেন একটি বরাহ। নিযুক্ত তিনি কৈলাস উত্তোলনের প্রচেষ্টায়। কম্পিত কৈলাস, ভীতার্ত দেবগণ, আতঙ্কিতা দেবীরা। নাই কোন ভ্রূক্ষেপ শুধু কৈলাসপতি শিবের, পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বসে আছেন পর্বতের উপর—অচল, অটল।

দেখি, পাশা খেলায় নিযুক্ত হর ও পার্বতী, ভৃঙ্গী দেখছেন সেই খেলা। দেখি, রত পার্বতী কেশ বিন্যাসে, সখীরা বন্ধন করেন তাঁর শিথিল কবরী। পদতলে গণদেবতারা নিযুক্ত দর্শনে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, উদ্গত স্তম্ভের সামনে একটি নারী, চামর হস্তে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি বেদীর সম্মুখেও দাঁড়িয়ে আছে দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে আসন। খোদিত হয়েছে তাদের বন্ধনীর অঙ্গে অপরূপ মূর্তিসম্ভার, মূর্তি দেবদেবীর। অনুরূপ এই স্তম্ভ দুটি এ্যালিফ্যাণ্টার গণেশ গুম্ফার স্তম্ভের, গঠনপদ্ধতিতে আর অঙ্গের অলঙ্করণে—দেখি স্তব্ধ হয়ে। বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে মন্দিরের দ্বারও, রচিত হয়েছে তার অঙ্গেও তুলনাহীন পৌরাণিক কাহিনী। দেখি, তাণ্ডব নৃত্য করেন নটরাজ, দেবতারা সেই নৃত্য দর্শন করেন, দেখেন মুনি-ঋষিরাও। দ্বারের দুই পাশে দুই অতিকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের একজনের হস্তে শোভা পায় একটি ত্রিশূল। তার শিরোভূষণ থেকে নির্গত হয় একটি অসি। একটি অজগর বেষ্টন করে আছে তার কটিদেশ। গর্ভগৃহে বিরাজ করেন এই মন্দিরের বিগ্রহ, একটি লিঙ্গ। স্থাপিত সেই

লিঙ্গটি, প্রাচীরে বেষ্টিত একটি অনুচ্চ বেদীর উপর। বেদীর চতুর্দিকে প্রশস্ত প্রদক্ষিণের পথ।

অনবদ্য এই মন্দিরের মূর্তিগুলি, মহিমময় হরপার্বতীর বিবাহের দৃশ্য, অনুপম স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার। প্রতীক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, কীর্তির এক গৌরবময় যুগের, দেখে মুগ্ধ হয় মন, শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে, দ্বাবিংশতি গুহামন্দির, নীলকণ্ঠে উপস্থিত হই। একটি দ্বার অতিক্রম করে, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি, পরিধি তার চুয়াল্লিশ বর্গ ফুট। শৈব মন্দির, এই নীলকণ্ঠ। দেখি মঞ্চের উপর বসে আছেন, দেবতার বাহন নন্দী। গণপতি আর তাঁর চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, অষ্টমাতাকেও দেখি।

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করি। দাঁড়িয়ে আছে বার ফুট উচ্চ মন্দিরটি, সত্তর ফুট দীর্ঘ আর চুয়াল্লিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম দশটি চতুষ্কোণ আসন, শীর্ষ ও বন্ধনীযুক্ত স্তম্ভ। চারিটি দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের সম্মুখে, মণ্ডপের তিন কোণে, এক এক কোণে দুইটি করে, ছয়টি। চার প্রান্তদেশে একটি করে উপাসনা মন্দির নির্মিত হয়েছে। তাদের কেন্দ্রস্থলে, একটি করে বেদী। অনবদ্য দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে সজ্জিত হয়েছে তোরণের অঙ্গ আর প্রাচীরের গাত্র। তাদের মধ্যে মূর্তি আছে গণেশের আর তিন দেবীর, তাঁদের একজন মকর বাহনে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর আর কার্তিকের মূর্তিও আছে। গর্ভগৃহে দেখি, বিগ্রহ একটি অত্যুজ্জ্বল লিঙ্গ। ঘোর নীল তার কণ্ঠদেশের বর্ণ। তাই পরিচিত এই মন্দিরটি নীলকণ্ঠ নামে।

সমুদ্র মন্থন করেন দেবগণ, সঙ্গে থাকেন দানবেরা। মথিত হবে অমৃত। সেই অমৃত পান করে, তাঁরা অমর হবেন। উঠে না অমৃত। নির্গত হয় গরল। হয় বুঝি মহাপ্রলয়। দেবলোক, ভূলোক আর নাগলোক, সব বুঝি যায় রসাতলে, সেই বিষের প্লাবনে। কি হবে উপায়! কেমন করে রুদ্ধ হবে এই হলাহলের প্লাবন! নিরুদ্ধ হবে ধ্বংসের লীলা, রক্ষিত হবে সৃষ্টি। এগিয়ে আসেন দেবাদিদেব মহাদেব, পান করেন সেই বিষ, পান করেন যত উঠে হলাহল মন্থনে। নীলবর্ণ ধারণ করে তাঁর কণ্ঠ। তাই নীলকণ্ঠ নামে খ্যাতি লাভ করেন শিব।

নীলকণ্ঠ দেখে আমরা চতুর্বিংশতি গুহামন্দির তেলিকাগণ দেখতে যাই। শুনি, আছে নাকি অপেক্ষাকৃত উঁচুতে, একটি ক্ষুদ্র গুহা, আছে তাতে একটি অলিন্দ, পাঁচটি দ্বার ও প্রকোষ্ঠ। আছে একটি লিঙ্গও তার পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে আর একটি ত্রিমূর্তির মূর্তি। পরিচিত সেই গুহাটি ত্রয়োংবিশতি গুহামন্দির নামে। দেখি, এই মন্দিরেও পাঁচটি প্রকোষ্ঠ, শোভিত হয়ে আছে ক্ষুদ্র মূর্তি দিয়ে। সুন্দর নয় এই মূর্তিগুলি, নাই কোন স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য তাদের অঙ্গেও।

চতুর্বিংশতি গুহামন্দির দেখে আমরা পঞ্চবিংশতিতে, কুম্ভ ওয়াড়াতে উপনীত হই। নাই কোন চিহ্ন এই মন্দিরের সামনের অংশের, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের করালে। তবুও প্রশস্ত এই মন্দিরটি। সভাগৃহটির দৈর্ঘ্য পঁচানব্বই ফুট, প্রস্থ সাতাশ ফুট। উচ্চতায় চোদ্দ ফুট এই মন্দিরটি।

উত্তর প্রান্তে, স্তম্ভমূলে এক দেবতা বসে আছেন। দক্ষিণ প্রান্তে একটি কুলুঙ্গি, তার পিছনে একটি মন্দির, পরিধি তার পনর স্কোয়ার ফুট। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি আয়তক্ষেত্র বেদী। কুলুঙ্গির সামনে আধার হস্তে একটি স্থূলকায় ব্যক্তি বসে আছেন। শোভিত সভাগৃহের পশ্চাৎভাগ চারিটি স্তম্ভ ও দুইটি উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে। তাদের পিছনে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সভাগৃহ দাঁড়িয়ে আছে, বিস্তৃত হয়ে আছে সাতান্ন ফুট দীর্ঘ তেইশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। রচিত হয়েছে তার পশ্চাতেও, দুই প্রান্তে দুইটি করে স্তম্ভ, পৃথক করা হয়েছে মন্দিরকে—মন্দিরের তোরণ থেকে, পরিধি তার ত্রিশ ফুট দীর্ঘ আর নয় ফুট প্রস্থ। তোরণের ছাদে সপ্ত অশ্ব চালিত রথ-আরোহণে দেব দিবাকর বিরাজ করেন। দাঁড়িয়ে আছে মার্তণ্ডের দুই পাশে দুই পরমা রূপবতী নারী, হস্তে নিয়ে তীর আর ধনু। খুব সম্ভব সূর্যমন্দির এইটি।

সূর্যমন্দির দেখে আমরা ষড়বিংশতি মন্দির জনসাতে উপস্থিত হই, একশ, বার ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরটি। আছে এই মন্দিরের সম্মুখে দুইটি সুন্দর স্তম্ভ, অনুরূপ এ্যালিফ্যাণ্টার গণেশ গুম্ফার স্তম্ভের। পশ্চাতেও দাঁড়িয়ে আছে দুইটি স্তম্ভ। প্রশস্ত সভাগৃহের দুই প্রান্তে দুইটি উপাসনা মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের তোরণের সামনে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে, অপরূপ তার কেশের বিন্যাস, তার সঙ্গে একটি বামন পরিচারক। মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারে, দুই

অতিকায় দ্বারপাল, তাদের একজনের হস্তে একটি পুষ্প। সঙ্গীর মস্তকে পাগড়ি, হস্তে নরকপাল।

গর্ভগৃহে চতুষ্কোণ বেদীর উপর বিরাজ করেন একটি লিঙ্গ। বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দির সাতষট্টি ফুট দীর্ঘ প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে।

উপনীত হই গভীর সংকীর্ণ গিরিপথের প্রান্তদেশে, প্রবেশ করি সপ্তবিংশতি মন্দিরে, পরিচিত গোয়ালিনীর মন্দির নামে। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে অলিন্দে উপনীত হই। অলিন্দের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে একটি দ্বার ও চারিটি গবাক্ষ দেখি। দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে এই প্রাচীরের গাত্র। দেখি, দুইটি পরিচারিকা সঙ্গে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি শঙ্খ. চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে। মহাদেবকেও দেখি। বেষ্টন করে আছে তাঁর কণ্ঠ একটি অজগর। আছেন ত্রয়ানন ব্রহ্মা, হস্তে নিয়ে মালা আর জলাধার। মহিষাসুরীও আছেন। উত্তর প্রান্তে ধরিত্রীকে ধারণ করে আছেন বরাহ, দক্ষিণে শেষনাগের উপর নারায়ণ শয়ন করে আছেন।

দ্বার অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। তিপ্পান্ন ফুট দীর্ঘ, বাইশ ফুট প্রস্থ আর বার ফুট উচ্চ এই সভাগৃহটি, নির্মিত হয়েছে তার সঙ্গে একটি তোরণ, তোরণের সংলগ্ন মন্দিরের গর্ভগৃহ, পরিধি তার তেইশ ফুট দীর্ঘ আর দশ ফুট প্রস্থ। দাঁড়িয়ে আছে গর্ভগৃহের সামনে দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ। মন্দিরের দু পাশের গলিপথে দাঁড়িয়ে আছে বৈষ্ণব দ্বারপাল। মন্দিরের ভিতরে আয়ত ক্ষেত্র বেদী। মনে হয়, বিষ্ণুমন্দির এই গুহামন্দিরটি।

সপ্তবিংশতি গুহামন্দির দেখে আমরা অষ্টাবিংশতিতে উপনীত হই। একটি অত্যুচ্চ পর্বতকন্দরে দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে দুইটি প্রকোষ্ঠ, একটি তোরণ ও সভাগৃহ। দেখি একটি দ্বারপালের ভগ্নাবশেষ। গর্ভগৃহের ভিতরে একটি বেদী, প্রাচীরের গাত্রে, একটি অষ্টভুজা দেবীর মূর্তি দেখি। খুব সম্ভব এটিও বিষ্ণুমন্দির।

অষ্টাবিংশতি দেখে আমরা ঊনত্রিংশৎ গুহামন্দির, সীতার নাহানীতে পৌছাই। অনুরূপ এই গুহামন্দিরটি, এ্যালিফ্যাণ্টার গণেশ গুম্ফার, কিন্তু বিস্তৃততর এই মন্দিরের পরিকল্পনা, সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম রূপদান। নির্মিত

হয় এই মন্দিরটি পরবর্তী কালে, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও একটি অতি প্রশস্ত সভাগৃহ, পরিধি তার একশ আটচল্লিশ ফুট প্রস্থ ও একশ উনপঞ্চাশ ফুট গভীর, দাঁড়িয়ে আছে দুশ' চল্লিশ ফুট প্রাঙ্গণের ভিতর।

একটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি, সোপানের শীর্ষদেশে দুই অতিকায় সিংহ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পাদমূলে কয়েকটি হস্তী শিশু। প্রহরী তারা এই মন্দিরের। পশ্চিমের প্রবেশ পথে মঞ্চের উপর দেবতার বাহন নন্দী বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছে সভাগৃহটি, ছাব্বিশটি বৃহৎ সুষ্ঠুগঠন স্তম্ভের উপর। বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য শিল্পসম্পদ।

মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয়েছে মন্দিরের গলিপথের সম্মুখদেশ, অলঙ্কৃত করা হয়েছে তার তিন প্রান্তদেশও। উত্তরের গলিপথের দক্ষিণ প্রান্তে দেখি, আন্দোলিত কৈলাস লঙ্কাধীপ রাবণের ভুজবলে। দক্ষিণ প্রান্তে ভৈরবকে দেখি। পশ্চিম প্রান্তে হরপার্বতী পাশা খেলায় নিযুক্ত। পদতলে নন্দী আর গণেরা উপবিষ্ট। তাদের দক্ষিণে বিষ্ণু বামে ব্রহ্মা। পূর্ব প্রান্তে স্বর্গলোকে দেবতাদের দেবীদের সঙ্গে বিবাহের দৃশ্য। অনবদ্য সেই দৃশ্য, বিস্ময় জাগায় মনে। বাইরে এক মহিমময়ী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন, ময়ূরের আকারে বিন্যস্ত তার কেশপাশ। উর্ধ্বে উপবিষ্ট চার মুনি, সঙ্গে নিয়ে তিনটি রূপবতী নারী। তাঁদের পদতলে হংস। খুব সম্ভব তিনি বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী দেবী। একটি সোপানের শ্রেণী নীচের নদীতে গিয়ে মিশেছে।

উত্তরের অলিন্দে দেখি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট মহাদেব, ধরেছেন তিনি মহাযোগীর বেশ। তাঁর বাম হস্তে শোভা পায় গদা, দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্মের গুচ্ছ। ফণাযুক্ত কয়েকটি নাগিনী, শিরে ধারণ করে আছে সেই পদ্মাসনটি। পিছনে দুজন ভক্ত বসে আছেন।

বিপরীত দিকে তাণ্ডব নৃত্যে নিযুক্ত নটরাজ। তাঁর বাম পাশে উপবিষ্টা হিমালয়-দুহিতা পার্বতী। পূর্ব প্রাচীর গাত্রে মকর-বাহনে গঙ্গাদেবী উপবিষ্টা। তাঁর সঙ্গে শুধু একটিমাত্র পরিচারিকা আর কয়েকটি গন্ধর্ব। গুহার পশ্চাতে, প্রান্তদেশে মন্দিরের গর্ভগৃহ, একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ। বিরাজ করেন সেখানে বেদীর উপরে লিঙ্গ। মন্দিরের চার দ্বারে অতিকায়

দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে পুষ্প। বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের শিরোভূষণ, বিস্মিত হয়ে দেখি। চতুর্দিকে রচিত হয়েছে প্রদক্ষিণের পথ।

অনেকখানি পথ অতিক্রম করে একত্রিংশৎ গুহামন্দিরে উপনীত হই। ত্রিংশৎ গুহামন্দির লুপ্ত হয়ে আছে মৃত্তিকার অন্তরালে, হয় নাই সংস্কৃত।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ সরকার এই মন্দিরটির সংস্কারে নিযুক্ত হন কিন্তু সক্ষম হন নাই সম্পূর্ণ সংস্কার করতে, রয়ে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়।

খুব সম্ভব, ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়, কৈলাসের অনুকরণে, বুকে নিয়ে দ্রাবিড় স্থাপত্য পদ্ধতি। তাই পরিচিত এই মন্দিরটি ছোট কৈলাস নামে।

কাটা হয় পাহাড়ের অঙ্গ, খনিত হয় একটি গভীর গহ্বর, পরিধি তার ত্রিশ ফুট দীর্ঘ আর আশী ফুট প্রস্থ। রচিত হয় একটি ছত্রিশ ফুট বর্গ অপরূপ মণ্ডপ। ষোলটি সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে শোভিত করা হয় সেই মণ্ডপটিকে। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য অলঙ্করণ। নির্মিত হয় মণ্ডপের সম্মুখে একটি তোরণ, বুকে নিয়ে অতুলনীয় শিল্পসম্পদ, প্রান্তদেশে গর্ভগৃহ, আয়তনে সাড়ে চোদ্দ ফুট দীর্ঘ, এগার ফুট প্রস্থ। বুকে নিয়ে আছে ছোট কৈলাসও, অনবদ্য শিল্পসম্ভার আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, মূর্তি দেবদেবীর। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ছোট কৈলাস দেখে আমরা ইন্দ্রসভার দিকে অগ্রসর হই। পথে পড়ে দ্বাত্রিংশৎ মন্দির। দেখি অসমাপ্ত এই মন্দিরের কাজও, লাভ করে নাই মন্দিরটি সম্পূর্ণ রূপ, হয় নাই পূর্ণ সংস্কৃতও। দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি তোরণ, রচিত তার তিন দিক, তিন পাহাড়ের অঙ্গ কেটে। কয়েকটি আসনযুক্ত স্তম্ভের শীর্ষদেশও দেখি। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি আর তোরণটি একটি পর্দার উপর, স্থাপিত সেই পর্দা কয়েকটি হস্তীর পৃষ্ঠে। সুন্দরতম এই পরিকল্পনা, অনবদ্য রূপদান।

দ্বাত্রিংশৎ মন্দির দেখে, আমরা ইন্দ্রসভায় উপনীত হই।

প্রচারিত হয় যখন বুদ্ধের বাণী গঙ্গার উপত্যকায় রাজগৃহে আর সারনাথে, বাণী প্রচার করেন বর্ধমান মহাবীরও। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ, অধীশ্বর তিনি ত্রিহুতের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জনপদের পরিচিত কুন্দ পুরা নামে।

জননী তাঁর ত্রিশলা, এক ক্ষত্রিয়া রাজকুমারী, নিকটতম আত্মীয়া বৈশালীর অধিপতির, আত্মীয়া মগধেশ্বরেরও। মহাবীর বিবাহ করেন যশোদা নাম্নী এক ক্ষত্রিয়া রাজকুমারীকে, কিছুদিন ধার্মিক গৃহস্থের জীবন যাপন করেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরিত্যাগ করেন সংসার। ত্যাগ করেন স্নেহময় পিতামাতাকে, ছেড়ে চলে যান পরমা রূপবতী প্রিয়তমা পত্নীকেও। নিরাবরণ সন্ন্যাসীর বেশে তিনি ভ্রমণ করেন পূর্ব-ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কিছুদিন সহবাসী হন সন্ন্যাসী গোপালার, শেষে নিযুক্ত হন কঠোর তপস্যায়। তপস্যা করেন দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর। ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি জ্রীম্ভীকা গ্রামে উপনীত হন, আসন স্থাপন করেন ঋজু—পালিকা নদীর উত্তর পারে। লাভ করেন পরম জ্ঞান, কেবলীন জ্ঞান, হন কেবলীন, হন সর্বজ্ঞ, হন জিনা, রিপু-বিজেতা, হন মহাবীর বা বিজয়ীও। গড়ে তোলেন এক সম্প্রদায়, পরিচিত নির্গ্রন্থ নামে। মানে না তারা কোন বাধা, গ্রাহ্য করে না বিঘ্ন। তিনি সেই সম্প্রদায়ের পুরোধা হন, প্রচার করেন তাঁর বাণী সারা পূর্ব-ভারতে, অঙ্গে, মগধে, বিদেহ দেশে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর। শেষে বাহাত্তর বৎসর বয়সে, দক্ষিণ বিহারে, পাভাতে লাভ করেন মহানির্বাণ, লাভ করেন সিদ্ধশিকা। তিরোহিত হন এক যুগাবতার, এক মহামানব। এই ঘটনা ঘটে খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর আগে। কেউ বলেন পাঁচ শত আটাশ বৎসর আগে। জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয় তাঁর প্রচারিত ধর্ম।

জৈনরা বলেন, মহাবীর চতুর্বিংশতি বা শেষ তীর্থঙ্কর, নন তিনি প্রথম প্রবর্তক এই ধর্মের। জন্মগ্রহণ করেন আরও তেইশ জন তীর্থঙ্কর। তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন আদিনাথ, অজিতনাথ, চন্দ্রপ্রভা, শান্তিনাথ, অনাথনাথ, সুপার্শ্বনাথ, মল্লিনাথ, নেমিনাথ প্রভৃতি। জন্মগ্রহণ করেন ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও, তিনি ছিলেন বারাণসীর রাজকুমার। তাঁরা সকলেই এই ধর্মের প্রচারক, প্রচার করেন যুগের পর যুগ। প্রচারিত হয় অহিংসা আর সত্য ভাষণের বাণী, হয় নির্লোভের আর মোহমুক্তির বাণী, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। মহাবীর যোগ করেন পঞ্চম বাণী—সে বাণী ব্রহ্মচর্যের বাণী। যুক্ত হয় তিনটি অনুশাসনও। অনুশাসন সৎ জ্ঞানের, সৎ বিশ্বাসের আর সৎ জীবনযাপনের। মানেন না তিনি বেদের অভ্রান্ততা, বিশ্বাস

নাই তাঁর যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, অবিশ্বাসী তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও। বিশ্বাসী তিনি শুধু মানবাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে। তবেই লাভ করবে জীব ঐশী শক্তি—করবে বিশ্বাস, কঠোর তপশ্চরণ ও অপরিসীম কৃচ্ছ্র সাধন দিয়ে, প্রবেশ করবে অনির্বচনীয় আনন্দধামে। বলেন তিনি, তবেই হবে তাদের মোক্ষলাভ, পতিত হতে হবে না তাদের পূর্বজন্মের আবর্তে, মুক্ত হবে জন্মান্তরের কষ্ট থেকে।

বিভক্ত জৈনরাও তুইটি সম্প্রদায়ে—শ্বেতাম্বর, ভূষিত তাঁরা শ্বেত অম্বরে বা বস্ত্রে। দিগম্বর—নাই তাঁদের কোন অম্বর বা বসন, নিরাবরণ বসনহীন তাঁরা।

বৌদ্ধ আর হিন্দুদের অনুকরণে তাঁরাও নির্মাণ সুরু করেন গুহামন্দির। নির্মিত হয় উড়িষ্যায়—উদয়গিরি আর খণ্ডগিরিতে। নির্মাণ করেন বৈকুণ্ঠ গুহা বা স্বর্গপুরী, হয় হাতি গুম্ফাও। প্রথম শ্রেণীর গুহামন্দির দিয়ে শোভিত করেন এলোরাকেও। নির্মিত হয় ইন্দ্রসভা আর জগন্নাথসভা ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থপতির আর ভাস্করের। খুব সম্ভব তাঁরা দ্রাবিড় স্থান থেকে শিল্পী আনিয়ে তাদেরই সাহায্যে এই তুইটি গুহামন্দির নির্মাণ করেন—তাই এই বৈশিষ্ট্য। সৌরাষ্ট্রে, জুনাগড়েও আছে কয়েকটি জৈন গুহামন্দির। ছড়িয়ে আছে কিছু গুহামন্দির দাক্ষিণাত্যেও। তাই সীমাবদ্ধ তাঁদের দান।

অন্য মন্দিরে কিন্তু অপরিমিত তাঁদের দান। খুব সম্ভব, প্রাচীনতম জৈনমন্দির বুকে নিয়ে আছে দাক্ষিণাত্যের মেগুতি। নির্মিত হয় এই মন্দিরটিও, অঙ্গে নিয়ে দ্রাবিড় পদ্ধতি, নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের, ছ-শ চৌত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্য রাজারা নির্মাণ করেন।

মধ্যপন্থী তাঁরা হিন্দু আর বৌদ্ধদের ধর্মে, তাই তাঁদের স্থাপত্য সমসাময়িক ও নিকটবর্তী হিন্দু অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে গড়ে ওঠে। তীর্থস্থানে পরিণত হয় কয়েকটি পর্বত, পরিণত হয় মহাতীর্থে, লাভ করে অমরত্ব, অপরূপ মন্দির অথবা মন্দিরের সমষ্টি দিয়ে শোভিত হয় সেই সব পরম পবিত্র শৈলমালার শীর্ষদেশ। নির্মিত হয় কত জৈন বস্তি, কত চৈত্য, কত অরহৎ, বুকে নিয়ে সমসাময়িক হিন্দু অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, প্রতীক

এক গৌরবময় যুগের। রচিত হয় এক একটি অলোকসুন্দর শাশ্বত মন্দিরময় নগর। পূজিত হন সেই সব মন্দিরে তীর্থঙ্কর, হন আদিনাথ, শান্তিনাথ, মল্লিনাথ, পার্শ্বনাথ, মহাবীরও হন। দলে দলে যাত্রী আসে, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে মন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, দর্শন করে তাদের গাত্রের মূর্তিসম্ভারও, ভক্তিভরে পূজা দেয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্করকে, সফল হয় তাদের মনস্কাম, ধন্য হয় তাদের জীবন।

এমনই করে গড়ে ওঠে কাথিওয়াড়ের পবিত্র শৈলমালার শীর্ষদেশে, পলিতনা নগরের দক্ষিণে, কয়লার বাসিতুকের উত্তর প্রান্তে সিতুরঞ্জয়—বৃহত্তম আর সুন্দরতম মন্দিরময় নগর। বুকে নিয়ে আছে সিতুরঞ্জয় শত শত মন্দির, মণ্ডপ আর গর্ভগৃহ। এইখানে চৌমুখ মন্দিরে পূজিত হন আদিনাথ, প্রথম তীর্থঙ্কর। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

সিতুরঞ্জয়ের বিপরীত দিকে বিমলাবাসীতুকেও দাঁড়িয়ে আছে একটি অপরূপ মন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন। পূজিত হন এই মন্দিরেও আদিশ্বর। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি শৈলমালার পবিত্রতম প্রদেশে, তাই পরম পবিত্র এই মন্দিরটি, মহাতীর্থে পরিণত হয় বিমলাবাসীতুকও। প্রাচীনতরও এই মন্দির নির্মিত হয় ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। সংস্কৃত হয় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

কাথিওয়াড়েই প্রখ্যাত জুনাগড়ের নিকটে, গির্ণারের গিরি শিখরেও অনুরূপ একটি শাশ্বত মন্দির নগর রচিত হয়। নির্মিত হয় সেখানে নেমিনাথের মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, একশ' নব্বই ফুট দীর্ঘ ও একশ' ত্রিশ ফুট প্রস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যে। মন্দিরটির পরিধি একশ' কুড়ি ফুট দীর্ঘ আর ষাট ফুট প্রস্থ। নির্মিত হয় তেতাল্লিশ বর্গ ফুট একটি অপরূপ মণ্ডপ। বিভক্ত সেই মণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগ বেদী ও গলিপথে। বাইশটি অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয়েছে চারিদিকের গলিপথকে, মণ্ডপের কেন্দ্রস্থল থেকে। একটি বিমানও রচিত হয়েছে। বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপটি আর তার বিমানের ও স্তম্ভের অঙ্গ অনুপম শিল্পসম্ভার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্মিত হয় আরও একটি মন্দির গির্ণারে, পরিচিত বাস্তুপাল তেজপাল মন্দির নামে। গুজরাটের অধিপতিরা নির্মাণ করেন।

পূজিত হন সেই মন্দিরে তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ। তিনটি মন্দিরের সমষ্টি এই মন্দিরটি, সংযুক্ত হয় কেন্দ্রস্থলের একটি মণ্ডপের সঙ্গে, চতুর্থ দ্বারে প্রবেশপথ। নির্মিত হয় আবু পর্বতের শীর্ষদেশেও বিমলা ও তেজপালের মন্দির।

আরও কয়েকটি পবিত্র নগর গড়ে ওঠে, নির্মিত হয় মন্দির সেই সব নগরেও। কিন্তু সমতুল্য নয় সেই সব মন্দির কাথিওয়াড়ের আর গির্ণারের মন্দিরের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বে আর মহিমময়ত্বে। নিকৃষ্ট অনুকরণ তার, নাই স্থপতির মহিমময় পরিকল্পনা, নাই অনবদ্য সুন্দরতম রূপদানও। গড়ে ওঠে মধ্য ভারতে, দাতিয়ার কাছে, সোনার গড়ে, মধ্য প্রদেশে, দামো জেলায়, কুন্দপুরায়, পঞ্চাশটি মন্দির। মন্দির নির্মিত হয় বেরারে, গোয়ালগড়ের নিকটে, মুক্ত গিরিতে আর বিহারে পরেশনাথের শীর্ষদেশে।

এই সমস্ত পবিত্র নগর ছাড়াও অপরূপ, মহিমময় মন্দির নির্মিত হয় পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দির অনবদ্য জৈন শিল্পসম্ভার, প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ। নির্মিত হয় আদিনাথের চৌমুখ মন্দির মাড়োয়ারের সদারির কাছে রনপুরে। ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ধরণক এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। খুব সম্ভব বৃহত্তম জৈনমন্দির, এই আদিনাথের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশ হাজার বর্গ ফুট চৌরস পরিধি নিয়ে। আছে এই মন্দিরে উনত্রিশটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ, শোভিত হয়ে আছে চারিশত কুড়িটি নিখুঁত সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতি, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর অলঙ্করণও। একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর উঁচু প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি। অনুরূপ এই প্রাচীরটি, দুর্গের প্রাচীরের, বাড়ে মন্দিরের নিরাপত্তা। নির্জনতম হয় মন্দির, হয় নিভৃততমও। সেই নির্জনে, নিভৃতে, নিরাপদ মহাশান্তির পরিবেশে বসে জৈন তীর্থযাত্রীরা পূজা করেন তীর্থঙ্করকে, করেন দেবতাকে। বিভিন্ন অলঙ্করণে অলঙ্কৃত প্রাচীরের গাত্রও। রচিত হয় ছেষট্টিটি প্রকোষ্ঠ। অপরূপ সুশোভন চূড়া দিয়ে শোভিত করা হয় তাদের শীর্ষদেশও। তাদের পিছনেও শোভা পায় সুউচ্চ চূড়া আর কুপলার শ্রেণী। অপরূপ, মহিমময় এই দৃশ্য। পাঁচটি শিখারাও নির্মিত হয়, বৃহত্তম আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থলের প্রধান মন্দিরের শীর্ষদেশের শিখারাটি

সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে, প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণে। শীর্ষে নিয়ে আছে কুড়িটি মণ্ডপ, কুড়িটি সুষ্ঠুগঠন নয়নাভিরাম গম্বুজ।

প্রাচীরের তিন দিকে, কেন্দ্রস্থলে তিনটি দ্বিতল প্রবেশদ্বার, দাঁড়িয়ে আছে বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, বৃহত্তম ও সুন্দরতম তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকেরটি, প্রবেশদ্বার প্রধান মন্দিরের। প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকে অনেকগুলি স্তম্ভযুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মূল মন্দিরে উপনীত হতে হয়। বেষ্টিত হয়ে আছে মূল মন্দিরটি অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির আর উপাসনা মন্দির দিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে তারা এক একটি পঁচানব্বই ফুট প্রস্থ আর একশ' ফুট দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে। সঙ্গে নিয়ে আছে প্রধান মন্দিরটি একটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ। শোভা. পায় সেই মণ্ডপে একশ'টি সুষ্ঠু-গঠন অনবদ্য স্তম্ভ, বুকে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। দ্বিতল এই মন্দিরটি, গর্ভগৃহে বিরাজ করেন শ্বেত মার্বেল প্রস্তরে নির্মিত আদিনাথ, প্রথম তীর্থঙ্কর। মহামহিমময় এই মন্দিরের পরিকল্পনা, অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপদান, প্রতীক এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির, একঅক্ষয় কীর্তির।

খ্রীষ্টের জন্মের তিনশ' নয় বছর পূর্বে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাধে প্রথম তীর্থঙ্কর পুরুদেব বা আদিনাথের পুত্র গোমতেশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা ভারতের। পরিচিত গোমতেশ্বর বহুবলী নামেও। পরাজিত হন গোমতেশ্বর। রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করে কয়েকজন ভক্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে তিনি আশ্রয় নেন এসে সুদূর দাক্ষিণাত্যে, শ্রাবণবেল গোলাতে, মহীশূর শহর থেকে বাষট্টি মাইল দূরে। দুই দিকে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু স্ফটিকের মহাপবিত্র শৈলমালা চন্দ্রগিরি আর বিন্ধ্যগিরি বা ইন্দ্রবেটা, পদতলে একটি বৃহৎ ত্রিকোণ স্বচ্ছ সরোবর বা বেলগোলা, প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে এক লীলাভূমিতে অবস্থিত এই শ্রাবণবেল গোলা। তিনি নিযুক্ত হন কঠোর তপস্যায়, হন সন্ন্যাসী। শেষে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে তিনি সিদ্ধপুরুষে পরিণত হন। এক মহাতীর্থে পরিণত হয় শ্রাবণবেল গোলাও। ভারত এই খবর অবগত হন। ভ্রাতার স্মৃতির পূজার জন্য তিনি নির্মাণ করেন এখানে একটি পাঁচশ' পঁচিশ ধনু পরিমাণ উঁচু ভ্রাতার এক প্রতিমূর্তি। ক্রমে সর্পের আলয়ে পরিণত হয় এই স্থান, হয় অনতিক্রম্য। শেষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হয় মূর্তি, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে।

আসে ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ, মহীশূরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন গঙ্গ-বংশীয় রাজমল্ল। চামুণ্ডারায় নিযুক্ত হন তাঁর মন্ত্রী। বাসনা জাগে চামুণ্ডারায়ের অন্তরে এই মূর্তি দর্শন করবার। কিন্তু সফল হয় না তাঁর বাসনা, সম্ভব হয় না তাঁর মূর্তি দর্শন। তখন তিনি মহাপবিত্র বিন্ধ্যগিরির শীর্ষদেশে তিন হাজার তিন শত সাতচল্লিশ ফুট উঁচুতে নির্মাণ করান সাতান্ন ফুট উঁচু গোমতেশ্বরের মূর্তি। পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি, বৃহত্তর মিশরের রামেসিসের মূর্তির চাইতেও, দাঁড়িয়ে আছেন গোমতেশ্বর এক মহামহিময় মূর্তিতে। রচিত হয় বিন্ধ্যর স্ফটিকের অঙ্গেও, পাঁচ শত সোপানশ্রেণী, হয় একটি আলন্দ আর তেতাল্লিশটি ক্ষুদ্র মন্দিরও। বিরাজ করেন এই সব মন্দিরে এক একজন তীর্থঙ্কর। একটি প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত এই সব ক্ষুদ্র মন্দির আর গোমতেশ্বরের মূর্তি। আসে দলে দলে জৈন তীর্থযাত্রী, হাজারে হাজারে আসে, ভারতের প্রান্ততম প্রদেশ থেকেও আসে, নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি, পূজা করে গোমতেশ্বরকে, করে তীর্থঙ্করদেরও। প্রতি চতুর্দশ বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় এখানে, দেবতা গোমতেশ্বরের মস্তক অভিষেকের উৎসব, মুখরিত হয় শ্রাবণবেল গোলা লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কোলাহলে। রচিত হয় একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে একটি প্রবেশপথও, পরিচিত অখণ্ড বাগিলু নামে। বুকে নিয়ে আছে এই প্রবেশপথটিও সুন্দর শিল্পসম্ভার। কাপাটের উপর উপবিষ্টা গজলক্ষ্মী, তাঁর দু'পাশ থেকে দুই হস্তী তাঁকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

বস্তি বা জৈন মন্দির দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে পবিত্র ঋষিগিরি বা চন্দ্রগিরির শীর্ষদেশও। বুকে নিয়ে আছে এই বস্তিগুলিও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সুন্দরতম প্রতীক। এই বস্তিগুলি অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়, হয় শান্তিনাথ বস্তি, সুপার্শ্বনাথ বস্তি, পার্শ্বনাথ বস্তি ও আরও অনেক বস্তি। বৃহত্তম ও সুন্দরতম তাদের মধ্যে চামুণ্ডারায়ের বস্তি। ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে চামুণ্ডারায় নির্মাণ করেন এই বস্তিটি। বিরাজ করেন এই বস্তিতে বিংশতি তীর্থঙ্কর নেমিনাথ। বুকে নিয়ে আছে এই বস্তিটি দ্রাবিড় স্থাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের—স্থপতির আর ভাস্করের সুন্দরতম দান।

বুকে নিয়ে অছে শ্রাবণবেল গোলাও অনেকগুলি বস্তি। সুন্দরতম তাদের মধ্যে ভাণ্ডারী বস্তি। ১১৪১ থেকে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, হোয়সল রাজা প্রথম

নরসিংহের ভাণ্ডারী, হল্ল এই বস্তিটি নির্মাণ করেন। বিরাজ করেন এই বস্তির গর্ভগৃহে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর। বস্তির প্রবেশপথে একটি অপরূপ মনোস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, বুকে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ। বুকে নিয়ে আছে অক্কানা বস্তি ও সুন্দর হোয়সল স্থপতির দান। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে পার্শ্বনাথ বিরাজ করেন, তাঁর শিরে শোভাপায় একটি সপ্তফণাযুক্ত সর্প। আছে সিদ্ধান্ত বস্তি আর নগর জিনালয়, হোয়সল রাজ দ্বিতীয় বল্লালের মন্ত্রী নাগদেব নির্মাণ করেন। নির্মিত হয় একটি জৈনমঠ বা বিহারও, বাস করতেন সেখানে জৈনগুরুরা। অলঙ্কৃত সেই বিহারের প্রাচীরর গাত্র অনবদ্য অঙ্কনচিত্র দিয়ে। বর্ণিত হয় জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী, কাহিনী জৈনরাজাদেরও।

তিনটি মন্দিরের সমষ্টি দিয়ে রচিত এই ইন্দ্রসভা, ত্রয়ত্রিংশৎ মন্দির এলোরার, দুইটি দ্বিতল ও একটি একতল। তাদের মধ্যে প্রথমটি ইন্দ্রসভা নামে পরিচিত। আছে কয়েকটি উপাসনা মন্দিরও।

একটি প্রস্তরের পর্দা অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। বাইরে, পূর্বদিকে উপাসনা মন্দির, শোভিত তার সম্মুখভাগ দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। পিছনেও দুইটি অপরূপ স্তম্ভ দেখি। প্রাচীরের গাত্রে, উত্তরপ্রান্তে এক-একটি ত্রয়বিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি। দিগম্বর সেই মূর্তিগুলি, নাই কোন বসন তাদের অঙ্গে, শোভা পায় তাদের শিরে সর্পের ফণা, বিস্তৃত ছত্রাকারে। তাদের দুই পাশেও দুই অর্ধ নাগিনী ধারণ করে আছে ছত্র। তাদের দুই দিকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। বামপ্রান্তে দুই জন পূজারী বসে আছেন।

দক্ষিণপ্রান্তে উপবিষ্ট দিগম্বর গোমাতা বা গোমতেশ্বর। একটি লতা তাঁর বাহু বেষ্টন করে আছে। সঙ্গে আছেন নারী সহচরী আর পূজারী। ধ্যানমগ্ন তাঁরা সবাই।

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে বৃক্ষের নীচে হস্তীপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র বসে আছেন। সঙ্গে আছেন পত্নী ইন্দ্রাণী ও দু'জন সহচরী।

মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে বেদীর উপর মহাবীর বিরাজ করেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দেখি, দক্ষিণে মঞ্চের উপর একটি অতিকায় হস্তী দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একটি সাতাশ ফুট উঁচু মনোস্তম্ভ। রচিত এই এক-প্রস্তর স্তম্ভটি একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে, তার শীর্ষে শোভা পায় একটি চৌমুখের মূর্তি। অঙ্গে নিয়ে

আছে স্তম্ভটি অপরূপ শিল্পসম্ভার, প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মণ্ডপের উপর চারটি মহাবীরের মূর্তি, স্কন্ধে নিয়ে সিংহাসন। সিংহাসনের চার কোণে চারটি সিংহ আর চক্র। অনুরূপ এই সিংহাসনগুলি বৌদ্ধ গুহামন্দিরের সিংহাসনের। প্রাঙ্গণের পশ্চিমপ্রান্তে একটি সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে। শোভিত তার সম্মুখভাগও দুইটি অনবদ্য, সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। সভাগৃহের ভিতরেও চারটি সুন্দর স্তম্ভ।

কেন্দ্রস্থলের সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, অলঙ্কৃত প্রাচীরের গাত্র ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি দিয়ে। তাঁর বিপরীত দিকে, পদতলে ষারমেয় আর হরিণ নিয়ে গোমাতা। আছে তিনটি মহিমময় গোমাতার মূর্তি শ্রাবণবেল গোলাতে, কারকারায় আর জেনুরেও। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে শোভা পান ইন্দ্র, সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণী। গর্ভগৃহে, সিংহাসনে মহাবীর বিরাজ করেন, তাঁর শিরে তিনটি ছত্র। অপরূপ সুষ্ঠুগঠন, জীবন্ত এই মূর্তিগুলি, শ্রেষ্ঠ দান জৈন-ভাস্করের। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

নীচের তলায় সুপ্রশস্ত কক্ষটিতে প্রবেশ করি। দেখি একটি পর্দা দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে তার অলিন্দ, দুইটি অংশে। অলিন্দ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। বুকে নিয়ে আছে এই সভাগৃহটি বারোটি সুন্দরতম স্তম্ভ, রচিত এক-একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে। সম্মুখের অলিন্দের বাম পাশে ষোড়শ তীর্থঙ্কর, শান্তিনাথের দুইটি মহিমময় দিগম্বর মূর্তি দেখি। দাঁড়িয়ে আছে মূর্তি দুইটি উদ্গাত স্তম্ভের উপর। বুকে নিয়ে আছে উদ্গাত স্তম্ভ দুইটিও সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। তাদের একটির অঙ্গের শিলালিপিতে লেখা আছে, শৈল নামে একটি জৈন ব্রহ্মচারী এই মূর্তিটি নির্মাণ করেন। নবম আর দশম শতাব্দীতে এই লিপি প্রচলিত ছিল।

সভাগৃহ অতিক্রম করে আমরা একটি উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করি। আছে সেই উপাসনা মন্দিরেও একটি গর্ভগৃহ। শোভিত সেই উপাসনা মন্দির কত বিভিন্ন শোভনগঠন মূর্তি দিয়ে। গর্ভগৃহে এক মহামহিমময় দিগম্বর তীর্থঙ্কর বিরাজ করেন। তাঁর নীচেও এক খোদিত লিপিতে লেখা আছে, নির্মাণ করেন এই মূর্তিটি নাগবর্মা।

অলিন্দের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত প্রস্তর-নির্মিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে

দ্বিতলে উপনীত হই। দেখি, অনবদ্য, সুষ্ঠু-গঠন মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত প্রাচীরের গাত্র। দক্ষিণে পার্শ্বনাথ উপবিষ্ট, বামে গোমাতা, পশ্চাতে ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র। মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে, সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন মহাবীর। একটি অলিন্দে পৌছাই, সংযুক্ত এই অলিন্দটি প্রধান সভাগৃহের সঙ্গে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তার ছাদের অঙ্গের অতুলনীয় অঙ্কন-চিত্রের ধ্বংসাবশেষ। ভূষিত ছিল এই অলিন্দের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ অনবদ্য চিত্রসম্ভারে, প্রজ্বলিত ছিল বর্ণ সুষমায় আর প্রকৃষ্টতম গঠন সৌষ্ঠবে। প্রদীপ্ত ছিল সমস্ত অলিন্দটি। আজ অবশিষ্ট আছে শুধু কয়েকটি বিভিন্ন অংশ, বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে চারিদিকে—সাক্ষী তাদের পূর্ব গৌরবের। দেখি, অলিন্দের সম্মুখভাগের দুই প্রান্তদেশে দুইটি অর্ধভগ্ন চতুষ্কোণ স্তম্ভ। তার সঙ্গে উদ্গত স্তম্ভ, নীচু প্রাচীর দিয়ে যুক্ত হয়েছে। পশ্চাতদিকেও দুইটি স্তম্ভ দেখি, চতুষ্কোণ তাদের নিম্নতম প্রদেশ, ষোল কোণ দণ্ড আর শীর্ষদেশ স্তম্ভ দিয়ে অলিন্দকে সভাগৃহ থেকে পৃথক করা হয়েছে। বেষ্টিত দেখি সভাগৃহের অভ্যন্তরও বারোটি স্তম্ভ দিয়ে, বিভিন্ন তাদের প্রতিটির গঠনপদ্ধতি। সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে এই স্তম্ভগুলি অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে, বুকে নিয়ে আছে জৈনস্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাদের সুন্দরতম দান। সাড়ে চোদ্দ ফুট উঁচু এই অলিন্দের দুই প্রান্তদেশ শোভা করে আছেন ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী, আছেন মহামহিমময় মূর্তিতে, একজন বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন অপরজন আম্র বৃক্ষের। অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত দুই পাশের প্রাচীরের গাত্র, বিভক্ত গলিপথের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রও। শোভিত সেই সব প্রকোষ্ঠ, এক এক তীর্থঙ্করের মূর্তি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে উপবিষ্ট এক তীর্থঙ্কর, মহিমময় তাঁর মূর্তি। মন্দিরের দ্বারে উদ্গত স্তম্ভের উপর একদিকে পার্শ্বনাথ, অপরদিকে গোমাতা, তাঁরা এক-একটি বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বটবৃক্ষের নীচে বসেই সিদ্ধার্থ পরম জ্ঞান লাভ করেন, হন মহাজ্ঞানী, হন বুদ্ধ। তারই প্রতীক এই বটবৃক্ষ। গন্ধর্বরাও আছেন হস্তে নিয়ে মালা। দ্বারের দুই দিকে দুই দিগম্বর দ্বারপালও উদ্গত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশে মহাবীর বসে আছেন। কত বিভিন্ন মূর্তি

দিয়ে শোভিত করা হয়েছে দ্বারের অঙ্গও। বারো ফুট উচু মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসন আলো করে আছেন মহাবীর।

অলিন্দ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি, কেন্দ্রস্থলে চতুর্মুখ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মস্তকের উপর ছাদের অঙ্গে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই মূর্তিটি।

দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তের একটি দ্বার অতিক্রম করে একটি কক্ষে উপস্থিত হই। চারিদিকে বহু জৈন সাধুর মূর্তি দেখি। আরও একটি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করি। সামনে নিয়ে আছে এই কক্ষটি একটি অলিন্দ। অলিন্দের দক্ষিণে কুলুঙ্গির ভিতর গোমাতার মূর্তি, বামে পার্শ্বনাথ, দক্ষিণ-প্রান্তদেশে দেবরাজ ইন্দ্র, তিনি বাম হস্তে ধারণ করে আছেন একটি আধার, দক্ষিণহস্তে পুষ্প। ইন্দ্রের দিকে মুখ করে, প্রবেশ পথে ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। বুকে নিয়ে আছে কক্ষটি চারটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ, বৃত্তাকার তাদের শীর্ষদেশ। অনবদ্য এই স্তম্ভগুলিও। গর্ভগৃহের দুই পাশে দুই দিগম্বর দ্বারপাল, প্রহরী তারা মন্দিরের। দেখি ছাদের অঙ্গেও অবশিষ্ট কিছু চিত্রসম্ভার, পরিচায়ক পূর্ব গৌরবের।

উত্তর পূর্বপ্রান্তের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ অতিক্রম করে আমরা একটি মন্দিরে প্রবেশ করি। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি পশ্চিমপ্রান্তে। সাজিয়েছেন স্থপতি তার সম্মুখ ভাগও অপরূপ সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে, অলঙ্কৃত করেছেন ভাস্কর সুষ্ঠু-গঠন, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়েও। তুলনাহীন এই মূর্তিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব, শ্রেষ্ঠ দান জৈন ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের। প্রবেশপথের দক্ষিণপাশে একটি চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি দেখি। তাঁর দুই হস্তে শোভা পায় দুইটি চক্র, তৃতীয় হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি বজ্র। বামপাশে ময়ূরবাহনে অষ্টভুজা সরস্বতী, অনুরূপ এই কক্ষটি পূর্বপ্রান্তের কক্ষের, বিভিন্ন শুধু তার কেন্দ্রস্থলের স্তম্ভের শীর্ষদেশের গঠন, রচিত হয় আনমিত কর্ণের আকৃতিতে, বৃত্তাকার নয়। কক্ষের ভিতরে পার্শ্বনাথ বসে আছেন, আছেন গোমাতা আর ইন্দ্র, সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণী। ছত্রধারী নাগ আর নাগিনীরাও আছেন। বসে আছেন যে-যার নির্দিষ্ট স্থানে। আলো করে আছেন সমস্ত কক্ষটি। অনুপম শোভন তাঁদের গঠনভঙ্গিমাও, জীবন্ত,

রচনা করেন ভাস্কর হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী, তাই লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্ব, হয় সুন্দরতম। সফলকাম হন ভাস্কর আর স্থপতিও, সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে তাঁদের বহু শত বৎসরের অক্লান্ত সাধনা, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, রচিত হয় ইন্দ্রসভা, এক স্বপ্নলোক, এক রহস্যপুরী। হন তাঁরা বিশ্বজিৎ।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে শিল্পীদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি, অক্ষয় হয়ে থাকে মনের মণিকোঠায় তার স্মৃতি, হয় না ম্লান।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে জগন্নাথ সভায় প্রবেশ করি। প্রাঙ্গণের পশ্চিমপ্রান্তে রচিত হয়েছে একটি কক্ষ, দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে দুইটি বৃহৎ চতুষ্কোণ স্তম্ভ। দেখি কেন্দ্রস্থলেও চারিটি স্তম্ভ, অনুরূপ ইন্দ্রসভার স্তম্ভের গঠনে, সৌন্দর্যে আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে। এখানেও দক্ষিণে পার্শ্বনাথের মূর্তি দেখি, বামে গোমাতার বা গোমতেশ্বরের, মন্দিরে মহাবীর বিরাজ করেন। অলিন্দের দুই প্রান্তে ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী। স্তম্ভের অঙ্গের কেনারিজ ভাষায় লিখিত খোদিত লিপিতে লেখা আছে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাসনা মন্দিরটি নির্মিত হয়।

বিপরীত দিকেও একটি উপাসনা মন্দির দেখি। ভিতরে প্রবেশ করে একটি অতি সুন্দর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হই। অলঙ্কৃত হয়ে আছে এই প্রকোষ্ঠটিও অনবদ্য, সুন্দরতম মূর্তিসম্ভার দিয়ে। অনুরূপ এই মূর্তিগুলি ইন্দ্রসভার মূর্তির, গঠন-গরিমায় ও শিল্পসম্পদে।

প্রাঙ্গণের পিছনে একটি গুহায় প্রবেশ করি। দেখি, তার ভিতরেও সম্মুখের গলিপথের দুই প্রান্তে সপারিষদ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী, এক একটি বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। অনবদ্য তাঁদের গঠনসৌষ্ঠবও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। বুকে নিয়ে আছে গলিপথটিও কয়েকটি অপরূপ শোভন-গঠন স্তম্ভ। চতুষ্কোণ সামনের সারির স্তম্ভগুলি বাঁশীর আকারে রচিত তাদের শীর্ষদেশ। চতুষ্কোণ পিছনের সারির স্তম্ভগুলিও ষোল কোণ তাদের শীর্ষদেশ। কেন্দ্রস্থলের চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলি শীর্ষে নিয়ে আছে আনমিত কর্ণ। দেখি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি অপরূপ আচ্ছাদিত তোরণ। সংযুক্ত সেই তোরণটি একটি চন্দ্রাতপের সঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে চন্দ্রাতপ আর তোরণ সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ,

শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের প্রতীক। এখানেও গর্ভগৃহে বিরাজ করেন গোমাতা আর পার্শ্বনাথ, সঙ্গে নিয়ে পারিষদবর্গ।

প্রবেশপথের পূর্বদিকেও একটি উপাসনা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। সেই মন্দিরের দুই প্রান্তে মহাবীর আর শান্তিনাথ, তাঁদের পিছনে গোমাতা আর পার্শ্বনাথ দাঁড়িয়ে আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে একটি সুপ্রশস্ত সভাগৃহে প্রবেশ করি। বুকে নিয়ে আছে এই সভাগৃহটিও বারোটি নিখুঁত সুষ্ঠুগঠন স্তম্ভ। বিভিন্ন তাদের উচ্চতা—কোনটি তের ফুট দশ ইঞ্চি, কোনটি সাড়ে চোদ্দ ফুট, বিভিন্ন তাদের আকৃতিও—কারও চতুষ্কোণ পাদদেশ আর বৃত্তাকার শীর্ষদেশ, কেউ চতুষ্কোণ, শিরে নিয়ে আছে গদী। বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনুপম, সূক্ষ্মতম অলঙ্করণও, শ্রেষ্ঠ কীর্তি জৈন স্থপতির। দাঁড়িয়ে আছে দুইটি সুন্দর স্তম্ভ গুহার সম্মুখভাগেও—শৈলমালার অঙ্গে। দেখি খোদিত সভাগৃহে পঞ্চাশটি মহাবীরের মহিমময় মূর্তি, দশটি পার্শ্বনাথের মূর্তিও দেখি। অঙ্কিত দেখি তাদের মস্তকের উপর অনেকগুলি জৈনমূর্তি। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণীর মূর্তি, দ্বারে দাঁড়িয়ে দুই দ্বারপাল, নাই তাদের অঙ্গে কোন বসন। মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন জিতেন্দ্রিয় মহাবীর, তাঁর শিরে শোভা পায় তিনটি ছত্র, পদতলে পাশাপাশি উপবিষ্ট মৃগ আর সারমেয়। সিংহাসনের সামনে চারিটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। শোভন গঠন এই মূর্তিগুলিও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জৈন ভাস্করের—অমর কীর্তি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা জানাই।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে শৈলমালার শীর্ষদেশে উপনীত হই। দেখি, মহামহিমময় মূর্তিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট ষোল ফুট উচু পার্শ্বনাথ, তাঁর দক্ষিণে আর বামে ভক্তের দল। দেখি উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি তাঁর সিংহাসনের অঙ্গে। খোদিত এই লিপিটি ১২৩৩-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। উল্লিখিত আছে তাতে "জয়যুক্ত হক প্রসিদ্ধ ১১৫৬ শকাব্দ, হোক পরম স্মরণীয়। ঐ দিন শ্রীবর্ধন পুরাতে রঙ্গিণী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র গালুগী বিবাহ করেন স্বর্ণকে। জন্মগ্রহণ করেন চক্রেশ্বর ও আর তিন পুত্র স্বর্ণের গর্ভে। মহাদানশীল চক্রেশ্বর, তিনিই চারণ পরিক্রমিত এই মহাপবিত্র শৈলমালার শীর্ষদেশে, নির্মাণ

করেন পার্শ্বনাথের এই মহামহিমময় মূর্তিটি। মুক্ত হয় তাঁর কর্মের বন্ধন। নির্মাণ করেন তিনি আরও অনেক জৈনসাধুদের পবিত্র মূর্তি এই চরণদ্রী গিরিশিখরে। মহাতীর্থে পরিণত হয় চরণদ্রী, সমপর্যায়ে পড়ে মহাপবিত্র কৈলাসের, পরিণত করেন ভারত। তিনি বিশ্বাসের জলন্ত প্রতিমূর্তি, পূত আর দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ তাঁর হৃদয়। তিনি দয়ার অবতার, একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমে, দানে কল্পতরুর সমান। চন্দ্রকেশ্বর, রক্ষাকর্তা পবিত্র জৈনধর্মের, পরিণত হন তিনি পঞ্চম বাসুদেবে।

পার্শ্বনাথের মূর্তি দেখে পাহাড় থেকে অবতরণ করে আমরা ট্যাক্সির নিকট উপনীত হই। তারপর চা-পান ও জলযোগ সেরে ট্যাক্সিতে উঠে বসি। তিন মাইল দূরবর্তী গিরিস্থানেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি প্রাতঃস্মরণীয়া, পুণ্যবতী, হোলকারের মহারাণী অহল্যাবাই। রাজত্ব করেন তিনি ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরিচিত এই মন্দিরটি অহল্যাবাইয়ের মন্দির নামে, বুকে নিয়ে আছে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যপদ্ধতি, শীর্ষে নিয়ে আছে ক্রমশীর্ণায়মান শিখারা। অলঙ্কৃত তার সারা অঙ্গ, সুন্দরতম অলঙ্করণে, মুগ্ধ হয়ে দেখি। স্থপতিকে আর মহারাণীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ট্যাক্সিতে উঠে বসি। ঔরঙ্গবাদে ফিরে যাই।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত অপরূপ চিত্র—চিত্র ভূস্বর্গ, অমরাবতী, কৈলাসের, চিত্র বিশ্বের স্থপতির মহাতীর্থ বিশ্বকর্মার, চিত্র স্বপ্নলোক, রহস্যপুরী ইন্দ্রসভারও। ভেসে ওঠে একে একে, মূর্তি কত স্থপতির আর ভাস্করের, মূর্তি কত চিত্রশিল্পীরও হস্তে নিয়ে বিভিন্ন আর বিচিত্র যন্ত্রপাতি। আছেন তাঁদের মধ্যে মুক্তকচ্ছ দ্রাবিড়, পীতবাস বৌদ্ধ, মালকচ্ছ হিন্দু, শ্বেতাম্বর জৈনও আছেন, সজ্জিত তাঁরা কত বিভিন্ন ভূষণে। বলেন, আমরাই রচনা করেছি এই মহান, সুন্দরতম পরিকল্পনা, দিয়েছি তাতে অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপ। করেছি অরূপকে অপরূপ, সুন্দরকে সুন্দরতম, মহানকে মহামহিমময়, অসম্ভবকে করেছি সম্ভব, রচনা করেছি এক স্বর্গপুরী, এক স্বপ্নলোক, দান করেছি অমরত্ব এলোরাকে, নিজেরাও হয়েছি অমর।

ভেঙে যায় তন্দ্রা, ছুটে যায় স্বপ্নের ঘোর, ট্যাক্সি এসে থামে ধর্মশালার দ্বারে, রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে ধরিত্রীর বুকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

১। হাতী গুম্ফা — ২। রাণী গুম্ফা

৩। অলোকাপুরী গুম্ফা — ৪। অনন্ত গুম্ফা

অনেক বছর আগে, একদিন পুরী এক্সপ্রেসে চড়ে পুরী অভিমুখে রওনা হই। গৃহিণীও সঙ্গে যান।

পবিত্র তীর্থ পুরীধাম. ক্ষেত্র দেবাদিদেব জগন্নাথের, লীলাভূমি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের, প২ম সিদ্ধপুরুষ বিজয়কৃষ্ণের ও আরও অনেক সাধু মহাত্মার। এইখানেই লীলান্তে শ্রীচৈতন্যদেব বিলীন যান সাগরের জলে। স্থাপন করেন আচার্যশ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য তাঁর চতুর্থ মঠ। গোবর্ধন মঠ নামে খ্যাতিলাভ করে সেই মঠ। প্রচারিত হয় সেখান থেকে তাঁর অদ্বৈতবাদের বাণী। ছড়িয়ে পড়ে সেই বাণী সারা পূর্বধামে, প্রতিধ্বনিত হয় তার আকাশে, বাতাসে—লাভ করে হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠত্বের আসন, ফিরে পায় লুপ্ত গৌরব।

মহা পুণ্যভূমি এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, পরিচিত বিরাজমণ্ডল আর শ্রীক্ষেত্র নামেও; পরিধি তার দশ যোজন, বিভক্ত চার মণ্ডলে। তার নীলাচলে, শঙ্খমণ্ডলে, সমুদ্রতীরে, মন্দিরে বিরাজ করেন, দারুময় সাক্ষাৎ ভগবান জগন্নাথদেব। অপর দিকে চক্রমণ্ডলে, একাম্রকাননে বা ভুবনেশ্বরে, মহানদীর তীরে, মন্দিরে বিরাজ করেন দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বর, পরিচিত লিঙ্গরাজ নামেও। বৈতরণী তীরে, যাজপুরে, গদামণ্ডল আর চন্দ্রভাগা তীরে অর্কক্ষেত্র বা পদমণ্ডল। মাঝখানে সবুজ বনানী, শীর্ষে নিয়ে পবিত্র শৈলমালা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

কলিঙ্গাধীশ, জীতারীর সঙ্গে চতুর্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের পিতৃস্বসার বিবাহ হয়। তিনি জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়ে এই উদয়গিরিতে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। হন শেষে মুক্ত পুরুষ, পরিণত হন অর্হতে। মহাতীর্থে পরিণত হয় উদয়গিরিও। আসেন এখানে দলে দলে তীর্থযাত্রী, নিযুক্ত হন কঠোর তপস্যায়, লাভ করেন মোক্ষ। বুকে নিয়ে আছে এই খণ্ডগিরি ও

উদয়গিরি প্রাচীনতম গুহামন্দির উড়িষ্যার, অঙ্গে নিয়ে জৈনস্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ দান, আর কলিঙ্গশ্রেষ্ঠ খারবেলের বিজয়ের কাহিনী। শীর্ষে নিয়ে আছে নিকটবর্তী ধাঁউলি শৈলমালা ও প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের শিলালিপি, প্রহরী তার একটি হস্তী, রচিত অশোকের আমলে—প্রতীক এক প্রাচীনতম ভাস্কর্যের। বিরাজ করেন সাক্ষীগোপালও—সাক্ষী তিনি পবিত্রতার। পথ যায় বঙ্কিমগতিতে, স্পর্শ করে যায় জগন্নাথদেবের চরণ, অতিক্রম করে যায় কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত বন-উপবন, অতিক্রম করে সাক্ষীগোপাল, স্পর্শ করে ঘন বনবীথি বেষ্টিত উদয়গিরি আর খণ্ডগিরির পাদদেশ, উপনীত হয় ভুবনেশ্বরে, পবিত্রতম তীর্থস্থান উড়িষ্যার, অন্যতম পবিত্র তীর্থ ভারতেরও। মহাপবিত্র এই পথ, পরিচিত ভায়াশত্র নামে, পবিত্র পথ তীর্থযাত্রীর।

পরিনির্বাণ লাভ করেন বুদ্ধ, বিতরিত হয় তাঁর চারিটি দন্ত। একটি দেবতারা গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়টি নাগেরা, তৃতীয়টি প্রেরিত হয় গন্ধর্বদেশে, চতুর্থটি কলিঙ্গের রাজা লাভ করেন। অপরিজ্ঞাত থেকে যায় অপর তিনটি দন্তের ভবিষ্যৎ। সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে কিন্তু বুদ্ধের চতুর্থ বাম দন্তটি। রচিত হয় একটি স্তূপ কলিঙ্গ দেশে, কলিঙ্গপট্টমে, প্রাচীনতম বৌদ্ধস্তূপ ভারতের বুকে নিয়ে সেই দন্তটি, বুকে নিয়ে তথাগতের স্মৃতি। দন্তপুরা নামে খ্যাতি লাভ করে সেই স্থান, পরিণত হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থে। পরিণত হয় কলিঙ্গ পর্যায়ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের পীঠস্থানে, কেন্দ্রস্থল হয় তাদের সংস্কৃতির ও কৃষ্টির।

অন্ধ্রদের মতই অন্যতম প্রাচীনতম জাতি এই কলিঙ্গরা, বাস করতেন তাঁরাও দক্ষিণ ভারতে, সীমানা তার বৈতরণী নদী থেকে গোদাবরীর তটভূমি পর্যন্ত। লেখা আছে তাঁদের কথা পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও আছে। অধিপতি তাঁরা এক স্বাধীন রাজ্যের, মহাশক্তিশালী, অধিকার করেন ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান। মুগ্ধ তাঁদের শৌর্যে আর সামরিক প্রতিভায়, মুখর তাঁদের প্রশংসায় গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও।

২৭২ খ্রীষ্টপূর্বে, মহারাজ অশোক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে—তিনি জয় করেন কলিঙ্গ। কলিঙ্গ মগধের অধিকারে আসে।

২৩২ খ্রীষ্টপূর্বে মৃত্যু হয় সম্রাট অশোকের, হীনবল হন মৌর্যেরা, কলিঙ্গ ফিরে পায় তার স্বাধীনতা। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, চেত বংশের খারবেল আরোহণ করেন কলিঙ্গের সিংহাসনে। রাজধানী স্থাপিত হয় উদয়গিরির নিকটবর্তী শিশুপালগড়ে। মহাপরাক্রমশালী, প্রতিভাবান, দিগ্বিজয়ী বীর তিনি, পরাভূত করেন পশ্চিমে মূষিক নগরের অধিবাসীদের, দাক্ষিণাত্যে রথিক আর ভোজকদের, উত্তরে বহপতিমিতকে। খুব সম্ভব তিনিই পাটলিপুত্রের অধিপতি পুষ্যমিত্র। তাঁর বিজয়বাহিনী অতিক্রম করে উত্তরে মগধ আর অঙ্গদেশ, পশ্চিমে তামিলনাদ। উল্লিখিত আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী হাতীগুম্ফার শিলালিপিতে।

নিবদ্ধ থাকে না তাঁর কীর্তি শুধু রাজ্যজয়েই। তিনি সংস্কার করেন রাজধানী কলিঙ্গ নগরের ভগ্ন দুর্গপ্রাচীর আর তোরণ, সংস্কৃত হয় একটি পয়ঃপ্রণালীও, নির্মাণ করেন মগধের নন্দরাজা। তিনিই স্থাপন করেন কুমারী পর্বতের শীর্ষদেশে একটি জয়স্তম্ভ। শ্রেষ্ঠ রাজা কলিঙ্গের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা প্রাচীন ভারতেরও, অধিকার করেন খারবেল এক বিশিষ্ট স্থান ভারতের ইতিহাসের পাতায়।

খারবেলের মৃত্যুর পরে, বুকে নিয়ে আছে কলিঙ্গ ইতিহাস এক উত্থান আর পতনের, জয় আর পরাজয়ের, স্বাধীনতার আর পরাধীনতার। অধীনতা স্বীকার করতে হয় তাদের বঙ্গাধীশ, প্রবল পরাক্রান্ত শশাঙ্কের আর দেবপালের কাছে, মগধের গুপ্তরাজাদের আর কনৌজে হর্ষবর্ধনের কাছেও। জন্মায় না খারবেলের মত কোন দিগ্বিজয়ী বীর কলিঙ্গের রঙ্গমঞ্চে, চিরস্মরণীয় হন না কোন রাজা ইতিহাসের পাতায়।

এমন করেই অতিবাহিত হয় বহুশত বৎসর। শেষে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় কলিঙ্গদেশে মহাশক্তিশালী কেশরীবংশ। স্থাপন করেন বীরশ্রেষ্ঠ যযাতী। অলঙ্কৃত করেন এই বংশের চল্লিশ জন নৃপতি কলিঙ্গের সিংহাসন। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা, অসংখ্য মহামহিমময় মন্দির দিয়ে সাজান পবিত্র ভুবনেশ্বরের বুক, হয় সে মন্দিরময়।

১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় চোড় গঙ্গবংশ উড়িষ্যায়। স্থাপন করেন মহাপরাক্রমশীল অনন্ত বর্মণ চোড় গঙ্গ। রাজত্ব করেন তিনি ১০৭৬ থেকে

১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সপ্ততি বৎসর। বিস্তৃত তাঁর রাজ্যের সীমানা গঙ্গা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত। উৎসাহী তিনি ধর্ম প্রচারের, পৃষ্ঠপোষক তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষার। তিনিই নির্মাণ স্বরু করেন মহামহিমময় জগন্নাথের মন্দির পুরীতে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের,—এক সৃষ্টির।

নরসিংহই শ্রেষ্ঠ রাজা চোড়গঙ্গ বংশের। তিনি অলঙ্কৃত করেন উড়িষ্যার সিংহাসন ১২৩৪ থেকে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ব্যাহত করেন তিনি উড়িষ্যায় মুসলমান আক্রমণ। প্রবেশ করতে পারে না বাংলার মুসলমান শাসকেরা উৎকলে। তাঁর রাজত্বকালেই পরিসমাপ্তি হয় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ। তিনিই নির্মাণ করেন কোনারকে বিখ্যাত সূর্যমন্দির, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন, প্রতীক এক অমর কীর্তির। এই মন্দিরেই উড়িষ্যার স্থাপত্য লাভ করে চরম উৎকর্ষ, পূর্ণপরিণতি।

হীনবল হন চোড়গঙ্গরা, মহা প্রবল হন কলিঙ্গদেশে, গজপতিরা। কপিলেন্দ্র এক দিগ্বিজয়ী বীর এই বংশের, অধিকার করেন কলিঙ্গের সিংহাসন ১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। মহাপরাক্রমশালী তিনি, প্রতিভাবানও। তাঁর বিজয়বাহিনী উৎকল অতিক্রম করে উপনীত হয় দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত, পৌঁছায় বাহমনী রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে, বিদরে। তাঁর কাছে পরাভূত হন বিজয়নগরের বিজয়ী রাজারাও। কাঞ্চীপুরম ও উদয়গিরি তাঁর অধিকারে আসে। উল্লিখিত আছে গোপীনাথপুরের শিলালিপিতে। উৎকল ফিরে পায় তার পূর্ব-গৌরব।

পুরুষোত্তম ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজত্ব করেন ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিজয়নগরের নরসিংহ শালুব অধিকার করেন কৃষ্ণার দক্ষিণ ভূভাগ, গোদাবরী, কৃষ্ণা, দোয়াব বাহমনীদের অধিকারে আসে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুনরায় দোয়াব অধিকার করেন, অন্ধ্রদেশের কিয়দংশও তাঁর অধিকারে ফিরে আসে।

তাঁর পুত্র প্রতাপ রুদ্রদেব অলঙ্কৃত করেন উড়িষ্যার সিংহাসন ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত তাঁর রাজ্যের সীমানা বঙ্গদেশের মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা থেকে মাদ্রাজে গুণ্টুর জেলা পর্যন্ত। তেলিঙ্গানার কিয়দংশও

তাঁর অধিকারে আসে। সমসাময়িক তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের, দীক্ষিত বৈষ্ণবধর্মে, শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্তও। মহাপরাক্রান্ত হন বিজয়নগর-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগরে, হন গোলকুণ্ডার মুসলমান সুলতানও পূর্ব-উপকূলে। তিনবার উড়িষ্যা আক্রমিত হয়। বাধ্য হন উড়িষ্যাভূপ প্রতাপ রুদ্রদেব সন্ধি করতে, ছেড়ে দিতে গোদাবরীর দক্ষিণ পারের বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিজয়নগরকে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে কপিলেন্দ্র বংশের পতন সুরু হয়। শেষে ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হন কপিলেন্দ্র বংশের শেষ রাজা, প্রতাপ রুদ্রদেবের মন্ত্রী গোবিন্দের হস্তে। স্থাপিত হয় ভোই রাজবংশ উড়িষ্যায়। ছিলেন তাঁরা লেখক শ্রেণীভুক্ত।

রাজত্ব করেন ভোইবংশ, উড়িষ্যার সিংহাসনে, মোটে আঠার বছর। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, মুকুন্দ হরিচন্দন অধিকার করেন উড়িষ্যার সিংহাসন। বিতাড়িত হন ভোইবংশের রাজা। ব্যাহত করেন তিনি উড়িষ্যায় মুসলমান আক্রমণ, কিছুদিন পর্যন্ত। ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুসলমান শাসক সুলেমান কররাণী আক্রমণ করেন উৎকল। সেনাপতি তাঁর কালাপাহাড়, এক বিধর্মী হিন্দু। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন মুকুন্দ হরিচন্দন। ধ্বংসে পরিণত হয় জগন্নাথদেবের মন্দির। ধ্বংস করেন কালাপাহাড়। পরিসমাপ্তি হয় উৎকলে হিন্দুরাজত্বের। অন্তর্হিত হয় হিন্দু ক্ষমতা, হিন্দু শৌর্য, হিন্দু গৌরব সঙ্গে নিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু কৃষ্টি উৎকল থেকে। সুরু হয় উৎকলের অধিকার নিয়ে মুঘল ও আফগানের সংঘর্ষ।

আমরা খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করি। তার পর চা ও জলযোগ সেরে স্টেশন ওয়াগনে চড়ে খণ্ডগিরি, উদয়গিরি অভিমুখে রওনা হই। শহর অতিক্রম করে কটক রোডে উপনীত হই। গাড়ি নক্ষত্রগতিতে ছোটে। আমরা অতিক্রম করি কত ঘনবসতি গ্রাম, কত দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর, কত নারিকেলকুঞ্জ আর কলাগাছের ঝাড়, উপনীত হই মহাতীর্থ ভুবনেশ্বরে, পরিচিত একাম্রকানন নামেও। সেখানে মন্দির দেখে, আবার আমরা স্টেশন ওয়াগনে উঠে বসি। গাড়ী যায় সর্পিল গতিতে, দু-পাশের ঘন-বনবীথি আর অরণ্যানী ভেদ করে। উপনীত হয় একটি সংকীর্ণ গিরিপথে, উদয়গিরির পাদদেশে এসে থামে। দাঁড়িয়ে আছে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

শৈলমালা, ভুবনেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পৃথক হয়ে আছে একটি গিরিসঙ্কট দিয়ে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে ঘন বনানীর ভিতর দিয়ে পর্বত আরোহণ করে হাতীগুম্ফাতে উপস্থিত হই। কষ্টসাধ্য এই পর্বত-আরোহণ। মহাপবিত্র খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি শৈলমালা, পরিচিত কুমারী পর্বত নামেও। দীর্ঘ দু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ভারতের জৈনদের, দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, কলিঙ্গের প্রাচীনতম চেদীরাজবংশের রাজধানী, শিশুপালগড় থেকে পাঁচ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে। তার এক দিকে তীর্থরাজ সমুদ্রতীরে নীলাচলে শঙ্খমণ্ডলে, জগন্নাথদেব বিরাজ করেন। অপর দিকে মহানদী তীরে, ভুবনেশ্বরে চক্রমণ্ডলে লিঙ্গরাজ। তৃতীয় দিকে চন্দ্রভাগা তীরে, অর্কক্ষেত্রে পদ্মমণ্ডলে কোনারক।

বুকে নিয়ে আছে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পঁয়ত্রিশটি জৈন গুহামন্দির। তাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়—রচিত হয় সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলি। নির্মিত হয় কয়েকটি মন্দির খ্রীষ্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও। কয়েকটি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে খণ্ডগিরির বুকে। পুনরুজ্জীবিত হয় যখন উড়িষ্যার স্থাপত্য আর ভ.স্কর্য, নির্মিত হয় যখন শত শত মন্দির মন্দিরময় নগর ভুবনেশ্বরে।

একটি অগভীর প্রাকৃতিক গুহা এই হাতীগুম্ফা, রচিত নয় পাহাড়ের অঙ্গ কেটে। বুকে নিয়ে আছে এই গুহাটি খোদিতলিপি, উৎকীর্ণ খ্রীষ্টের জন্মের একশত ষাট বৎসর পূর্বে। জৈন অর্হৎ ও সিদ্ধদেবকে প্রণতি জানিয়ে বর্ণিত হয় এই লিপিতে কলিঙ্গ দেশের শ্রেষ্ঠ রাজা খারবেলের কীর্তির কাহিনী, বিবরণ তাঁর রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীরও। প্রথম বছরে তিনি সংস্কার করেন দুর্গপ্রাচীর, তোরণ আর পয়ঃপ্রণালী। পঞ্চম বৎসরে বর্ধিত হয় অম্বুলিয়াবস্থ প্রণালীর আয়তন, বিস্তৃত হয় রাজধানী শিশুপালগড় পর্যন্ত। নবম বর্ষে আটত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজপ্রাসাদ 'মহাবিজয়' নির্মিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় মহা আড়ম্বরে কল্পতরু উৎসবও, তিনি রাজচক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত হন। দ্বাদশ বৎসরে তিনি মগধ বিজয় করে ফিরে আসেন, ফিরিয়ে আনেন মহা পবিত্র কলিঙ্গ জিনা। হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন মগধের নন্দরাজারা। ত্রয়োদশ বৎসরে সমাপ্ত তাঁর বিজয়ের অভিযান, তিনি মনোনিবেশ করেন ধর্ম-কর্মে,

নিযুক্ত হন ধর্মগ্রন্থ পাঠে। অধ্যয়ন করেন কত জৈন ধর্মগ্রন্থ, হন দীক্ষিতও। নির্মিত হয় কুমারী পর্বতের শীর্ষদেশে, সাড়ে সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহারাণীর বাসের জন্য একটি অট্টালিকাও। সংগৃহীত হয় তার জন্য প্রস্তরখণ্ড বহু দূরে অবস্থিত পাহাড় থেকে। বর্ণিত হন তিনি ধার্মিক নৃপতি, বলা হয় তাঁকে ভিক্ষুরাজাও। মহাসমৃদ্ধিশালী তাঁর রাজ্য, বিরাজ করে সেখানে মহা শান্তি। প্রজারঞ্জনকারী তিনি, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও। প্রতিষ্ঠা করেন এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য, নির্মাণ করেন কত প্রাসাদ আর অট্টালিকা, নির্মিত হয় একটি দুর্ভেদ্য দুর্গও।

এইখানেই পরিসমাপ্তি হয় তাঁর রাজত্বের বিবরণ। কিন্তু জীবিত থাকেন মহাপরাক্রমশালী খারবেল তার পরেও বহু বৎসর। বুকে নিয়ে আছে তার প্রমাণ স্বর্গপুরী গুম্ফার অঙ্গের শিলালেখ, উৎকীর্ণ তাঁর মহিষী মহারাণী অগ্রমহিষী কর্তৃক।

মুখরিত হত এই সময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি আর তার চতুর্দিক জৈন সাধকদের ধর্মগ্রন্থ পাঠে। তাঁদের উদাত্ত-কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে আর বাদ্য-ধ্বনিতে। সমাগত হতেন এখানে কত জৈন সাধু, কত নৃপতি, কত জৈন তীর্থযাত্রীও। প্রকম্পিত হত তাঁদের কলকোলাহলে আর উৎসবের ধ্বনিতে তার আকাশ-বাতাস।

হাতীগুম্ফা দেখে আমরা একে একে অন্য গুহামন্দিরগুলি দেখতে থাকি। দেখি, নাই কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এই মন্দির নির্মাণের, রচনা করেন স্থপতি মন্দিরগুলি যথোপযুক্ত স্থানে। একটি পথও তৈরী হয়, যুক্ত হয় মন্দিরগুলি পরস্পরের সঙ্গে, আজও পাহাড়ের বুকে অরণ্যানীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় তার চিহ্ন, অবশিষ্ট সেই পথের।

বুকে নিয়ে আছে দুইটি মন্দির একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ। রচিত হয় একাধিক প্রকোষ্ঠ চারিটি মন্দিরে, অলিন্দ দিয়ে শোভিত করা হয় তাদের সম্মুখভাগ। অলিন্দের তিন দিকে অনুচ্চ প্রস্তরনির্মিত দীর্ঘ আসন। অলিন্দের সামনে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। চারিটি বৃহত্তম ও সুবিস্তৃত মন্দিরও নির্মিত হয়। দ্বিতল এই মন্দিরগুলি, বুকে নিয়ে আছে মঞ্চ আর প্রকোষ্ঠ উভয় তলাতেই ; তাদের সামনেও চতুর্ভুজ ক্ষেত্র, নাই কোন আচ্ছাদন তাদের উপরেও, উন্মুক্ত তারাও। অনুরূপ নয় তারা মহারাজা অশোকের নির্মিত আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের,

বিভিন্ন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গের বৌদ্ধ গুহামন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকেও, আচ্ছাদিত তারাও।

বুকে নিয়ে আছে বৃহত্তম মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ। তাদের সম্মুখের স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ আর প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথ, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম উড়িষ্যার স্থাপত্যের নিদর্শন—উড়িষ্যার বিহারের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, অঙ্গে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের প্রতীক ও অনবদ্য সুষ্ঠুগঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভার।

রচিত হয় স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে চতুষ্কোণ স্তম্ভদণ্ড, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী। বিচিত্র সেই বন্ধনীর আকৃতি, বিভিন্ন প্রতিটির নির্মাণ পদ্ধতিও। শীর্ষে নিয়ে আছে রাণীগুম্ফার স্তম্ভ আদি বন্ধনী, রূপ তার বঙ্কিম বৃক্ষকাণ্ডের মত। সুষ্ঠু নয় এই বন্ধনীর গঠন, নয় শোভনও, সমৃদ্ধিশালী নয় তাদের অঙ্গও ভাস্করের হস্তের স্পর্শে, কারুকার্যবিহীন। অনবদ্য মঞ্চপুরীর অলিন্দের স্তম্ভের বন্ধনী, পরিচায়ক প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যজ্ঞানের, সমৃদ্ধিশালী মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শেও। অঙ্গে নিয়ে আছে এই বন্ধনীগুলি কত পক্ষীরাজ ঘোড়া, কত কাল্পনিক জন্তু, তাদের কারও পৃষ্ঠে শোভা পায় নর, কেউ বা নারীবাহন। অনুরূপ বন্ধনী দিয়ে শোভিত করা হয় ধারোয়ারের নিকটে বাদামীর বা বাতাপির ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দিরের শীর্ষদেশ। রচনা করেন চালুক্য স্থপতি আর ভাস্কর ছয় শত বৎসর পরে।

রচিত হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি তোরণও প্রাচীরের গাত্রে। বিভিন্ন বৌদ্ধ-তোরণের আকৃতিতে দাঁড়িয়ে আছে উড়িষ্যার মন্দিরের তোরণ, দুই পাশের উদ্গত স্তম্ভের শীর্ষদেশে। শোভা পায় দুইটি করে শায়িত জন্তু উদ্গত স্তম্ভের শীর্ষদেশে, পাত্রাকারে নির্মিত হয় তাদের পাদদেশ। বৌদ্ধ গুহামন্দিরের মত সমতল নয় প্রকোষ্ঠের মেঝেও, ক্রম উর্ধ্বমান হয়ে উঠে যায় প্রকোষ্ঠের অন্তরতম প্রদেশে, রচিত হয় প্রান্তদেশে উপাধান, রূপ পরিগ্রহ করে হেলান শয্যার। নয় চতুষ্কোণও, আয়ত ক্ষেত্র এই প্রকোষ্ঠগুলি, নীচু ও চারি ফুটের বেশী উঁচুও নয়, উপযুক্ত শুধু শয়নের। অপ্রশস্ত দ্বারগুলিও, হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। তাই অনন্যসাধারণ এই মন্দিরগুলিও, বুকে নিয়ে আছে উড়িষ্যার স্থপতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

আমরা মঞ্চপুরীতে উপনীত হই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির উদয়গিরির

নির্মিত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটি তিনটি প্রকোষ্ঠ। প্রথম দুইটি কুদেপশ্রী ও ভাদুকা নির্মাণ করেন, তৃতীয়টি খুব সম্ভব খারবেল। হেলান শয্যার আকারে নির্মিত এই প্রকোষ্ঠগুলির মেঝেও। বিস্মিত হয়ে সম্মুখ ভাগের কেন্দ্রস্থলের মূর্তিসম্ভার দেখি। দেখি, কলিঙ্গ জিনার পুনঃ প্রতিষ্ঠার দৃশ্য। কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে উপবিষ্ট কলিঙ্গ জিনা, তাঁর দুই পাশে রাজন্যবর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। রাণীরা আর রাজকন্যারাও আছেন, খারবেল, কুদেপশ্রী আর রাজকুমার ভাদুকাও উপস্থিত। একটি উড়ন্ত বিদ্যাধর ও দুইটি গন্ধর্ব ঢকা বাদনে নিযুক্ত। খোদিত আছে এই বিহারটির অঙ্গে দুইটি শিলালিপিও। প্রথমটির রচয়িতা কলিঙ্গাধিপতি মহারাজা কুদেপশ্রী, দ্বিতীয়টির কুমার ভাদুকা।

স্বর্গপুরীতে উপনীত হই। সমসাময়িক মঞ্চপুরীর, দুই প্রকোষ্ঠ সমন্বিত এই বিহারটি। জৈন সাধুর শয়নোপযোগী করে নির্মিত তাদের মেঝেও। দুই প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি, লেখা আছে তাতে মহারাজ খারবেলের পত্নী এই বিহারটি নির্মাণ করেন। রচিত হয় সম্মুখ ভাগে উদগত স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারিটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি অপরূপ, সুন্দরতম তোরণ, তোরণের অঙ্গে দুইটি জীবন্ত হস্তীমূর্তি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে কলিঙ্গের মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান।

সেখান থেকে জয়-বিজয় গুম্ফায় উপনীত হই। দ্বিতল এই গুম্ফাটি নির্মিত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতাব্দীতে, বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি তলায় দুইটি করে চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ, আর একটি অলিন্দ, অলিন্দের তিন দিকে অনুচ্চ দীর্ঘ আসন। সম্মুখে একটি সোপানের শ্রেণী, সেই সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হতে হয়। দেখি, দ্বিতলের অলিন্দের দুই প্রান্তে দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ, অপরটি নারী। দেখি অঙ্গে নিয়ে আছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ একটি করে প্রবেশ পথ, অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের আকারে রচিত তাদের শীর্ষদেশ—তাদের দুই পাশে বোধিবৃক্ষ, পরিপূর্ণ ফলসম্ভারে, বেষ্টিত সুন্দরতম রেলিং দিয়েও। বৃক্ষের দক্ষিণে আর বামে থালা ভর্তি পূজার উপকরণ হস্তে নারী পূজারিণীরা। ভক্তিপ্রণত তাদের মস্তক, আননে দিব্যভাব। অঙ্গে নিয়ে আছে এই গুহাটিও, কত

বিভিন্ন সুন্দরতম পুষ্প আর কত বামনের মূর্তি হস্তে নিয়ে কেউ থালা, কেউ পূজার উপকরণ, কেউ বা পুষ্পমাল্য, শিরে শিরোভূষণ। অপরূপ এই মূর্তিগুলি মুগ্ধ হয়ে দেখি।

রাণীগুম্ফায় উপনীত হই। পরিচিত রাণীকাস্থুর নামেও বৃহত্তম আর সুন্দরতম, সর্বশ্রেষ্ঠও উড়িষ্যার গুহামন্দিরের মধ্যে, নির্মিত হয় মহারাজা খারবেলের রাজত্বকালে, খ্রীষ্টের জন্মের একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁর রাণীর বাসের জন্য। বিহার আর চৈত্যের এক সুন্দরতম সমন্বয় এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে বাস করবার জন্য কক্ষ, সঙ্গে নিয়ে ধর্ম মন্দির। দ্বিতল এই বিহারটি, তিন ফুট এগার ইঞ্চি তার নীচের তলার উচ্চতা। বেষ্টন করে আছে প্রকোষ্ঠগুলিকে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিক, চতুর্থ দিকে, দক্ষিণ পূর্ব কোণে, মন্দিরের প্রবেশপথ। দোতলা থেকে একটি উন্মুক্ত ছাদ নির্গত হয়, তার নীচে স্তম্ভের শ্রেণী। নীচের তলায় একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। নির্মিত হয় তার এক পাশে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে সোপানের শ্রেণী, উপনীত হয় দ্বিতলের উন্মুক্ত ছাদে। সোপান-শ্রেণীর সম্মুখে একটি বৃহৎ সিংহাসনও তৈরী হয়, উপবেশন করতেন সেই সিংহাসনে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, বাস করতেন প্রকোষ্ঠে জৈন সাধুরা। নির্মিত হয় প্রকোষ্ঠ পরিচ্ছদ রাখবার জন্য, পূজার উপকরণ সাজাবার জন্য, পূজার জন্য পবিত্র তৈজস রাখবার জন্যও।

উৎসবে মুখরিত হ'ত সম্মুখের উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ। যাত্রী আসত সারা উড়িষ্যা থেকে, বিদেশ থেকেও আসত—প্রণতি জানাত জিনকে—জানাত মহাবীরকে।

সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হই। সাত ফুট উঁচু দ্বিতলের প্রকোষ্ঠগুলি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দ্বিতলের প্রাচীরের গাত্রের মূর্তিসম্ভার দেখি। মূর্তি দিয়ে বর্ণিত কত কাহিনী। দেখি প্রাচীরের অঙ্গে ভাস্করের রচিত এক মহামহিমময়, বহুবিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ, জীবন্ত মহা-অভিজ্ঞ ভাস্করের হস্তের স্পর্শে।

পরমাসুন্দরী নারী পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ করেন এক মহাশক্তিশালী নৃপতি হস্তীযূথ পরিবৃত একটি অতিকায় হস্তীর সঙ্গে। তার পাশেই একটি গভীর অরণ্য, বাস করে সেই অরণ্যে, গুহার মধ্যে, পশুরাজ সিংহ, বিচরণ করে কত

হিংস্র ব্যাঘ্র, কত ভয়াল সর্প আর বানর, তার বৃক্ষশাখায় কত বিভিন্ন আর বিচিত্র পক্ষী।

দেখি, সঙ্ঘের সামনে একটি পরমারূপবতী নারী ও একটি সুন্দর দর্শন পুরুষ। রুদ্ধ করে নারী পুরুষের গতি কিন্তু নারীকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয় পুরুষটি, প্রবেশ করে সঙ্ঘে।

দেখি, যুদ্ধের সাজে সজ্জিত, একটি পুরুষ ও নারী, বিস্তৃত নারীর উড়ন্ত বেণী। নারী পরাজিত হয়, তাকে অঙ্কে তুলে নিয়ে অগ্রসর হয় পুরুষটি। কিন্তু স্বীকার করে না নারী তার পরাজয়, দক্ষিণ হস্তে পুরুষকে অনুশাসন করে, তার বাম হস্তে শোভা পায় একটি ঢাল।

দেখি, এক নৃপতি নিযুক্ত মৃগয়ায়। তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করেন, অশ্বের বল্গা ধরে থাকে সহিস। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বিদ্যুৎবেগে পলায়ন করে মৃগ, মস্তকে তার দুইটি বিশাল শৃঙ্গ, তার অনুগমন করে দুইটি মৃগশাবক। ছুটে এসে মৃগ বৃক্ষের নীচে দণ্ডায়মানা তার অধিকর্ত্রীর কাছে আশ্রয় নেয়। মৃগের অনুসরণ করে নৃপতি দুষ্মন্তও শকুন্তলার নিকটে উপনীত হন, পৌছান মৃগের অধিকর্ত্রীর কাছে।

একটি নৃত্য-সভার দৃশ্যও দেখি। নৃত্য করেন তিনটি রূপবতী নারী, অনবদ্য তাঁদের নৃত্যের ছন্দ, নৃত্য করেন বাদ্যের তালে তালে, অপর তিনটি পরমা সুন্দরী নারী সেই বাজনা বাজান। এক প্রান্তে উপবেশন করে সখী পরিবৃতা হয়ে মহারাণী সেই নৃত্য দর্শন করেন। তাঁর পিছনেও দুইটি রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছে হস্তে নিয়ে পাত্র, পাত্রের উপরে আর একটি পুষ্পমাল্য। বিপরীত দিকে বসে, রাজাও সেই নৃত্য দেখেন। তাঁর সামনে এক সারি আধার, পরিপূর্ণ মণিমুক্তায়, বিতরিত হবে বিজেতাদের পারিতোষিক হিসাবে।

দেখি, সারি সারি তিনটি রাজদম্পতির মূর্তিও। প্রথম দুটিতে উপবিষ্টা রাণী রাজার অঙ্কে, তৃতীয়টিতে হন তিনি অঙ্কচ্যুতা, রাজাও বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। কিন্তু হতে চান না রাণী ক্রোড়চ্যুতা, নৃপতিকে সবলে আকর্ষণ করে থাকেন। দেখি ঘুরে ঘুরে এই অপরূপ মূর্তির সম্ভার, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কলিঙ্গ ভাস্করের—তাদের অমর কীর্তি। যত দেখি, বিস্ময় বাড়ে তত।

নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি মহা-অভিজ্ঞ ভাস্করকে, লাভ করেন তাঁরা অমরত্ব, সৌভাগ্যশালী হয় ভারতবর্ষ।

দেখি, অলঙ্কৃত হয় নারীমূর্তি দিয়েই অলিন্দের স্তম্ভের অঙ্গ অনুরূপ সাঁচীর পশ্চিম তোরণের স্তম্ভের অঙ্গের। প্রবেশপথেও সিংহ বাহনে নরের মূর্তি দেখি, অনুরূপ মৌর্য, যক্ষের। দ্বারে দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে হস্তে নিয়ে কঞ্চুক। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি বৌদ্ধ প্রভাব।

নীচে নেমে আসি। দেখি দ্বারের অঙ্গে দ্বারপালের মূর্তি। দেখি প্রাচীরের গাত্রে একটি অরণ্যের অপরূপ দৃশ্য। ঘন বনবীথি ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ একটি অরণ্য। সেই অরণ্যে কত মৃগ, কত ব্যাঘ্র, কত সিংহ বিচরণ করে। বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট কত বিভিন্ন আর বিচিত্র পক্ষী, শোনা যায় তাদের কাকলি। অরণ্যের সম্মুখে একটি সরোবর, সেই সরোবরে একটি হস্তী ক্রীড়ায় নিযুক্ত, বৃক্ষশাখায় বসে বৃক্ষের ফল খেতে খেতে একটি বানরদম্পতি উপভোগ করে সেই খেলা। এক সুন্দরতম পরিকল্পনা আর তার অনবদ্য রূপদান। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে।

দেখি উদ্গাত স্তম্ভের সারি দিয়ে অলঙ্কৃত সম্মুখ ভাগ, তার পাশে একটি আম্রকুঞ্জ, দাঁড়িয়ে আছে একটি পুণ্যশালাও। অন্তর্হিত হয়েছে অলিন্দের মূর্তিগুলি। খুব সম্ভব এখানে প্রাচীরের গাত্রে খোদিত ছিল কলিঙ্গাধিপতি, মহাপরাক্রমশালী খারবেলের বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসার দৃশ্য, দৃশ্য তাঁর অভিনন্দনেরও, অভিনন্দন নগরবাসীদের।

উপনীত হই উত্তর প্রান্তে, দেখি গুহার অভ্যন্তরেও কত বিভিন্ন জন্তুর মূর্তি—কত সিংহের, কত ব্যাঘ্রের মূর্তি। পরিপূর্ণ অরণ্য আম্রবৃক্ষে, অরণ্যের বৃক্ষের কাণ্ডে কত বিচিত্র পক্ষী আর বানর।

একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি, দেখি একটি দীর্ঘদেহী সাড়ে চার ফুট উঁচু প্রমাণ আকৃতির সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে, তার হস্তে একটি বল্লম, শিরে শোভা পায় মুকুট, মুকুটের অঙ্গে জন্তুর মূর্তি—মূর্তি ষণ্ডের, সিংহের, হস্তীর আর অশ্বের। জীবন্ত এই মূর্তিটি, সুন্দরতম দান কলিঙ্গ ভাস্করের, দেখি মুগ্ধবিস্ময়ে।

দেখি দুই পাশের নিকুঞ্জও। রক্ষিত হত এখানে জৈন ধর্মগ্রন্থ, রাখা হ'ত মহাপবিত্র কমণ্ডলুও। অনবদ্য জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়ে সমৃদ্ধিশালী এই

নিকুঞ্জের সামনের রেলিংয়ের অঙ্গও, দেখি মুগ্ধ হয়ে। অগ্রসর হয় কত রূপবতী নারী, হস্তে নিয়ে পূজার উপকরণ, যায় মন্দির অভিমুখে। সিংহাসনে নৃপতি উপবিষ্ট, তাঁর দুই পাশে দুই রাণী, পদতলে, সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপের নীচে, একটি পরমাসুন্দরী নারী নিযুক্তা নৃত্যে, অনবদ্য তার নৃত্যের ছন্দ নিখুঁত তার তাল। হস্তে নিয়ে আছে দ্বিতীয় নারীটি একটি করতাল, তৃতীয়টি বীণা বাজায়, চতুর্থটি বেণু। শোভা পায় কুণ্ডল নারীদের কর্ণে। বিচিত্র বীণার আকৃতিও। ভারহুতের মত, পিরামিডের আকৃতিতে নির্মিত হয় চন্দ্রাতপের শীর্ষদেশ।

মন্দির অভিমুখে ভূপতি অগ্রসর হন, তাঁর অনুগমন করেন একটি সুন্দরী নারী, নারীর হস্তে একটি পাত্র, পরিপূর্ণ পূজার উপকরণে। রাজার মস্তকে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, তার উপরে রাজছত্র বিরাজ করে। দেখি স্তব্ধ হয়ে ভাস্করের এই অনবদ্য, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি ভাস্করকে।

গণেশগুম্ফায় উপনীত হই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির উদয়গিরির এই গুম্ফাটিও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়। দাঁড়িয়ে আছে একতলা গুম্ফাটি, উদয়গিরির উচ্চতম শিখরে, অঙ্গে নিয়ে আছে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও একটি আচ্ছাদিত অলিন্দ, বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভ—চতুষ্কোণ তার পাদদেশ আর শীর্ষদেশ অষ্টকোণ স্তম্ভদণ্ড। স্পর্শ করে আছে তাহাদের শীর্ষদেশের বন্ধনী অলিন্দের ছাদ। দেখি অলিন্দের বামে উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে বল্লম হস্তে নিয়ে একটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। দেখি প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দুইটি করে দ্বার, দ্বারের শীর্ষদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান, তার উপরে রেল, অলিন্দের তিন দিকে প্রাচীরের সংলগ্ন দীর্ঘ প্রস্তর নির্মিত আসন।

দেখি মূর্তি দিয়ে বর্ণিত এই গুম্ফার প্রাচীরের গাত্রেও কত কাহিনী—কাহিনী কত সামাজিক জীবনের—ক্ষুদ্র সংস্করণ তারা রাণীগুম্ফার।

দেখি একটি নারীকে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে ধরে নিয়ে যায়। বিবাদমান একটি পুরুষ ও নারীকেও দেখি। তার পাশে একটি পুরুষ নারীর অনুগমন করে, গুহার সামনে গিয়ে শয়ন করে, তার সর্বাঙ্গ বিস্তার করে রুদ্ধ করে গুহার মুখ, নারী এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে।

দেখি অলিন্দের বাম প্রান্তে রেলিংয়ের উপরে স্তম্ভশীর্ষের পাশে, কিরাত সৈন্যেরা অনুসরণ করে একটি হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দলকে। আছে তাদের মধ্যে একটি নারী হস্তে নিয়ে অঙ্কুশ, নৃপতিও আছেন, তাঁর অঙ্গে কিরাতের ভূষণ, পল্লব দিয়ে রচিত সেই ভূষণ, হস্তে ধনুর্বাণ, নিক্ষিপ্ত হয় শর অনুসরণকারী সৈনিকদের উপর। আছে অনুচরও হস্তে নিয়ে মুদ্রা, ভূপতিত হয় মুদ্রা সেই আধার থেকে, প্রলুব্ধ হয় অনুসরণকারীরা। দেখি হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নৃপতি অবতরণ করেন, সঙ্গে নিয়ে রমণী আর অনুচর। ধনুহস্তে ভূপতি অগ্রসর হন, তাঁর পিছনে রমণী, হস্তে নিয়ে ফল। মুদ্রার আধার হস্তে অনুচর তাঁদের অনুগমন করেন। বসে পড়েন রমণী, বিলাপ করতে থাকেন, তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রাজা তাকে সান্ত্বনা দেন। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে অনুচর, তার এক হস্তে রাজার ধনু অপর হস্তে মুদ্রাধার। বিস্তৃত এই পরিকল্পনাটি আর তার সুন্দরতম রূপদান। বুকে নিয়ে আছে প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির।

দেখি নারীমূর্তি দিয়ে রচিত এই স্তম্ভের শীর্ষদেশ, অনুরূপ সাঁচীর স্তম্ভের। তোরণের দুই পাশে উদ্গত স্তম্ভ, তাদের শীর্ষদেশে এক একটি অপরূপ মকরের মূর্তি, তাদের মুখগহ্বর থেকে লতাপল্লব নির্গত হয়। অনুরূপ এই মূর্তি দুইটি, অমরাবতীর মকরের মূর্তির।

মূর্তি দিয়েই অলঙ্কৃত স্তম্ভের শীর্ষদেশের, বন্ধনীর অঙ্গও—মূর্তি রাজার, মূর্তি একটি শোভন নর ও একটি সুন্দরী নারীরও। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অপরূপ মূর্তিসম্ভার দেখি, দেখি ভাস্করের এক অনুপম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের।

প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করি। একটিতে একটি মুনি দাঁড়িয়ে আছেন, দ্বিতীয়টিতে প্রাচীরের গাত্রে একটি গণেশের মূর্তি। তাই পরিচিত এই গুম্ফাটি গণেশগুম্ফা নামে। অঙ্গে নিয়ে আছে গুম্ফাটি একটি শিলালিপিও। উৎকীর্ণ করবংশীয় শান্তিদেবের রাজত্বকালে, রাজত্ব করেন তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

গণেশগুম্ফা দেখে আমরা ছোট হাতীগুম্ফাতে উপনীত হই। এক প্রকোষ্ঠসমন্বিত এই গুম্ফাটি। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জৈন শ্রমণদের বাসের জন্য নির্মিত হয়। তার সম্মুখভাগে দুইটি প্রমাণ আকৃতির হস্তী

দাঁড়িয়ে আছে। শুণ্ডে ধারণ করে আছে হস্তী দুইটি, পূজার জন্য পুষ্প। অনবদ্য এই হস্তী দুইটির গঠনসৌষ্ঠব, একেবারে জীবন্ত। দেখি মুগ্ধ হয়ে কলিঙ্গ-ভাস্করের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি।

অলোকাপুরীগুম্ফায় উপনীত হই। নির্মিত হয় এই গুম্ফাটিও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রকোষ্ঠ, বাসস্থান জৈন শ্রমণদের। অলঙ্কৃত এই গুহামন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটি একটি অপরূপ পরমারূপবতী নারীমূর্তি দিয়ে। পীনোন্নত, যৌবনপুষ্টা, তাঁর অনাবৃত বক্ষ, লীলায়িত তাঁর বঙ্কিম গ্রীবা, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, বক্ষে তুলে নিয়ে আদর করেন তিনি তাঁর প্রিয় কাকাতুয়াকে, সোহাগে বিগলিত হয়ে। দেখি মুগ্ধ হয়ে কলিঙ্গ-ভাস্করের এই শ্রেষ্ঠ কীর্তি, এক অপরূপ সৃষ্টি।

দেখি একে একে সর্পগুম্ফা, পরনারীগুম্ফা, বাঘগুম্ফা, যক্ষেশ্বর আর হরিদাসগুম্ফা। এই গুম্ফাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়। নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় অলঙ্করণে।

সর্পের আকার এই পাহাড়ের শীর্ষদেশ, তাই পরিচিত মন্দিরটি সর্পগুম্ফা নামে। বুকে নিয়ে আছে শুধু একটি প্রকোষ্ঠ ও তার সংলগ্ন একটি অলিন্দ, অঙ্গে নিয়ে আছে দুইটি শিলালিপি, তাতে লেখা আছে অনতিক্রম্য চুলাকামের প্রকোষ্ঠ, আর কম্য ও হলক্ষীণার চন্দ্রাতপ।

পরনারীগুম্ফা ছয়টি গুহার সমষ্টি বুকে নিয়ে আছে।

ব্যাঘ্রের মুখের আকারে রচিত বাঘগুম্ফার প্রবেশপথের শীর্ষদেশ, বুকে নিয়ে আছে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ ও একটি অলিন্দ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই প্রকোষ্ঠের দ্বারের শীর্ষদেশ, দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর অবস্থিত দু' পাশের উদ্গত স্তম্ভের উপর। আছে একটি শিলালেখও উল্লিখিত আছে তাতে "সভুতির গুহা"।

বুকে নিয়ে আছে যক্ষেশ্বর দুইটি প্রবেশপথ আর স্তম্ভ। অষ্টকোণ তাদের কেন্দ্রস্থল, ঘন বাকী অংশ। আছে তার সম্মুখভাগেও একটি শিলালিপি, লেখা আছে তাতে "মহামদার স্ত্রী নায়িকা"।

হরিদাসগুম্ফা গণেশগুম্ফার অনুরূপ। বুকে নিয়ে আছে ঘন-আকৃতির

স্তম্ভ। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য, সুন্দরতম বন্ধনী, নির্মিত গণেশগুম্ফার বন্ধনীর অনুকরণে। তার অলিন্দের অঙ্গের শিলালিপিতে লেখা আছে "তুলনাহীন গুহা ও চন্দ্রাতপ চুলাকর্মার"।

সব শেষে জগন্নাথগুম্ফায় উপস্থিত হই। নির্মিত এই গুম্ফাটি খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে, বুকে নিয়ে আছে মহাপবিত্র উদয়গিরি, শৈলমালার অঙ্গের দীর্ঘতম প্রকোষ্ঠ, পরিধি তার সাড়ে সাতাশ ফুট, দীর্ঘ, সাত ফুট প্রস্থ। অঙ্গে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণেও, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তারা উড়িষ্যার স্থপতির ও ভাস্করের। দেখি অলঙ্কৃত তার প্রাচীরের গাত্রও কত সুষ্ঠু শোভন গঠন, মূর্তি দিয়ে, মূর্তি কত কিন্নরের, গণের, বিদ্যাধরের, মূর্তি বিজাতীয় জীবের—হরিণের আর রাজহংসের। জীবন্ত এই মূর্তিগুলি, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। অতুলনীয় এই গুম্ফার স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গের মূতিসম্ভারও। দেখি একটি সারস দাঁড়িয়ে আছে। বিস্তৃত তার মুখগহ্বর। একটি গণ নিযুক্ত তার গলদেশ থেকে একটি কণ্টক উৎপাটনে। অপরূপ এই মূর্তিসম্ভার, শ্রেষ্ঠ দান কলিঙ্গের মহাঅভিজ্ঞ-ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের, রচিত তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে তাদের মনের সীমাহীন মাধুর্য—তাই রূপময়, বাঙ্ময়ও। লাভ করেন স্থপতি আর ভাস্করও শ্রেষ্ঠত্বের আসন, হন বিশ্বজিৎ। লাভ করেন তাঁরা অমরত্বও, অমরত্ব লাভ করেন কলিঙ্গাধিপতিরাও, ইতিহাসের পাতায়।

স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে উদয়গিরি শৈলমালা অবতরণ করে, সংযোগ স্থলে উপস্থিত হই। ধীরে ধীরে অতিক্রম করি পথ, দু' পাশের ঘন বনবীথির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হই, বহু কষ্টে উপনীত হই পবিত্র খণ্ডগিরির শীর্ষদেশে।

শীর্ষে নিয়ে আছে শৈলমালা, প্রথম জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথের মন্দির। কটকের রাজা মুঞ্জ চৌধুরী, পরবর্তীকালে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মহান এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, প্রকৃষ্টতম নিদর্শন পরবর্তী জৈন স্থপতি আর ভাস্করের।

আদিনাথের মন্দির দেখে আমরা অনন্তগুম্ফায় উপনীত হই। সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির পবিত্র খণ্ডগিরি শৈলমালার, নির্মিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম

শতাব্দীতে। দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র খণ্ডগিরির উচ্চতর স্তরে। পাশে নিয়ে আছে এই গুম্ফার তোরণ দুইটি সর্প। তাই পরিচিত অনন্তগুম্ফা নামে। বুকে নিয়ে আছে চব্বিশ ফুট দীর্ঘ ও সাত ফুট প্রস্থ একটি প্রকোষ্ঠ ও একটি সম-আকৃতির আচ্ছাদিত অলিন্দ। ছিল এই প্রকোষ্ঠে চারিটি দ্বার, এখন পরিণত হয়েছে তিনটি দ্বার ও একটি গবাক্ষে। রচিত হয় প্রবেশপথের শীর্ষদেশে বৃত্তাকার খিলান, তার উপরে সূক্ষ্ম পিরামিডাকৃতি রেলিং ও অর্গল, নাই অন্য কোন গুম্ফায়। অলঙ্কৃত রেলিং-এর অঙ্গ একান্তর পদ্মের কোরক দিয়ে, নাই অন্য কোন শিল্পসম্ভার।

দেখি মন্দিরের সম্মুখভাগে উদ্গত স্তম্ভ, চতুষ্কোণ তার কেন্দ্রস্থলের দণ্ড, স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্তি। মূর্তি দেখি সিংহের, মকরের আর শার্দূলেরও। তোরণের অঙ্গে চঞ্চুতে মুক্তার মালা নিয়ে রাজহংস। ত্রিরত্নের মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত তার শীর্ষদেশ। তোরণের নীচে একটি হস্তী শয়ন করে আছে, তার দুই পাশে দুইটি হস্তিনী।

দেখি দেব দিবাকর দুই হস্ত দিয়ে ধারণ করে আছেন একটি দ্বিচক্র রথের রশ্মি, চারি অশ্বে পরিচালিত সেই রথ। তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর দুই পত্নী উষা আর প্রত্যূষা, রথের এক পাশে একটি অর্ধবৃত্ত অপর পাশে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, প্রতীক চন্দ্র আর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের।

দেখি দুইটি হস্তীর কেন্দ্রস্থলে একটি গজলক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হস্তে নিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম। অনুরূপ ভারহুতের গজলক্ষ্মীর আকৃতিতে কিন্তু সমপর্যায়ে পড়ে সাঁচী ও মথুরার গজলক্ষ্মীর, নির্মাণ কৌশলে এই গজলক্ষ্মীর মূর্তিটি।

চতুর্থ তোরণের নীচে একটি চৈত্যবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, বেষ্টিত হয়ে আছে সুন্দর রেলিং দিয়ে। পূজা করেন সেই চৈত্যবৃক্ষ একটি নৃপতি সঙ্গে নিয়ে রাণী, তাঁদের হস্তে শোভা পায় পুষ্পমাল্য। অপরূপ এই রাণীর মূর্তিটি, সমপর্যায়ে পড়ে মথুরা ও অমরাবতীর রাণীমূর্তির।

দেখি অলঙ্কৃত অলিন্দের দুই প্রান্তদেশ উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্তি দিয়ে। তাঁদের হস্তে শোভা পায় পুষ্প। শোভিত দক্ষিণ প্রত্যন্ত প্রদেশও একটি উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্তি দিয়ে। কেড়ে নেন বিদ্যাধর একটি অতিকায় বিকটাকার, দৈত্যের হস্তে ধৃত একটি থালার উপর থেকে, সেই পুষ্পমাল্য

আকর্ণ বিস্তৃত এই দৈত্যের মুখগহ্বর, বৃক্ষ-পত্রাকৃতি তার কর্ণদ্বয়। দেখি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে এই অপরূপ মূর্তিসম্ভার।

অনবদ্য এই মন্দিরের ভিতরের স্তম্ভগুলিও, অষ্টকোণ তাদের কেন্দ্রস্থল-শীর্ষে শোভা পায় জোড়া বন্ধনী। প্রথম বন্ধনীর ভিতরের দিকে রচিত হয় একটি দৈত্যের মূর্তি, স্কন্ধে নিয়ে আছে দৈত্য একটি হস্তী, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট একটি নর ও একটি নারী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বন্ধনীর অভ্যন্তরের অঙ্গে শোভা পায় দুইটি পরমারূপবতী রমণীর মূর্তি, পূজারিণী তাঁরা নিযুক্তা দেবতার পূজায়, তাঁদের হস্তে পল্লবের বন্ধনী। অপরূপ তাঁদের দেহবল্লরী, অতি শোভন তাঁদের অঙ্গের ভঙ্গিমা। তৃতীয়টির ভিতরাঙ্গে পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি, হস্তে নিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম, তাদের একটির মণিবন্ধে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার কঙ্কণ। পঞ্চমটির ভিতরাঙ্গ বুকে নিয়ে আছে একটি হস্তী, দাঁড়িয়ে আছে হস্তীটি একটি পদ্মের উপর। অলঙ্কৃত অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে প্রথম ও পঞ্চমটির বহিরাঙ্গ, শোভা পায় দৈত্যের মূর্তি, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বন্ধনীর বহিরাঙ্গে। অপরূপ এই বন্ধনীর অঙ্গের শিল্পসম্ভার, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের-এক সুন্দরতম সৃষ্টির উড়িষ্যার ভাস্করের। দেখি বিস্ময়ে মূক হয়ে।

প্রকোষ্ঠের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রেও, দেখি খোদিত কত স্বস্তিকের, নন্দীপদের, ত্রিরত্নের আর পঞ্চ পরমেষ্ঠিনের প্রতীক। তাই মনে হয় বুকে নিয়ে আছে এই গুহাটিও বৌদ্ধ প্রভাব। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটির অলিন্দ একটি শিলালিপিও, উৎকীর্ণ আছে তাতে—"দোহাদার শ্রমণের প্রকোষ্ঠ"।

স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি, পর্বত অবতরণ করে তেঁতুলিগুম্ফায় উপনীত হই।

এই গুহামন্দিরটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে নির্মিত। ছিল এই গুহা-মন্দিরটির সামনে একটি তেঁতুল বৃক্ষ, তাই পরিচিত তেঁতুলিগুম্ফা নামে। গুহার উৎকল প্রতিশব্দ গুম্ফা।

দেখি এই গুহামন্দিরটিও বুকে নিয়ে আছে শোভন-গঠন স্তম্ভ, অষ্টকোণ তাদের কেন্দ্রস্থল, ঘন অবশিষ্ট অংশ। সুন্দরতর আর উন্নততর এই মন্দিরের গাত্রের উদ্গত স্তম্ভ বুকে নিয়ে আছে হস্তী আর ব্যাঘ্রের মূর্তি, অনবদ্য তাদের

গঠন সৌষ্ঠব—জীবন্ত। দেখি স্তম্ভের শীর্ষদেশে বন্ধনীর অঙ্গে একটি পরমা রূপবতী পীনোন্নতবক্ষা নারী হস্তে নিয়ে পদ্ম। অপরূপ এই নারীটির দেহবল্লরীও সুন্দরতম তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, বিস্ময় জাগায় মনে।

তেঁতুলিগুম্ফা দেখে আমরা তত্ত্বগুম্ফায় উপনীত হই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম গুহামন্দির পবিত্র খণ্ডগিরি শৈলমালার অঙ্গের, নির্মিত হয় এই মন্দিরটিও খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে।

দেখি, বুকে নিয়ে আছে এই গুম্ফাটি একটি সভাগৃহ (বৃহৎ কক্ষ)। বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহটি দুপাশের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রবেশপথও। দেখি অলঙ্কৃত এই গুহাটিও অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অপরূপ বন্ধনী, বন্ধনীর অঙ্গে নর্তকীর মূর্তি, তার সামনে একটি পরমা সুন্দরী নারী, হস্তে নিয়ে বীণা। দেখি বন্ধনীর অঙ্গে আরও একটি পরমা রূপবতী নারীর মূর্তি, হস্তে নিয়ে একটি পাত্র, পরিপূর্ণ পুষ্পসম্ভারে; বিন্যস্ত তার কুঞ্চিত কুণ্ডল, দাঁড়িয়ে আছে নারী পূজারিণী ভক্তিপ্রণত মস্তকে। দেখি অলঙ্কৃত বন্ধনীর শীর্ষদেশ আর কার্নিসের নিম্নাংশও একটি নারী মূর্তি দিয়ে, তার দক্ষিণ প্রান্তে একটি হস্তী বামে একটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। একটি রেলিঙও তৈরী হয়, অনুরূপ এই রেলিঙটি বুদ্ধগয়ার রেলিঙ-এর নির্মাণ পদ্ধতিতে।

অনেকগুলি তোরণও নির্মিত হয় প্রাচীরের গাত্রে, দাঁড়িয়ে আছে তোরণগুলি দুপাশের উদগত স্তম্ভের উপর। স্ফীত তাদের কোনটির শীর্ষদেশ, কেউ ঘণ্টার আকারে তৈরী, কোনটির পাকান রজ্জুর আকার আবার কোনটির পিরামিডের, কারও শীর্ষদেশে শোভা পায় মূর্তি, মূর্তি কত বিভিন্ন জন্তুর। বেষ্টিত হয়ে আছে তোরণগুলি লতাপল্লব দিয়েও। দেখি, একটি মৃগদম্পতি একটি তোরণের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে দ্বিতীয় তোরণটির শীর্ষদেশে একটি পারাবত-দম্পতি, তৃতীয় তোরণটির শীর্ষ নিয়ে আছে একটি কাকাতুয়া-দম্পতি। শোভা পায় কেন্দ্রস্থলের তোরণের শীর্ষদেশে একটি সর্পের ফণা। অভিনব এই তোরণগুলির পরিকল্পনা, সুন্দরতম রূপদান, শ্রেষ্ঠ কীর্তি উড়িষ্যার ভাস্করের, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

দ্বিতীয় তত্ত্বগুম্ফাতে উপনীত হই, সমসাময়িক প্রথম তত্ত্বগুম্ফার, বুকে নিয়ে

আছে এই মন্দিরটি একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ, অঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রবেশপথ। অলঙ্কৃত হয়ে আছে এই গুহামন্দিরটির প্রাচীরের গাত্রও, সুন্দরতম তোরণ দিয়ে-বেষ্টিত হয়ে আছে তোরণগুলি অভিনব উদ্গত স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। সমপর্যায়ে পড়ে এই উদ্গত স্তম্ভগুলি রাণীগুম্ফার উদ্গত স্তম্ভের, আকৃতিতে ও অঙ্গের শিল্প ও মূর্তিসম্ভারে। দেখি, তোরণের শীর্ষদেশে শোভা পায় কাকাতুয়ার মূর্তি, মূর্তি এক মকরেরও, তার মুখগহ্বর থেকে নির্গত হয় একটি লতা। অভিনব এই মকরটিও গঠনসৌষ্ঠবে, জীবন্ত, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। দেখি, দ্বারে একটি অতিকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। অনুরূপ এই মূর্তিটি অমরাবতীর অন্ধ্র নৃপতি গৌতমী পুত্র সাতকরণীর মূর্তির।

উল্লিখিত আছে অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রের শিলালিপিতে : "পাদমালিকা নিবাসী কুসুমার গুহা"।

দেখি একে একে খণ্ডগিরি, ধ্যানঘর, নবমুনি, বড়ভুজি, ত্রিশূল, ললাটেন্দু আর কেশরীগুম্ফা। এই গুম্ফাগুলি নির্মিত হয় পরবর্তী কালে। নাই তাদের বুকেও কোন প্রকৃষ্ট অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী নয় তারা ভাস্করের হস্তের স্পর্শে।

খণ্ডগিরি একটি দ্বিতল গুহামন্দির। ধ্যানঘরে আছে একটি মাত্র সভাগৃহ। বুকে নিয়ে আছে নবমুনি, দুইটি প্রকোষ্ঠ ও একটি অলিন্দ। তার প্রাচীরের গাত্রে শোভা পায় জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতীক, মূর্তি শ্মশান দেবতাদেরও, বুকে নিয়ে আছে চারিটি শিলালেখও। প্রথমটি উৎকীর্ণ হয় কেশরী রাজবংশের উদিত কেশরীর রাজত্বকালে, দশম শতাব্দীতে। বড়ভুজিও বুকে নিয়ে আছে তীর্থঙ্করদের মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রতীক, মূর্তি শ্মশান দেবতাদের আর শ্মশান দেবীদেরও। মূর্তি দেখি চক্রেশ্বরীর আর সিদ্ধায়ণীরও, আত্মীয়া তাঁরা প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের আর চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরের।

ত্রিশূলগুম্ফার অঙ্গে খোদিত একটি ত্রিশূলের মূর্তি, তাই পরিচিত ত্রিশূল-গুম্ফা নামে। শোভিত তার প্রাচীরের গাত্রও চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রতীক—মূর্তি ঋষভদেবের, অজিতনাথের, সম্ভবনাথের, অভিনন্দননাথের, সুমিতনাথের, পদ্মপ্রভুর, সুপার্শ্বনাথের, চন্দ্রপ্রভুর, সুবিদ-নাথের, শীতলনাথের, শ্রেয়াংশুনাথের, শ্রীবাসপূজ্যনাথের, বিমলানাথের,

অনন্তনাথের, শ্রীধর্মনাথের, শান্তিনাথের, কুন্থনাথের, শ্রীঅরনাথের, মল্লিনাথের, মুনি স্থব্রনাথের, নমিনাথের, নেমিনাথের, শ্রীপার্শ্বনাথের আর মহাবীরের। আবির্ভাব হন তাঁরা একের পর এক সঙ্গে নিয়ে তাঁদের নিজের নিজের প্রতীক, বৃষ, হস্তী, অশ্ব, বানর, বক, পদ্ম, স্বস্তিক, চন্দ্র, মকর, শ্রীবাস্ত, গণ্ডার, মহিষ, বরাহ, ঈগল, বজ্র, হরিণ, মেষ, নন্দীবর্ত, কলস, কূর্ম, পদ্মপত্র, শঙ্খ, সর্প আর সিংহ। দেখি মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি প্রস্তরে নির্মিত মঞ্চ।

দেখি অনুরূপ একটি মঞ্চ বড়ভুজির সম্মুখভাগেও। ললাটেন্দু একটি দ্বিতল গুহামন্দির, কিন্তু ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তার সম্মুখভাগ। অলঙ্কৃত তার প্রাচীরের গাত্রও, তীর্থঙ্করদের মূর্তি দিয়ে, মূর্তি পার্শ্বনাথের আর ঋষভদেবের। অঙ্গে নিয়ে আছে ললাটেন্দু একটি শিলালিপিও, বর্ণিত হয় খণ্ডগিরি কুমারী পর্বত নামে সেই শিলালিপিতে। বর্ণিত হয় উদয়গিরিও কুমারী পর্বত নামে হাতীগুম্ফার শিলালিপিতে।

দেখি ললাটেন্দুর সামনে তিনটি দিগম্বর মূর্তি একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর। দুইটি ঋষভদেবের ও একটি অম্বিকার মূর্তি। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শ্মশান দেবী অম্বিকা, অধিকার করেন অন্যতম প্রধান অংশ জৈনধর্মে, করেন জৈন সাহিত্যেও। তাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় জৈনমন্দির তাঁকে বাদ দিলে। এই মূর্তিগুলি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

নির্মাণ করেন যখন গুহামন্দির, হীনযান, বৌদ্ধ স্থপতি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অলঙ্কৃত করেন মহাপবিত্র পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার অঙ্গ— সুন্দরতম গুহামন্দির দিয়ে, রচনা করেন বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, বুকে নিয়ে অনুপম শিল্পসম্ভার, শোভন গঠন স্তম্ভ, সুন্দরতম রেলিং, শোভিত করেন জৈন স্থপতি আর ভাস্করও মহাপবিত্র কুমারী পর্বতের অঙ্গ, রচনা করেন গুম্ফা, নির্মিত হয় শ্রমণদের বাসের স্থান, স্থান পূজার জন্যও। ভূষিত করেন তাদের অঙ্গ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে আর অনবদ্য মহিমময় মূর্তি সম্ভারে, রচিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে মূর্তি, মূর্তি কত নরের কত নারীর, কত জন্তুর, কত বিহঙ্গের, কত জৈন প্রতীকেরও, অপরূপ নারীমূর্তি দিয়ে রচিত হয় স্তম্ভের বন্ধনী। নির্মিত হয় কত অনবদ্য সুন্দরতম রেলিঙও, অঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভার। মূর্তি দিয়ে রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে কত দৃশ্য,

দৃশ্য কত রাজসভার, কত সরোবরের, কত অরণ্যের, কত বন, উপবনের, কত বিভিন্ন লতাপল্লব আর পুষ্পেরও, মূর্তি দিয়েই বর্ণিত হয় প্রস্তরের অঙ্গে কত কাহিনী, কাহিনী সামাজিক জীবনের, বিজয়ের অভিযানের, কাহিনী পুরাণেরও। মহামহিমময়, সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য, সূক্ষ্মতম রূপদান। রচনা করেন কলিঙ্গের মহা অভিজ্ঞ স্থপতি আর সুনিপুণ ভাস্কর উজাড় করে দিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দিয়ে মনের অন্তহীন মাধুরী, লাভ করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে—হন বিশ্বজিৎ।

আসে দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে যাত্রী, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে এই মহামহিমময় সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কলিঙ্গের এক মহা-গৌরবময় যুগের, এক অমর কীর্তি। নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

আমরাও প্রণতি জানাই জিনকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি কলিঙ্গ স্থপতি আর ভাস্করকে, অমর তাঁরা, অমর মহাপবিত্র খণ্ডগিরি আর উদয়গিরিও ইতিহাসের পাতায়, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

তৃতীয় অধ্যায়

মালব



রঙমহল—বাঘ গুহা



বাঘ গুহা—বহির্ভাগ



ভাজা গুহা



এলিফেণ্টা—অভ্যন্তর

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঘ

১। গৃহ ২। পাণ্ডব কি গুম্ফা
৩। হাতীখানা ৪। রংমহল

এলোরা ও অজন্তা দেখবার পর, বাসনা জাগে মনে দর্শন করব গুহামন্দির যত আছে ভারতে। তাই ইন্দোরের কাজ শেষ করে মৌতে যাই, সেখান থেকেই বাঘে যেতে হয়। আছে সাতাশি মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা, সংযুক্ত হয় বাঘ আর মৌ। পশ্চিম রেলের রাজস্থান মালব সেকশনে মৌ অবস্থিত। আছে এখানে একটি ছাউনি, স্থাপন করেছিলেন ইংরাজ। একটি পান্থনিবাস ও একটি ভাল ডাকবাংলোও আছে যাত্রীদের থাকবার জন্য।

ভোরের আলো দিগন্তে ফুটে উঠবার আগেই আমাদের ট্যাক্সি ছাড়ে। বিন্ধ্য পর্বতের শীর্ষদেশের উপর দিয়ে রাস্তা বঙ্কিম গতিতে যায়; কখনও উঁচুতে ওঠে কখনও নীচুতে নামে। দু পাশে দেখা যায় সবুজ ঘন বৃক্ষের শ্রেণী। মাঝে মাঝে বৃক্ষের অন্তরালে অন্তর্হিত হয় পথ, মনে হয় রুদ্ধ হবে বুঝি ট্যাক্সির গতি, পরিসমাপ্তি হবে যাত্রার। চলে এক লুকোচুরি খেলা রাস্তায় ও অরণ্যে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশ—এক নয়নাভিরাম লীলা নিকেতন। ট্যাক্সি ধারের পান্থনিবাসের সামনে এসে থামে। একটি মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী এই ধার, এক অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত, বেষ্টিত হয়ে আছে সবুজ বৃক্ষের কুঞ্জে।

আমরা গাড়ী থেকে নেমে চা পান করে ও কিছু খাবার খেয়ে আবার গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী বিদ্যুৎ গতিতে ছোটে, অতিক্রম করতে থাকে প্রকৃতির সেই সুন্দরতম লীলাভূমি। আমরা অতিক্রম করি আরও একটি সুন্দর শহর, পরিচিত সর্দারপুর নামে। এখানেও ইংরাজ স্থাপন করেছিল একটি ছাউনি (cantonment), এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের আজমেরা জেলার সদরে পরিণত হয়েছে সর্দারপুর। অবশেষে, বেলা দশটায়, বাঘ শহরের

ডাক বাংলোর সামনে এসে আমাদের ট্যাক্সি থামে। ট্যাক্সি থেকে অবতরণ করে মুগ্ধ হই দেখে বাঘের পরিবেশ, বিস্ময়ে মূক হয়ে যাই একেবারে। তার পদতলে প্রবাহিতা কলনাদিনী, স্রোতস্বিনী বাঘ, শোনা যায় তার অন্তরের ধ্বনি। বহু তীর্থের আশ্রিতা, অসংখ্য সাধু মহাত্মার প্রিয়তমা, পুণ্যতোয়া নর্মদা থেকে উৎপন্না এই বাঘ, বয়ে যায় মৃদু গুঞ্জনে। চতুর্দিকে, যতদূর দৃষ্টি চলে—দাঁড়িয়ে আছে অমুচ্চ শৈলমালা, বুকে নিয়ে ঘন সবুজ বৃক্ষ আর লতাগুল্ম। স্রোতস্বিনীর নাম থেকেই, বাঘ নামে পরিচিত হয় নগরটিও, বাঘ গুহামন্দির নামে খ্যাতিলাভ করে তিন মাইল দূরবর্তী পবিত্র বিন্ধ্যর অঙ্গের নয়টি গুহা-মন্দিরও। অপরূপ এই গুহামন্দিরগুলি বুকে নিয়ে আছে বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সুন্দরতম দান বৌদ্ধ চিত্রশিল্পীরও। প্রতীক এক মহামহিমময় সৃষ্টির, কীর্তির এক মহাগৌরবময় যুগের। তাই সমপর্যায়ে পড়ে অজন্তার গুহামন্দিরের। নাই এমন চিত্রসম্ভার ভারতের অন্য কোন গুহামন্দিরে, নাই তাদের ছাদের অঙ্গে, প্রাচীরের গাত্রেও নাই।

বাঘ, গোয়ালিয়র রাজ্যের আজমেরা জেলার একটি তসিলের সদর। এখানে একটি নায়েব তসিলদারের দপ্তর আছে। একটি বিদ্যালয়, একটি হাসপাতাল ও একটি ডাকঘরও আছে। বাস করেন এখানে দু হাজারেরও বেশী অধিবাসী।

আমরা ডাক বাংলোতে খাওয়া দাওয়া সেরে, মন্দির দেখতে রওনা হই। যেতে হয় প্রায় তিন মাইল রাস্তা, আমরা পদব্রজে যাই। গরুর গাড়ীতে চড়েও যাওয়া যায়। অতিক্রম করি উঁচু নীচু বন্ধুর পথ, তার দু পাশের জমিতে ফলে তুলা, অনুরূপ অজন্তার পথের দু পাশের জমির। কলনাদিনী, নৃত্যচপলা, সর্পিল গতিতে প্রবাহিতা, বাঘকে তিনবার অতিক্রম করে, আমরা একটি অনুচ্চ, ঋজু পাহাড়ের সানুদেশে উপনীত হই। পাহাড় অতিক্রম করে একটি উপত্যকায় পৌছাই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি সম্মুখের দৃশ্য। দাঁড়িয়ে আছেন বিন্ধ্য শৈলমালা, বুকে নিয়ে সবুজের মেলা, অলঙ্কৃত হয়ে আছেন শ্যাম আভরণে, বিস্তৃত হয়ে আছেন দিগন্তে। অঙ্গে নিয়ে আছেন বিন্ধ্য নয়টি প্রকোষ্ঠ, যার নয়টি গুহামন্দিরের। তাঁর পদতলে, ঘন বনবীথির বক্ষ ভেদ করে, সুদুর্গম সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়ে প্রবাহিতা বাঘ। সর্পিল তার গতি, যায় অন্তরের

ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। বাঘের বুকের উপরে, প্রায় একশ' পঞ্চাশ ফুট ঊর্ধ্বে, প্রকোষ্ঠগুলি দাঁড়িয়ে আছে বিন্ধ্যর অঙ্গে, অলঙ্কৃত করে আছে তার অঙ্গ। দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে, দেখা যায় শুধুই অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী, দিগ্‌বলয়ে গিয়ে মিশেছে। দেখে মুগ্ধ হয় নয়ন। এইখানেই, এই অলোকসুন্দর মহাশান্তির পরিবেশেই বাস করতেন কত শত বৌদ্ধ শ্রমণ, নিভৃতে, নির্জনে। শুধুই ধর্মের পূজারী নন তাঁরা, উপাসক ছিলেন সৌন্দর্যেরও। তাই রচনা করেন কত অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, কত জীবন্ত মূর্তিসম্ভারও এই শৈলমালার বুকে, নমনীয় বেলে পাথরের অঙ্গে। অলঙ্কৃত করেন তাদের অঙ্গ কত অনুপম চিত্রসম্ভার দিয়েও। করেন যুগের পর যুগ। রেখে যান এক মহাগৌরবময় সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি। লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন, বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের ও চিত্রশিল্পের দরবারে।

আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হই। মালবে, প্রাচীনতম অবন্তীরাজ্যে অবস্থিত এই বাঘ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিভক্ত ছিল আর্যাবর্ত ষোলটি জনপদে—অঙ্গ, কাশী, কোশল, মগধ, বৃজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সৌরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজে। পাওয়া যায় না তার পূর্বে ভারতের কোন ইতিহাস।

এই ষোলটি জনপদ থেকেই গড়ে ওঠে চারিটি প্রাচীনতম মহাশক্তিশালী রাজ্য আর্যাবর্তে—অবন্তী, বৎস, কোশল আর মগধ। রাজত্ব করতেন এই অবন্তীতে চণ্ড প্রদ্যোৎ মহাসেনা। সমসাময়িক তিনি বৎসরাজ উদয়নের, কোশল নৃপতি মহাকোশল আর তাঁর পুত্র প্রসেনজিতের, আর মগধ অধিপতি বিম্বিসারের। তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয় পবিত্র শিপ্রা নদীর তীরে উজ্জয়িনীতে। বৎসরাজ উদয়ন তাঁর কন্যা বাসবদত্তাকে হরণ করে নিয়ে যান। তিনি পরাজিত করেন উদয়নকে। রাজকুমারী বাসবদত্তা ও উদয়নকে অবলম্বন করেই মহাকবি ব্যাস রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। এই বিম্বিসারের রাজত্বকালেই সারনাথে আর গঙ্গার উপত্যকায় বুদ্ধ প্রচার করেন তাঁর শান্তির বাণী, বাণী অহিংসার আর মুক্তির, নির্বাণ লাভেরও। প্রচার করেন বৌদ্ধ ধর্ম। শোনান অহিংসার, সৎজীবন যাপনের আর মুক্তির বাণী, চতুর্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরও, প্রচারিত হয় জৈনধর্মও ভারতে।

মহাপরাক্রমশালী বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু, অধিকার করেন অবন্তী। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করে অবন্তী, তাঁর পুত্র উদয়ীর রাজত্বকালে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ৩১৩ অব্দে অবন্তী মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে আসে। তিনি নন্দবংশের ধন নন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এই কাজে তাঁর সহায় হন চাণক্য বা কৌটিল্য, তক্ষশীলা নিবাসী, এক কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনিই প্রণয়ন করেন বিখ্যাত গ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র। প্রতিষ্ঠিত হয় মগধে মৌর্য বংশ। চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মুরা থেকেই মৌর্য নামে খ্যাতি লাভ করে এই বংশ। কেউ বলেন, ছিলেন তিনি পিপ্পলীবনের ক্ষত্রিয় মরিয় রাজবংশের সন্তান। মরিয় থেকেই মৌর্যের উৎপত্তি। তিনি বিতাড়িত করেন গ্রীকদের পাঞ্জাব থেকে, তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন দিগ্বিজয়ী গ্রীক নৃপতি, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকস। হিরাট, কান্দাহার, মকরান আর কাবুল তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর বিজয়বাহিনী জয় করে একে একে উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্য। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমা পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) থেকে আফগানিস্তান ও হিন্দুকুশ পর্যন্ত। বিস্তৃত হয় পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে মহীশূর পর্যন্ত। তিনিই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট। দীক্ষিত হন তিনি জৈনধর্মে পরিণত বয়সে, অনশনে প্রাণত্যাগ করেন মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণবেল গোলাতে।

মৃত্যু হয় চন্দ্রগুপ্তের, তাঁর পুত্র বিন্দুসার, অমিত্রঘাতক, অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। সিরিয়ার রাজা তাঁর রাজসভায় ডিমাকোস নামে এক দূত প্রেরণ করেন।

খ্রীষ্ট পূর্ব ২৭২ অব্দে প্রিয়দর্শী অশোক, শ্রেষ্ঠ রাজা মৌর্যবংশের, শ্রেষ্ঠ নৃপতি ভারতেরও, অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে, রাজত্ব করেন, খ্রীষ্ট পূর্ব ২৩২ অব্দ পর্যন্ত। মহা-পরাক্রমশালী তিনিও, অনুসরণ করেন পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের নীতি, অগ্রসর হন কলিঙ্গ বিজয়ে। মহা শক্তিশালী কলিঙ্গ রাজও যুদ্ধ করেন প্রাণপণে। জয় হয় কলিঙ্গ, কিন্তু নিহত হয় লক্ষাধিক লোক, আহত হয় দেড়লক্ষেরও বেশী। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও অনেকে। এক বিরাট ধ্বংসের লীলা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। কিন্তু বিস্তৃত হয় সম্রাট অশোকের রাজ্যের সীমানা

উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মহীশূরের চিতলদুর্গ জেলা পর্যন্ত, পূর্বে বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত। তার মধ্যে ছিল পাটলিপুত্র, বরাবর পর্বত, কৌশাম্বী, লুম্বিনী, অটবী, সুবর্ণগিরি, ইশিলা, উজ্জয়িনী। ছিল তক্ষশিলা, কলিঙ্গ, দক্ষিণাপথ আর অবন্তীঃ ছিল সমতট (পূর্ববঙ্গ), পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) ও কর্ণ-সুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ) কাশ্মীর আর গান্ধারও ছিল। আধিপত্য করেন নাই তাঁর পূর্বে ভারতের অন্য কোন নৃপতি এত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপর, হন নাই ভারতের সার্বভৌম সম্রাট।

কিন্তু অনুশোচনায় আর মর্মবেদনায় ছেয়ে ফেলে তাঁর অন্তঃকরণ। কলিঙ্গ বিজয়ের পর, তিনি পরিত্যাগ করেন বিজয়ের অভিযান। শৈব অশোক, বৌদ্ধ যাজক উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমে কিছুদিন গৃহী উপাসকের জীবন যাপন করেন। সঙ্ঘে গিয়ে ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করেন। হন অহিংসা আর প্রেমের পূজারী, পূজারী হন সত্যের আর সাম্যের। পরিণত হয় বৌদ্ধধর্ম মহারাজ অশোকের ধর্মে। প্রেরিত হন বৌদ্ধ প্রচারক ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। প্রচারক যান ভারতের বাইরেও—পশ্চিম এশিয়াতে, সিরিয়াতে, গ্রীসে, মিশরে সুবর্ণ-ভূমিতে (ব্রহ্মদেশে)। যান পাণ্ড্য, সত্যপুত্র আর কেরলপুত্রের রাজ্যেও। সিংহলে প্রেরিত হন পুত্র মহেন্দ্র আর কন্যা সঙ্ঘমিত্রা। প্রচারিত হয় বুদ্ধের বাণী, বাণী শান্তির, অহিংসার, সত্যের ও সাম্যের সেই সব দেশে। বিশ্বের প্রধান ধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধধর্ম। নির্মিত হয় চুরাশি হাজার স্তূপ, বুকে নিয়ে বুদ্ধের স্মৃতি, বৃহত্তম তাদের মধ্যে সাঁচীর স্তূপ। রচিত হয় একপ্রস্তর স্তম্ভ, বুকে নিয়ে অহিংসা আর সাম্যের বাণী। নির্মিত হয় চৈত্য, বৌদ্ধ উপাসনা মন্দির আর সঙ্ঘারাম বা বিহার, বৌদ্ধ শ্রমণদের বাসের জন্য। অঙ্গে নিয়ে আছে এই সব প্রস্তরে রচিত স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য আর বিহার প্রকৃষ্টতম ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রতীক এক মহা গৌরবময় যুগের। তিনিই কাঠের পরিবর্তে প্রস্তরে গঠিত স্থাপত্যের প্রবর্তন করেন। নির্মিত হয় প্রস্তরে গঠিত একটি মহামহিমময় সুন্দরতম রাজপ্রাসাদও, বুকে নিয়ে শত স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, আবিষ্কৃত হয়েছে তার ধ্বংসাবশেষ পাটনার নিকটবর্তী একটি গ্রামে।

পতন হয় মৌর্যবংশের, সুঙ্গ পুষ্যমিত্র, সেনাপতি শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের,

অধিকার করেন মগধের সিংহাসন খ্রীষ্ট পূর্বে ১৮৭ অব্দে। স্থাপিত হয় সুঙ্গ বংশ। তাঁর পুত্র যুবরাজ অগ্নিমিত্র অধিকার করেন মালব। পূর্ব মালবে, বিদিশাতে তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাকবি কালিদাসের রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের নায়ক এই অগ্নিমিত্র, মহা পরাক্রমশালী, পরাজিত করেন বিদর্ভ রাজাকে। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তিনি অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। হন এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী। নির্মিত হয় কত স্তূপ, চৈত্য আর বিহার সাঁচীতে, বিদিশাতে, গোনার্দে, ভারহুতে আর বুদ্ধগয়াতে, বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, নিদর্শন এক মহা গৌরবময় যুগের। নির্মিত হয় গুহামন্দিরও অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম সুন্দরতম দান বৌদ্ধ স্থপতির আর ভাস্করের ভাজাতে, নাসিকে আর কার্লিতে। অপরূপ বিদিশার হস্তী দন্তের অঙ্গের কারুকার্যও, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতমও। গোনার্দে জন্মগ্রহণ করেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পতঞ্জলি। পরিণত হয় বিদিশা, গোনার্দ আর ভারহুত ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি আর সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে, কেন্দ্রস্থল হয় শিল্পেরও। রচিত হয় এক স্বর্ণ যুগ ভারতের ইতিহাসে। সুঙ্গরাজারা রচনা করেন।

সুঙ্গদের পতনের পর, বিদিশা অন্ধ্র সাতবাহনদের অধিকারে আসে। শ্রীশাতকর্ণী সাতবাহন অধিকার করেন মালব। মৃত্যু হয় শাতকর্ণীর, মালব শক ক্ষত্রপদের অধিকারে আসে। বাস করতেন তাঁরা সিরদরিয়া নদীর উত্তর অঞ্চলে। উজ্জয়িনীতে তাঁরা রাজধানী স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কুষাণেরা প্রবল হন আর্যাবর্তে। ইউচি নামে এক যাযাবর জাতি ছিল, তাদেরই এক শাখা এই কুষাণেরা। কদফিস তাদের নেতা। তাঁরা ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে, হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। কাবুল, তক্ষশিলা আর গান্ধারের কিছু অংশ তাঁদের অধিকারে আসে। কণিষ্ক, এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন ১২৫ খ্রীষ্টাব্দে। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা গান্ধার থেকে বিহার পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপেরা; বারাণসীর, পাটলিপুত্রের ও অযোধ্যার রাজারাও। তিনি অধিকার করেন কাশ্মীর, কাশগড়, খোটান আর ইয়ারখন্দ। পৃষ্ঠপোষক তিনি ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের,

তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ। তিনিই রচনা করেন বুদ্ধচরিত, সূত্রালঙ্কার আর বসুমিত মহাবিভাসা। শোভিত করেন দার্শনিক নাগার্জুন আর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রপ্রণেতা চরকও। নির্মিত হয় এক সুবিশাল, মহামহিমময় চৈত্য—রাজধানী পুরুষপুরে (পেশোয়ারে)। নির্মিত হয় বহু স্তূপ, চৈত্য আর সঙ্ঘারামও বুকে নিয়ে গান্ধার স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের সুন্দরতম নিদর্শন মথুরাতে। কণিষ্কের মৃত্যুর পর প্রশমিত হয় কুষাণ ক্ষমতা, শেষে অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে।

শ্রীগুপ্ত অধিকার করেন মগধের সিংহাসন। তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ গুপ্ত মহারাজা হন। তাঁর পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, এক মহাপরাক্রমশালী রাজা, ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহন করেন। তিনি বিবাহ করেন লিচ্ছবি রাজার কন্যা কুমারদেবীকে। পাটলিপুত্র আসে মগধের অধিকারে, বাড়ে রাজ্যের সীমানা, বিস্তৃত হয় অযোধ্যায়, প্রয়াগে, বঙ্গদেশে, বিহারে আর উত্তর প্রদেশও। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক, শ্রেষ্ঠ নৃপতি গুপ্তবংশের। তিনি অনুসরণ করেন মহাপদ্ম নন্দ আর মৌর্য অশোকের পদাঙ্ক। পরাজিত করেন একে একে রুদ্রদেব, মাতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী ও বলবর্মনকে। আবার স্থাপিত হয় এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য আর্যাবর্তে। লেখা আছে তার বিজয়ের কাহিনী তাঁর সভাকবি হরিসেন রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে।

তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন ৩৮০ থেকে ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি পরাজিত করেন পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপদের, অধিকার করেন উজ্জয়িনী, স্থাপিত হয় সেখানে দ্বিতীয় রাজধানী। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত, পশ্চিম ভারতের পশ্চিম উপকূলের পোতাশ্রয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি তাঁর অধিকারে আসে। স্থাপিত হয় ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ভারতে আর ইউরোপে। তাঁদের বাণিজ্য পোত যায় রোমে আর পারস্য দেশে, চীনেও যায়। মহাসমৃদ্ধিশালী হন গুপ্ত রাজারা। মিলন হয় প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে। বিকশিত হয় ভারতের মনীষা নিত্য নতুন ক্ষেত্রে। উপনীত হয় ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের কৃষ্টি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। তিনিই কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য,

শোভা করেন তাঁর রাজসভা মহাকবি কালিদাস-প্রমুখ নবরত্ন। তাঁর রাজত্ব-কালেই ভারত পরিদর্শনে আসেন চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, বাস করেন এখানে ৪০১ থেকে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বলেন তিনি, ছিল নাকি তখন রাজধানী পাটলিপুত্রে দুইটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, সমবেত হত সেখানে অসংখ্য শিক্ষার্থী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। প্রচলিত ছিল তখন ভারতের বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ছিল না প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মধ্যে। ছিল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও, পরিচালিত হত সর্বসাধারণের অর্থে। ধনে জনে পূর্ণ ছিল ভারতবর্ষ। সুখের, শান্তির ও আনন্দের ছিল ভারতবাসীর জীবন। শ্রেষ্ঠ-বাণিজ্যকেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল বাংলার তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক), এখান থেকে বাণিজ্যপোত নিয়ে বাণিজ্য করতে যেত ভারতের বণিক সিংহলে, মালয়ে, যবদ্বীপে, ব্রহ্মদেশে, কম্বোজে, চম্পাতে ও আরও অনেক সুদূর বিদেশে, সঙ্গে নিয়ে যেত ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতি। গড়ে ওঠে ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের কৃষ্টি সেই সব দেশে, প্রচারিত হয় ব্রাহ্মণ্যধর্মও। নির্মিত হয় কত অসংখ্য মন্দিরও, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন, কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী কত রামায়ণ আর মহাভারতেরও। লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

মৃত্যু হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অনুষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ, পরিচায়ক তাঁর সার্বভৌমত্বের।

৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রাদিত্যের মৃত্যু হয়, স্কন্দ গুপ্ত বিক্রমাদিত্য মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজত্ব করেন ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহাপরাক্রম-শালী তিনি ও, প্রতিহত করেন তিনি হূনদের আক্রমণ, তারা মধ্য-এশিয়া থেকে আসে। অপ্রতিহত থাকে গুপ্ত ক্ষমতা আর্যাবর্তে; অক্ষত থাকে তাঁদের রাজ্যের সীমানাও।

রাজত্ব করেন একে একে পুরু গুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত আর দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত। কীর্তিহীন তাঁরা। ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র বুধ গুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজত্ব করেন ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত থাকে মগধের সীমানা বঙ্গদেশ থেকে পূর্ব মালব পর্যন্ত।

রাজত্ব করেন পরবর্তী গুপ্ত নৃপতিরা আরও একশত বৎসর। তাঁরাও কীর্তিহীন। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সৌরাষ্ট্রে বল্লভীমৈত্রক ভট্টারক, মান্দাসারে-মালবে স্বাধীন হন যশোধর্মন, উত্তর প্রদেশে মৌখরি ঈশান বর্মণ, আর বঙ্গদেশে শশাঙ্ক। থানেশ্বরে স্বাধীন হন পুষ্যভূতি বংশের প্রভাকর বর্ধন। পূর্বমালবে তোরামান স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য।

রাজত্ব করেন গুপ্ত রাজারা আর্যাবর্তে প্রবল প্রতাপে ৩২০ থেকে ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, পরবর্তী গুপ্তেরা ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় ভারত, উপনীত হয় ভারতের হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু সংস্কৃতি আর হিন্দু কৃষ্টি, ভারতের সাহিত্য আর ভারতের সংগীত উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। চরম উৎকর্ষ লাভকরে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্র শিল্প, পায় পূর্ণ পরিণতি। শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করে ভারতের শিল্পও, পায় সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম রূপ। লাভ করে ভারত শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও শিল্পের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ। রচিত হয় দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ ভারতে।

রচিত হয় এলাহাবাদ প্রশস্তি, অপরূপ ভাষামাধুর্যে, রচনা করেন সমুদ্র গুপ্তের সভাকবি হরিসেন। কবি বীর সেন অলঙ্কৃত করেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা। অলঙ্কৃত করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা মহাকবি কালিদাস; উজ্জ্বলতম রত্ন তিনি তাঁর সভার নবরত্নের, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতের, সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বদেশের, সর্বযুগেরও। তিনিই রচনা করেন মহাকাব্য রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, মহা নাটক বিক্রমোর্বশী, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম, শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশ্বসাহিত্যের, অমূল্য সম্পদ ভারতের। এই যুগেই শূদ্রক রচনা করেন মৃচ্ছকটিকা নাটক, বিশাখা দত্ত মুদ্রারাক্ষস, এক অর্ধ ঐতিহাসিক নাটক।

জন্মগ্রহণ করেন এই যুগেই মনীষী অনঙ্গ ও বসুবন্ধু, মহাঅভিজ্ঞ বৌদ্ধ-দর্শনে। লিখিত হয় জ্যোতিষ-দর্শন সম্বন্ধে ও বহু মূল্যবান গ্রন্থ, জ্যোতির্বিদ আর্যাভট্ট, বরাহ-মিহির আর ব্রহ্ম গুপ্ত রচনা করেন। খ্যাতিলাভ করেন জ্যোতিষশাস্ত্রে বরাহের পত্নী ক্ষণাও, আজও প্রচলিত তাঁর "বচন" ভারতের ঘরে ঘরে, আবৃত্তি হয় ভারতবাসীর মুখে। এই যুগেই অমর সিংহ রচনা

করেন প্রসিদ্ধ কোষগ্রন্থ" 'অমর কোষ', খুব সম্ভব প্রাচীনতম অভিধান ভারতের। রচিত হয় কত অসংখ্য পুস্তকও, আলোচিত হয় সেই সব গ্রন্থে পদার্থ-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, রসায়ন আর গণিত-শাস্ত্র; হয় কত গবেষণাও। পরে অনুদিত হয় এই সব গ্রন্থ ভারতের বাইরে, বিভিন্ন ভাষায়। সারা এশিয়া মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় ভারত, শ্রেষ্ঠ-কেন্দ্রস্থল সংস্কৃতির আর কৃষ্টির।

মহাপরাক্রমশালী গুপ্ত রাজারা, তাঁদের অধিকারে আসে ভৃগুকচ্ছ ও সুর্পারক বন্দর, অবস্থিত পশ্চিম উপকূলে, আসে ভারতের আরও অনেক বন্দর। সেই সব বন্দর থেকে ভারতের বাণিজ্যপোত বয়ে নিয়ে যায় পণ্য সুদূর বিদেশে—সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, বোর্নিওতে, বলিতে, মালায়াতে আর কম্বোজে। নিয়ে যায় পারস্য দেশে, গ্রীসে আর রোমেও। উপনীত হয় চীন দেশেও। সঙ্গে নিয়ে যায় ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টি। আসে বণিক সেই সব দেশ থেকেও, সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টি। বিনিময় হয় পণ্যে পণ্যে, পণ্যে স্বর্ণে, হয় সভ্যতায় আর সংস্কৃতিতেও। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় গুপ্ত সাম্রাজ্য, হয় ভারত, হয় অর্থে, সভ্যতায় আর সংস্কৃতিতেও হয়। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় দূর প্রাচ্য আর সুদূর পশ্চিমও ভারতীয় সভ্যতায় সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে, হয় এক মহামিলন প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে।

নির্মিত হয় বাঘের গুহামন্দিরগুলিও এই গুপ্ত যুগেই; হয় নির্মিত অজন্তার শ্রেষ্ঠ গুহামন্দিরগুলিও। অঙ্গে নিয়ে আছে এই সব গুহামন্দিরগুলি সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ, শোভিত হয়ে আছে বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর চিত্র দিয়েও, চিত্র আছে জাতকের, বুদ্ধের পূর্বজীবনের, আছে তখনকার সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবন ধারারও। অপরূপ এই চিত্রগুলিও, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্র-শিল্পের দরবারে। নির্মিত হয় গুহামন্দির নাসিকে আর কানেরিতেও। তাঁরাই নির্মাণ করেন একটি শৈব মন্দির ঝাঁসির কাছে দেওগড়ে, বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, প্রতীক এক মহা গৌরবময় সৃষ্টির। শ্রাবণ বেলগোলাতে, পবিত্র উদয়গিরির শীর্ষদেশেও নির্মিত হয় একটি জৈন মন্দির, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

বিক্রমাদিত্য নির্মাণ করেন। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও স্থন্দরতম অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে ভাস্করের স্থনিপুণ হস্তের স্পর্শে, তার মনের মাধুরীতে।

উপনীত হয়, এই যুগেই মূর্তি-শিল্পও উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি। গঠিত হয় কত ধাতুর তৈরী বুদ্ধ মূর্তি, কাশীর কাছে সারনাথে, মূর্তি কত হিন্দু দেবতার ও হিন্দু দেবীর মথুরাতে। মহামহিমময় এই মূর্তিগুলিও, অনবদ্য গঠনে, অনুপম প্রকাশে, জীবন্ত ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ও মনের মাধুর্যে।

লাভ করে এই যুগেই লৌহ নির্মিত শিল্পও চরম উৎকর্ষ। বুকে নিয়ে আছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, দিল্লীর চন্দ্ররাজার লৌহস্তম্ভ। নির্মিত হয় এই লৌহ স্তম্ভটিও গুপ্ত যুগে, দেড় হাজার বৎসর আগে কুমার গুপ্ত নির্মাণ করেন। দাঁড়িয়ে ছিল এই স্তম্ভটি মথুরাতে, এখন স্থানান্তরিত হয়েছে কুতবমিনারের প্রাঙ্গনে; দাঁড়িয়ে আছে আকাশের নীচে, উন্নত করি শির, শীর্ষে নিয়ে দেড় সহস্র বৎসরের, জল, ঝড় ও ঝঞ্ঝা। কিন্তু আজও অক্ষত তার অঙ্গ, অমলিন, স্পর্শ করে নাই কোন কলঙ্ক তার অকলঙ্ক দেহে, ম্লান হয় নাই তার মসৃণতা।

গড়ে ওঠে কত অসংখ্য মহামহিমময় মন্দির ভারতের বাইরেও, বৃহত্তর ভারতবর্ষে—আঙ্কোরভাটে, মালায়াতে, স্থমাত্রাতে, যবদ্বীপে, আনামে, কম্বোডিয়াতে, শ্যামে, আর সেলিবিসে, বুকে নিয়ে গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক তার ভাস্কর্যের আর চিত্র শিল্পেরও। তারাও লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের ও চিত্র শিল্পের দরবারে।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ক্ষীণবল হয় ভারতের বৌদ্ধধর্ম; অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে ভারতের বুক থেকে দশম শতাব্দীতে। পরিত্যাগ করে যান ভারতবর্ষ বৌদ্ধ শ্রমণ, সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধ স্থপতি ভাস্কর আর চিত্র শিল্পী, উপনীত হন সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, তিব্বতে আর বৃহত্তর ভারতবর্ষে। পরিত্যাগ করেন বাঘের পীতবাস বৌদ্ধ শ্রমণেরাও বাঘ।

ভারতের অন্য বৌদ্ধ কীর্তির সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় বাঘের গুহামন্দিরগুলিও, অন্তর্হিত হয়ে যায় লোক চক্ষুর অন্তরালে। পরিণত হয় বাঘও হিংস্র শ্বাপদ আর ভয়াল অজগর সংকুল অরণ্যে, তাদের আবাসস্থলে। নিমজ্জিত হয় বাঘ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

প্রথমে জানা যায় তাদের অস্তিত্বের কথা Lt Dangerfield-এর বিবরণে। প্রকাশিত হয় সেই বিবরণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে Transactions of the Literary Society of Bombay-তে। Dr. E. Lenpey তাদের বিষয় লেখেন Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society-তে। লেখেন Col. Laurd ও, Indian Antiquary-তে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশিত হয় কয়েকখানি মন্দিরের আলোক চিত্রও। তিনি এই মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন ১৯০৭ অথবা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত হন বাংলা থেকে প্রথিতযশা বাঙ্গালী চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার আর সুরেন্দ্রনাথ কর। তাঁরা এই সব মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের চিত্রের অনুলিপি নেন। অনুলিপি নেন বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী এ. বি. ভোঁসলে আর বি. এ. আপ্তে, নেন গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী এম. এস. ভাণ্ড আর ভি. বি. জগতপও। অলঙ্কৃত হয়ে আছে এই সব চিত্র দিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের অলিন্দের অঙ্গ ও পিছনের প্রাচীরের গাত্র। রক্ষিত আছে এই সব মূল্যবান অনুলিপি গোয়ালিয়রের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রদর্শ-শালাতে। অনুলেখন প্রেরিত হয় লণ্ডন নগরীতে, বৃটিশের প্রদর্শ-শালাতেও। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় Burlington Magazine-এ অসিতকুমার হালদারের বাঘ গুহা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ, তথ্যপূর্ণ রচনা। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার খ্যাতনামা চিত্র শিল্পী, মুকুলচন্দ্র দেও My Pilgrimage to Ajanta and Bagh নামে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশিত হয় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা প্রবাসীতেও, বাঘ গুহা সম্বন্ধে একটি সুরম্য মূল্যবান প্রবন্ধ।

বাঘ গুহা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল, মনীষী ডাঃ জে. ভোগেল, ই. বি. হ্যাভেল আর ডাঃ জে. এইচ. কাজিনস্। জানা যায় তাদের অঙ্গের স্থাপত্যের বিষয়, লিখিত আছে প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভারের কথাও।

বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আবার আবিষ্কৃত হয় বাঘ, পায় দিনের আলোক, ছড়িয়ে পড়ে তার সৌরভ দিকে দিকে। লাভ করে সে শ্রেষ্ঠত্বের আসন। শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন বাঘের বৌদ্ধ স্থপতি; ভাস্কর আর চিত্র শিল্পীও,

বিশ্বের শিল্পের দরবারে, হন বিশ্বজিৎ। মহা সৌভাগ্যশালী হয় ভারতবর্ষ; অমর হন তার স্থপতি আর চিত্র শিল্পী।

আমরা প্রথমে প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হই। "গৃহ" নামে পরিচিত এই গুহাটি। চিহ্ন নাই প্রবেশ প'থের অলিন্দটির, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের করালে, ভগ্নাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু তেইশ ফুট দীর্ঘ, চোদ্দ ফুট প্রস্থ একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ, সমৃদ্ধিশালী নয় তার অঙ্গ শিল্পসম্ভার দিয়ে।

প্রথম গুহামন্দির দেখে আমরা দ্বিতীয় গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। একটি বিহার বা সঙ্ঘারাম এই গুহামন্দিরটি, পরিচিত পাণ্ডব কি গুফা নামে, গুম্ফা গুহার প্রতিশব্দ। অন্যতম বৃহত্তম, বাঘের গুহামন্দিরের, দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি অক্ষত অবস্থায়। কিন্তু ধূঁয়ায় আর বাদুড়ের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার ছাদের অঙ্গের আর প্রাচীরের গাত্রের চিত্র সম্ভার। দেখি, রচিত একটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ কক্ষ বা সভাগৃহ এই গুহামন্দিরে, বেষ্টিত তার তিন দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দিয়ে। সভাগৃহের সামনে একটি স্তম্ভ যুক্ত অলিন্দ, প্রান্তদেশে, অন্তরতম প্রদেশে একটি উপাসনা মন্দির বা গর্ভগৃহ। বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে একটি মহামহিমময় স্তূপ, বুকে নিয়ে বুদ্ধের স্মৃতি। একশত পঞ্চাশ ফুট পরিধি নিয়ে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে অলিন্দের সম্মুখভাগ, সঙ্গে নিয়ে তার ছয়টি অষ্টকোণ স্তম্ভ, দাঁড়িয়ে আছে শুধু স্তম্ভ মূল। অলিন্দের সামনে, দক্ষিণে, বামে, রচিত হয়েছে কুলুঙ্গি, অলঙ্কৃত সেই সব কুলুঙ্গিগুলির সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তি সম্ভার দিয়ে, মূর্তি গণপতির, বুদ্ধেরও, সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব ও পারিষদবর্গ। মুগ্ধ হয়ে দেখি। অলিন্দ অতিক্রম করে, একটি দরজা দিয়ে সভাগৃহে প্রবেশ করি। আরও দুটি প্রবেশ দ্বার দেখি, দেখি দুই গবাক্ষও, প্রবেশ পথ মন্দিরে আলো-বাতাসের। নাই কোন কারুকার্য অপর দুইটি প্রবেশ পথের শীর্ষদেশে। অলঙ্কৃত কিন্তু অপরূপ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে, কেন্দ্রস্থলের প্রবেশ পথের লিনটেলের (কপাটের) অঙ্গ, আর তার দুই-পাশের উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গ আর পাদদেশ। দেখি দুইটি কেশরযুক্ত সিংহ পা গুটিয়ে বসে আছে। দেখি, নির্মিত হয়েছে প্রকোষ্ঠের সামনেও কুড়িটি অপরূপ, শোভন গঠন স্তম্ভ, চারিকোণে চারিটি উদ্গত স্তম্ভ। বিভিন্ন প্রতিটির নির্মাণ পদ্ধতি, বিভিন্ন আকৃতি। দাঁড়িয়ে

আছে স্তম্ভগুলি, এক একটি অনুচ্চ ভিত্তির উপর। চতুষ্কোণ এই স্তম্ভের দণ্ডগুলি চার ফুট উঁচু পর্যন্ত, কিন্তু বিভিন্ন তাদের উর্ধ্বাংশের আকৃতি—কেউ অষ্টকোণ, কেউ ষোড়শ, কেউ বা চব্বিশ কোণ। কেউ সর্পিল, কারও বাঁশির আকার, কেউ তির্যক, আবার কেউ অঙ্গে নিয়ে আছে কোন প্রতীক। শীর্ষে নিয়ে আছে তারা অদ্ভুত বন্ধনী, কতকগুলি দণ্ডের সমষ্টি, আবদ্ধ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম কারুকার্য-সমন্বিত সূত্র দিয়ে। নাই এমন অপরূপ বন্ধনী, অন্য কোন গুহামন্দিরের স্তম্ভের শীর্ষদেশে, মহা বৈশিষ্ট্য এই গুহামন্দিরের। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তম্ভগুলি অনুপম শিল্পসম্ভার, কিন্তু বিভিন্ন এই অলঙ্করণ বিভিন্ন স্তম্ভের অঙ্গে। সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলেও চারিটি অপরূপ, সুষ্ঠু গঠন স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, সর্পিল, বাঁশির আকার তাদের শীর্ষদেশ। নাই এমন স্তম্ভ অজন্তায়, এলোরাতেও নাই, বৈশিষ্ট্য বাঘের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

একে একে কুড়িটি প্রকোষ্ঠ দেখি, বাসস্থান বৌদ্ধ ভিক্ষুর। নাই এই সব প্রকোষ্ঠে কোন শিল্প সম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় তারা ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে। রচিত হয়েছে শুধু প্রদীপ রাখবার জন্য একটি করে কুলুঙ্গি।

সভাগৃহ অতিক্রম করে, প্রবেশ দ্বার দিয়ে, গর্ভগৃহের সংলগ্ন তোরণে উপনীত হই। দেখি, তার প্রবেশ পথেও শোভা পায় দুইটি অপরূপ স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে তোরণের প্রাচীরের গাত্রের অলঙ্করণ। দক্ষিণ প্রাচীরের গাত্রে, কেন্দ্রস্থলে, প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন দশ ফুট চার ইঞ্চি উঁচু এক বুদ্ধ; মহা মহিমময় মূর্তিতে। আজানু-লম্বিত তাঁর দক্ষিণ বাহু, তিনি করে ধারণ করে আছেন বরদা মুদ্রা। বাম হস্তে তিনি ধরে আছেন তাঁর স্কন্ধের উপরের বসনের প্রান্ত দেশ। অনুরূপ এই মূর্তিটি, গান্ধার স্থপতির তৈরী বুদ্ধ মূর্তির, সমপর্যায়ে পড়ে মথুরার বুদ্ধমূর্তিরও। কিন্তু উর্ধ্বে উত্তোলিত তাঁদের দক্ষিণ হস্ত, আজানুলম্বিত নয়, তাঁরা করে ধারণ করে আছেন অভয় মুদ্রা, বরদা নয়। উর্ধ্বে উত্তোলিত পরবর্তী গুপ্ত যুগের রচিত বুদ্ধ মূর্তির দক্ষিণ হস্তও, কিন্তু তাঁদের করেও শোভা পায় বরদা মুদ্রা। তাই এই বৈশিষ্ট্য এই বুদ্ধ মূর্তিটির। পরিধানে তাঁর বিস্তৃত বসন, পা পর্যন্ত নেমে এসেছে সেই ভূষণ স্তরে স্তরে। বসনের অন্তরাল থেকে পরিদৃশ্যমান তাঁর অঙ্গ। অপরূপ সেই অঙ্গের গঠন

সৌষ্ঠব, সমপর্যায়ে পড়ে গুপ্ত যুগের তৈরী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ মূর্তির গঠন ভঙ্গির। তাঁর মস্তকে শোভা পায় কুঞ্চিত কেশ, বিরাজ করে সেই মস্তকে উষি নিশা, মহাপুরুষের বত্রিশটি প্রতীক।

বুদ্ধের দক্ষিণে, প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান নয় ফুট উঁচু এক বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধ-পূর্ব জন্মের। ঈষৎ বিস্তৃত তাঁর বামপদ সম্মুখ দিকে, দক্ষিণ-হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি চামর, স্থাপিত তার লোমশ প্রান্ত তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে। তাঁর বাম হস্ত স্পর্শ করে আছে তাঁর কোটিদেশের অঙ্গাবরণের গ্রন্থি। অলঙ্কৃত তাঁর কোটিদেশ জড়োয়ার কোমরবন্ধ দিয়ে, বক্ষে যজ্ঞসূত্র, প্রতীক ব্রাহ্মণত্বের। তাঁর মণিবন্ধে শোভা পায় মণি-মুক্তা খচিত জোড়া কঙ্কণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, শিরে একটি বহুমূল্য শিরোভূষণ। খুব সম্ভব ইনিই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণি, বা বুদ্ধের অনুচর, কিন্তু নাই তাঁর বাম হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, পদ্মপাণির প্রতীক।

বুদ্ধের বামে পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এক বোধিসত্ত্ব। একটি গ্রন্থি দিয়ে মস্তকের উপর আবদ্ধ তাঁর দীর্ঘ কেশ। তাঁর বাহুতে শোভা পায় জড়োয়ার জোড়া বালা, পায় মল, কণ্ঠে জোড়া মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের কুণ্ডল। দক্ষিণ হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন এক গুচ্ছ পদ্ম ফুল, বামে উর্ধ্বাঙ্গের বসন, আবৃত সেই ভূষণে তাঁর কোটিদেশ। খুব সম্ভব তিনিই বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ী, বুদ্ধের অনুচর। কিন্তু ধারণ করেন নাই তিনি বাম হস্তে পদ্মফুল, মৈত্রেয়ীর প্রতীক। দেখেছি অনুরূপ বুদ্ধমূর্তি অজন্তাতে আর মথুরাতে, সারনাথেও দেখেছি। বিরাজ করেন তাঁর এক পাশে, বহুমূল্য বসনে সজ্জিত হয়ে অবলোকিতেশ্বর, অন্য পাশে সাধারণ বেশে মৈত্রেয়ী।

দেখি বিপরীত দিকে, উত্তরের প্রাচীরের গাত্রেও দাঁড়িয়ে আছে নয় ফুট ছয় ইঞ্চি উঁচু একটি বুদ্ধ মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে সাত ফুট উঁচু বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর আর মৈত্রেয়ী। অনুরূপ গঠনে, ভূষণে আর বসনে তাই মহামহিমময়। কিন্তু নাই প্রস্ফুটিত পদ্ম বোধিসত্ত্বদের পদতলে।

তোরণ অতিক্রম করে, গর্ভগৃহে বা উপাসনা গৃহে প্রবেশ করি। মুগ্ধ হই প্রবেশ পথের মূর্তি দুইটি দেখে, বিস্ময়ে মূক হয়ে যাই একেবারে। দাঁড়িয়ে আছে মূর্তি দুইটি মহামহিমময় মূর্তিতে, দুইটি গভীর কুলুঙ্গির ভিতর, সুন্দরতম

অলঙ্করণে অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপের নীচে। বামে, আট ফুট তিন ইঞ্চি উচু বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর (পদ্মপাণি) দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর শিরে শোভা পায় একটি সুউচ্চ জাত মুকুট, অপরূপ তার অঙ্গের শিল্পসম্ভার। মুকুটের কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তি, করে নিয়ে অভয় মুদ্রা। বিস্তৃত জ্যোতি সেই মুকুট থেকে, তার দুই পাশে দুই ক্ষুদ্র সিংহ দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে মালা। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় তিন সারি মুক্তার মালা, বক্ষে যজ্ঞোপবীত। একটি বৃহৎ অঙ্কুশ দিয়ে আবদ্ধ সেই উপবীত বক্ষের বাম প্রান্তে। তাঁর বাহুতে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার অনন্ত, মণিবন্ধে কঙ্কণ। নাই কোন ভূষণ উর্ধ্বাঙ্গে, কোটিদেশে শোভা পায় একটি মাণিক্য খচিত বহুমূল্য কোমরবন্ধ। সংযুক্ত সেই কোমরবন্ধ দিয়ে তাঁর কোটিদেশের বসন, দুই পদদ্বয়ের ভিতর বিলম্বিত তাঁর কোঁচা। ভগ্ন দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্ত দিয়ে তিনি তাঁর উরু স্পর্শ করেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মপাণি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। অপরূপ এই মূর্তিটির গঠন-সৌষ্ঠব, অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গী, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ কীর্তির, সৃষ্টির এক মহা গৌরবময় যুগের। অনুরূপ গঠনে আর আকৃতিতে দক্ষিণের মূর্তিটি, দাঁড়িয়ে আছে একটি পদ্মের উপর। বিন্যস্ত তার মস্তকের জটা চূড়ার আকারে, জটা দিয়ে রচিত তার শিরোভূষণ। তার শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তি বিরাজ করে, হস্তে নিয়ে অভয় মুদ্রা। নাই কোন অলঙ্কার তার অঙ্গে, বিলম্বিত তার পরনের ধুতি পা পর্যন্ত, সংযুক্ত সেই ধুতি তার কোটিদেশের সঙ্গে একটি সাধারণ কোমরবন্ধ দিয়ে। বিস্তৃত তার দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি কমণ্ডলু। খুব সম্ভব তিনিই বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ী, বুদ্ধের অনুচর।

ভিতরে, পবিত্রতম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মহামহিমময় স্তূপ। নির্মিত এই স্তূপটি একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে, অর্ধ গোলকের আকৃতিতে রচিত তার গম্বুজ, শীর্ষে নিয়ে আছে হারমিকা আর ছত্র, স্পর্শ করেছে ছাদের অঙ্গ।

আদিতে বৌদ্ধেরা স্মৃতির পূজারী ছিলেন, পূজা করতেন স্মৃতিকে। রচিত হয় স্তূপ বা দাগোবা বুকে নিয়ে বুদ্ধের স্মৃতি। পূজিত হন স্তূপ বৌদ্ধ ধর্ম-মন্দিরে বা চৈত্যে। তাই স্তূপ দিয়েই তাঁদের স্থাপত্য শুরু হয়, নির্মাণ করেন মহারাজা অশোক চুরাশি হাজার স্তূপ সারা ভারতবর্ষে। বাড়ে বৌদ্ধ শ্রমণের

সংখ্যা, নির্মিত হয় স্তূপের উপর উপাসনা মন্দির, নির্মিত হয় চৈত্য। সেই চৈত্যে গিয়ে পূজা করেন বৌদ্ধ শ্রমণ, বৌদ্ধ ভিক্ষু, পূজা করেন স্তূপকে। নির্মিত হয় সঙ্ঘারাম বা বিহারও, বাসস্থান বৌদ্ধশ্রমণদের, রচিত হয় তার অন্তরতম প্রদেশেও স্তূপ, পূজা করেন শ্রমণের, পূজা করেন বুদ্ধের স্মৃতিকে।

আসে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ, গুপ্ত রাজারা প্রবল হন আর্যাবর্তে, পরিণত হয় ভারত, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, গড়ে ওঠে হিন্দুমন্দির, নির্মিত হয় বৌদ্ধ চৈত্য আর বিহারও ভারতের দিকে দিকে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক মহা গৌরবময় যুগের। স্তূপের পরিবর্তে রচিত হয় বুদ্ধমূর্তি, পূজিত হন দেবতা বুদ্ধ চৈত্যে, বিহারেও হন। হন তাঁরা মূর্তির পূজারী, রচিত হয় কত অসংখ্য মহামহিমময় বুদ্ধ মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে মূর্তি দুই বোধিসত্ত্বের, চৈত্যে আর বিহারে। তাঁরা খ্যাতি লাভ করেন মহাযান সম্প্রদায় নামে। হীনযান নামে পরিচিত হন স্মৃতির পূজারীরা।

ব্যতিক্রম শুধু এই বাঘ গুহা মন্দির। পূজিত হন এখানে মন্দিরের গর্ভগৃহে স্তূপ, গর্ভগৃহের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে বুদ্ধের মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে মূর্তি দুই বোধিসত্ত্বের। তাই বুকে নিয়ে আছে, বাঘ যুগ সন্ধির নিদর্শন। এই সময়েতেই, বৌদ্ধেরা পরিত্যাগ করেন স্মৃতির পূজা, উপাসক হন মূর্তি পূজার।

আমরা দ্বিতীয় গুহা মন্দির দেখে, তৃতীয়টিতে উপনীত হই। হাতীখানা নামে পরিচিত এই গুহা মন্দিরটি। একটি বিহার এই মন্দিরটি, কিন্তু ভিন্ন এই মন্দিরের পরিকল্পনা। বৃহত্তর এই বিহারের প্রকোষ্ঠগুলি, বিস্তৃততরও, অলঙ্কৃত প্রাচীরের গাত্রও অনবদ্য চিত্র সম্ভার দিয়ে,। খুব সম্ভব এখানে উচ্চ শ্রেণীর শ্রমণেরা বাস করতেন। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সম্মুখ ভাগের এক বিস্তৃত অংশ, ভগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠ গুলিও। ছিল এখানে দুইটি প্রশস্ত কক্ষ, বাহিরেরটি দাঁড়িয়ে ছিল, আটটি শোভন গঠন অষ্টকোণ স্তম্ভের উপর, তার সামনে একটি প্রাঙ্গণ; বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সারি দিয়ে। একটি বৃহৎ কক্ষ অতিক্রম করে, একটি সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত আচ্ছাদিত তোরণ পার হয়ে উপাসনা মন্দিরে উপনীত হই। বিস্মিত হই দেখে প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার। দেখি বসে আছেন সারি সারি বুদ্ধ, তাঁদের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে

উপবিষ্ট কত পূজারী, নিযুক্ত তাঁরা বুদ্ধের পূজায়। দেখি সম্মুখ ভাগে, কার্নিসের নীচে দুই সারি মূর্তি। উপরের সারিতে পর্যায়ক্রমে সিংহের মুখোস আর চৈত্য গবাক্ষ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে এক একটি আবক্ষ মনুষ্যমূর্তি, নীচের সারিতে হস্তী আর সিংহের। মুগ্ধ হই দেখে।

প্রায় আড়াইশ গজ উঁচু নীচু পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করে, আমরা চতুর্থ গুহা মন্দিরে উপস্থিত হই। সাজিয়েছেন বাঘের বৌদ্ধ মহা অভিজ্ঞ চিত্র শিল্পী এই গুহা মন্দিরকে অনবদ্য চিত্র সম্ভারে, অলঙ্কৃত করেছেন তার প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ, হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুর্য, দিয়েছেন যুগের পর যুগ, করেছেন তাকে অপরূপ। তাই পরিচিত রংমহল নামে এই গুহা মন্দিরটি। সর্বশ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম গুহা মন্দির বাঘের, লাভ করেছেও এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্র শিল্পের দরবারে। সংযুক্ত এই মন্দিরটি পঞ্চম গুহা মন্দিরের সঙ্গে। স্থপতি রচনা করেন এই দুইটি মন্দিরের সামনে একটি দু'শ কুড়ি ফুট দীর্ঘ অলিন্দ। বুকে নিয়ে বাইশটি অপরূপ স্তম্ভ। ভূপতিত হয়েছে স্তম্ভগুলি, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে ছাদের এক বিস্তৃত অংশও, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত দেহে দুই প্রান্তদেশের উদগত স্তম্ভগুলি, বুকে নিয়ে আছে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে অনুপম শিল্প সম্ভারে। দেখি, অবশিষ্ট রয়েছে পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে ও ছাদের অঙ্গে চিত্রাঙ্কনের চিহ্নও—নিদর্শন কত সুন্দরতম চিত্রের।

অনুরূপ পরিকল্পনায় দ্বিতীয় গুহা মন্দিরের অঙ্গে নিয়ে আছে এই গুহা মন্দিরটিও তিনটি প্রবেশ দ্বার ও দুইটি চতুষ্কোণ গবাক্ষ। নির্মিত হয় একটি চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত সভাগৃহও, বেষ্টিত তার চারিদিক অলিন্দ দিয়ে। রচিত হয় তিন দিকে সারি সারি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠও। পশ্চাদভাগে রচিত হয় একটি উপাসনা মন্দির। কিন্তু বিস্তৃততর এই মন্দিরের পরিধি প্রশস্ততর তার কক্ষগুলি, সুন্দরতর দর্শনে। চুরানব্বই ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের সভাগৃহটি দাঁড়িয়ে আছে আটত্রিশটি শোভন গঠন অপরূপ স্তম্ভের উপর। বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভার। রচিত হয় দুইটি বাড়তি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠও দুইটি প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন, দেখি নাই দ্বিতীয় গুহা

মন্দিরে। নাই কোন অলঙ্করণ তোরণের প্রাচীরের অঙ্গে, সমৃদ্ধিশালী নয়, ভাস্করের হস্তের স্পর্শে।

আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রধান প্রবেশ পথের অলঙ্করণ, দেখি তার অঙ্গের জীবন্ত মূর্তি সম্ভারও, শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ এই মন্দিরের, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতমও, স্থপতির আর ভাস্করের অমূল্য দান, এক মহা-মহিমময় সৃষ্টি, অমর কীর্তি। দেখি লিন্‌টেলের শীর্ষদেশে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সারি সারি বুদ্ধ উপবিষ্ট। রচিত হয়, চৈত্য গবাক্ষের সারিরও, তাদের মাঝে মাঝে এক একটি মনুষ্য মস্তক। দুই প্রান্তে দুইটি পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছে, অনবদ্য ভঙ্গীতে স্থাপিত, তাদের হস্ত একটি গণের মস্তকের উপর, দাঁড়িয়ে আছে গণ—মকরের পৃষ্ঠের উপর। লিন্‌টেলটিও দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি সরু ও দীর্ঘ-চতুষ্কোণ-স্তম্ভের উপর, বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি, সুন্দরতম বিভিন্ন লতা ও পুষ্প। অলঙ্কৃত উদ্গত স্তম্ভের পাদদেশও যৌবন মদ-মত্তা, পীনোন্নতবক্ষা পরমা সুন্দরী নারী মূর্তি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে নারী এক একটি ভীষণ দর্শন মকরের পৃষ্ঠের উপর। অনুরূপ এই নারী মূর্তিগুলি সাঁচীর তোরণের বন্ধনীর অঙ্গের নারী মূর্তির—অনুরূপ গঠনে আর পরিকল্পনায়।

দেখি একে একে আরও দুইটি প্রবেশ পথও। গবাক্ষের অঙ্গের অলঙ্করণ দেখে, আমরা অলিন্দে উপনীত হই। আটাশটি সুষ্ঠু গঠন অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে শোভিত হয়ে আছে অলিন্দটিও। অঙ্গ নিয়ে আছে এই স্তম্ভগুলিও সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার, জীবন্ত মূর্তি সম্ভারও। অনবদ্য তাদের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গের শিল্প সম্পদ। অলঙ্কৃত কিছু অংশ চিত্র দিয়ে, চিত্র বিভিন্ন সুন্দরতম লতাপুষ্পের, অনুপম এই চিত্রগুলি, কিছু অংশে রচিত হয়েছে মূর্তি, মূর্তি কত সিংহের, কত গরুর, কত হস্তীর, কত ড্রাগনের, কত নাম না জানা কল্পিত জন্তুরও। তাদের কারও পৃষ্ঠে শোভা পায় নারী, কেউ সওয়ার বিহীন। অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব, সজীব, অনবদ্য তাদের প্রকাশ ভঙ্গী। সৃষ্টি হয় এক মহাসৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক সুন্দরতম লীলা নিকেতন, রচনা করেন বাঘের মহা-অভিজ্ঞ ভাস্কর আর মহা-পারদর্শী চিত্র-শিল্পী, রচিত হয় তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায়, হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে তাঁদের

মনের অন্তহীন মাধুরী। রচিত হয় স্তম্ভ, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুপ্ত-যুগের বৌদ্ধ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের, প্রতীক তার চিত্র শিল্পেরও। তাই লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি প্রকৃষ্টতম চারি কোণের উদ্গাত স্তম্ভের শিল্প সম্পদও, সম পর্যায়ে পড়ে বাইরের অলিন্দের স্তম্ভের অঙ্গের অলঙ্করণের। দেখি একে একে সভাগৃহের স্তম্ভের অঙ্গের ভূষণ, কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হই। অপরূপ এই কেন্দ্রস্থলের চারিটি স্তম্ভ কল্পনার অতীত, বর্ণনাতীতও তাদের শীর্ষ দেশের বন্ধনীর অঙ্গের মূর্তি সম্ভার। বুকে নিয়ে আছে তারাও সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ দান বাঘের ভাস্করের, মহা-সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে মহা-মহিমময় পরিকল্পনায় আর অনবদ্য রূপদানে। শ্রেষ্ঠ প্রতীক তারাও এক মহা গৌরবময় যুগের।

দেখি প্রকোষ্ঠের সম্মুখে রচিত হয়েছে তিনটি চন্দ্রাতপ। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম তাদের অঙ্গের কারুকার্যও, অতুলনীয় শীর্ষদেশের অলঙ্করণ। অলঙ্কৃত হয়েছে শীর্ষদেশ অনবদ্য ভূষণে, পরিণত হয়েছে তারা ভারতের সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ চন্দ্রাতপে। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই শিল্প সম্ভার দেখি। প্রণতি জানাই তাদের সৃষ্টি কর্তাকে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও হয়নি ম্লান, আছে উজ্জ্বল হয়ে মনের মণিকোঠায়।

মন্দির থেকে নির্গত হ'য়ে এসে পঞ্চম গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। সংযুক্ত ছিল পঞ্চম ও চতুর্থ গুহামন্দির একটি দু'শ কুড়ি ফুট অলিন্দ দিয়ে, তাই সমসাময়িক চতুর্থ-গুহামন্দিরের। দেখি বুকে নিয়ে আছে গুহামন্দিরটি একটি পঁচানব্বই ফুট দীর্ঘ ও চুয়াল্লিশ ফুট প্রস্থ কক্ষ, আছে তাতে দুইটি স্তম্ভের সারি। নাই স্তম্ভের অঙ্গে কোন শিল্প সম্ভার, বৃত্তাকার নয় স্তম্ভ দণ্ডও। একটি সুদীর্ঘ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি, প্রসারিত হয়ে আছে মঞ্চ কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। নির্মিত হয়েছে প্রাচীরের পাদদেশে মঞ্চের সমান্তরালে বেদী, বসতেন সেই বেদীর উপর বৌদ্ধ শ্রমণেরা। অলঙ্কৃত এই কক্ষের ছাদের অঙ্গ আর প্রাচীর গাত্রও নিরুপম চিত্র সম্ভার দিয়ে, ভূষিত তার স্তম্ভের অঙ্গও। কিন্তু নাই কোন শিল্প সম্ভার এই মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশ পথে, কোন অলঙ্করণ নাই চারিটি

গবাক্ষের অঙ্গেও। কিন্তু সমৃদ্ধিশালী ছিল তারাও অনুপম চিত্র-সম্ভার দিয়ে। খুব সম্ভব এইটিই ছিল বৌদ্ধ শ্রমণদের খাবার ঘর, হতে পারতো বক্তৃতা মঞ্চও।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে, একটি প্রশস্ত পথ অতিক্রম করে, ষষ্ঠ গুহামন্দিরে উপনীত হই। সমসাময়িক এই গুহামন্দিরটিও পঞ্চম গুহামন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে এই গুহামন্দিরটি একটি ছেচল্লিশ ফুট সমকোণ সভাগৃহ, সঙ্গে নিয়ে আছে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও তিনটি পিছনে। একটি বিহার, আছে এই বিহারে একটি মাত্র প্রবেশ পথ ও দুইটি গবাক্ষ, পরিদৃশ্যমান সেই গবাক্ষ দিয়ে সামনের উপত্যকা। ছিল এই গবাক্ষের সামনে একটি অলিন্দও, আচ্ছাদন গবাক্ষের। ভূপাতিত হয়েছে ছাদের নীচের অষ্টকোণ স্তম্ভগুলি, অদৃশ্য হয়েছে প্রাচীরের গাত্রের তুলনাহীন চিত্র সম্ভারও, কালের করালে, অবশিষ্ট আছে শুধু তাদের রেখা। নাই কোন ভূষণ; সুন্দরের লেশ ও নাই, দাঁড়িয়ে আছে শুধু দুইটি উদ্‌গত স্তম্ভ মন্দিরের প্রবেশ পথে, বুকে নিয়ে পত্র আর পত্রগুচ্ছের প্রতীক। দেখি, রচিত হয়েছে দুইটি পাত্র, গর্ভে নিয়ে পত্রগুচ্ছ বৃহৎ স্তম্ভ দণ্ডের দুই প্রান্তে। দেখেছি অনুরূপ একটি পাত্র গর্ভে নিয়ে পত্রগুচ্ছ চতুর্থ গুহামন্দিরের একটি উদ্‌গত স্তম্ভের উপরেও। ক্ষুদ্রতর সেই পত্রগুচ্ছটি। তাই মনে হয়; এই গুহামন্দিরটিও সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

আমরা মন্দির ও উদ্‌গত স্তম্ভ দেখে, একে একে সপ্তম, অষ্টম ও নবম গুহামন্দির দেখি। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই গুহামন্দিরগুলি, পরিপূর্ণ হয়ে আছে বিচূর্ণ প্রস্তর খণ্ডে আর ধুলোবালিতে। অনুরূপ পরিকল্পনায় সপ্তম গুহার স্তম্ভগুলি আর স্তূপ, দ্বিতীয় গুহামন্দিরের স্তম্ভের ও স্তূপের, কিন্তু নিকৃষ্টতর এই অনুকরণ, সমৃদ্ধিশালী নয় স্থপতির সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, বাঙ্ময় নয় ভাস্করের মনের মাধুরীতে, নয় জীবন্তও।

ফিরে এসে একে একে চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের চিত্র-সম্ভারগুলি দেখি। চতুর্থ গুহামন্দিরে প্রবেশ করে, দক্ষিণের প্রবেশ পথ দিয়ে অগ্রসর হই। এখান থেকেই সুরু হয় বাঘের মন্দিরের অনবদ্য চিত্র সম্ভার, শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বাঘের মন্দিরের। দেখি প্রবেশ পথের শীর্ষদেশে অঙ্কিত দুইটি দৃশ্য। অস্পষ্ট

প্রথম দৃশ্যটি। দেখি উন্মুক্ত বাতায়নের নীচে একটি শোকাকুলা রমণী উপবিষ্টা। দক্ষিণ হস্তে আবৃত তাঁর মুখমণ্ডল, প্রসারিত তাঁর বাম হস্ত প্রকাশের ভঙ্গীতে, তিনি নিবেদন করেন তাঁর দুঃখের কাহিনী পার্শ্বে উপবিষ্টা সঙ্গিনীকে। শোনেন তাঁর দুঃখের বারতা সহচরী, বিকশিত হয় তাঁর অন্তরের সমবেদনা তাঁর আননে। স্থাপিত তাঁর মস্তক তাঁর বাম হস্তের উপর। তাঁর মণিবন্ধে শোভাপায় বহুমূল্য জড়োয়ার কঙ্কণ, কণ্ঠে জোড়া মুক্তার মালা, কটিদেশে মণিমুক্তা খচিত বহুমূল্য চন্দ্রহার। শোভাপায় একটি বহুমূল্য জড়োয়ার কঙ্কণ শোকাকুলা রমণীর বাম মণিবন্ধেও। ছাদের উপর দুইটি নীল রঙের কবুতর বসে আছে, দেখছে এই দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি একটি উপবনের মধ্যে নীল ও শ্বেত বর্ণ আসনের উপর বসে আছেন চারিটি নর। মলিন তাঁদের অঙ্গের রং তাঁরা গভীর আলোচনায় নিযুক্ত। তাঁদের কটিদেশে শোভাপায় ধুতি, নাই অন্য কোন অঙ্গাবরণ। বামদিক থেকে দ্বিতীয়টির শিরে শোভা পায় একটি বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত, চতুষ্কোণ, সুবিশাল শিরোভূষণ, শোভাপায় শিরোভূষণ পাশের লোকটির শিরেও, কিন্তু বিভিন্ন তার আকৃতি, অত মূল্যবানও নয়। শোভাপায় তাঁদের কণ্ঠে জোড়া মুক্তার মালা, বাহুতে জড়োয়ার তাগা। হবেন তাঁরা কোন নৃপতি ও তাঁর মন্ত্রী, রাজার কর্ণে শোভাপায় হীরের কুণ্ডল। নাই কোন শিরোভূষণ তৃতীয়টির মস্তকে। খর্বকায় চতুর্থটি, কিন্তু তাঁর শিরেও একটি রাজ মুকুট। ভূষিত তাঁরাও ভূষণে, কিন্তু বহুমূল্য নয় সে ভূষণ, পর্যাপ্তও নয়। দেখি, মন্ত্রীর, পদতলে একটি বামন উপবিষ্ট। নীল তাঁর অঙ্গের বর্ণ, তাঁর শিরে শোভাপায একটি পক্ষগুচ্ছসমন্বিত শিরস্ত্রাণ। বেষ্টন করে আছে তাঁদের উপবনের বিভিন্ন লতা পল্লব ও পুষ্পগুচ্ছ।

ভিতরে অগ্রসর হয়ে তৃতীয় দৃশ্য দেখি। দেখি এক সারিতে পাঁচটি উড্ডীয়মান পুরুষ, নির্গত হন তাঁরা মেঘের অন্তরাল থেকে। পরিদৃশ্যমান পুরোধার বাম পদের নিম্নাংশ, দেখা যায় দক্ষিণ পদের জানুও। তাঁর পরিধানে একখানি ধুতি, অনাবৃত তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ। দৃশ্যমান শুধু কটি দেশের উপরাংশ অপর চারিজনের। ভূষিত তাঁদের অঙ্গ শ্বেত আর সবুজ বসনে, নাই কোন বসন দক্ষিণ স্কন্ধের উপর—অনাবৃত। প্রসারিত তাঁদের হস্ত

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে। খুব সম্ভব ঋষি তাঁরা, দেবর্ষি অথবা মহর্ষি। নীচের সারিতে পাঁচটি মহিলা সঙ্গীতজ্ঞা। হস্তে ধারণ করে আছেন কেন্দ্রস্থলের মহিলাটি একটি বীণা। তাঁদের শিরে বিন্যস্ত কবরী, অঙ্গে অঙ্গাবরণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের দুল। ভূষিত কেন্দ্রস্থলের গায়িকার অঙ্গ একটি নীল বর্ণের উপর সাদা বুটিদার অঙ্গাবরণে। তাঁর মস্তকে শোভা পায় শ্বেত বন্ধনী ও পান্নাখচিত স্বর্ণ মুকুট।

দেখি চতুর্থ দৃশ্য। দেখি পাশাপাশি দুইদল মহিলা সঙ্গীতজ্ঞা। বামে, সাতটি নারী একটি নর্তকীকে বেষ্টন করে আছে। অপরূপ এই নর্তকীর বেশ। অঙ্গে শোভাপায় ছাই রঙের সাদা বুটিদার একটি আলখেল্লা, বিস্তৃত জানু পর্যন্ত, কণ্ঠে একটি প্রশস্ত বন্ধনী। বিলম্বিত বন্ধনীর উপর একটি বহুমূল্য পান্না খচিত মুক্তার হার। তাঁর মণিবন্ধে জোড়া জড়োয়ার কঙ্কণ, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, পরিধানে পায়জামা, মস্তকে সবুজ ডোরাকাটা শিরোভূষণ, হস্তে নৃত্যের মুদ্রা, দাঁড়িয়ে আছেন তিনি নৃত্যের ছন্দে।

সাতটি নারী গায়িকার মধ্যে, একটির হস্তে শোভাপায় মৃদঙ্গ, তিনজনের হস্তে দুইটি করে ক্ষুদ্রাকার দণ্ড, অপর তিনজনের হস্তে মঞ্জিরা। নাই কোন আবরণ মৃদঙ্গ হস্তে নারীর উর্ধ্বাঙ্গে, উলঙ্গ কটিদেশ পর্যন্ত। অপরূপ তার অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠব। তার মদিরালস বিস্তৃত-আঁখি, বঙ্কিম গ্রীবা; যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত চঞ্চল বক্ষ বিস্ময় জাগায় মনে। বিলম্বিত তার মৃদঙ্গ তার বাম পার্শে একটি বন্ধনী দিয়ে। তার করে বাজাবার ভঙ্গী, সুবিন্যস্ত কবরীতে শোভাপায় একটি শ্বেত পুষ্প মাল্য, কর্ণে কুণ্ডল, মণিবন্ধে জড়োয়ার জোড়া কঙ্কণ।

তার দক্ষিণের গায়িকার অঙ্গে শোভাপায় একটি ওড়না, বিলম্বিত সেই ওড়না তার বাম স্কন্ধ পর্যন্ত। উত্তরীয়ের অন্তরাল থেকে নির্গত তার যৌবন-পুষ্ট কুচ যুগল। শোভাপায় তার মণিবন্ধেও তিনটি বলয়। পরবর্তী তিনটি মহিলা নিযুক্ত দণ্ড বাজাবার কাজে। অবশিষ্ট তিনটি, মঞ্জিরা বাজান। তাদের কেন্দ্রস্থলেরটির অঙ্গে শোভা পায় একটি হাফ হাতা নীলরঙের অঙ্গাবরণ। পরিধান করেন তাঁর পার্শ্ববর্তীটি একটি সবুজবর্ণের পরিচ্ছদ। দুজনেরই কর্ণে শোভাপায় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার হার, মণিবন্ধে জড়োয়ার যুগল কঙ্কণ। নাই কোন বসন বাম পাশের প্রান্তদেশের মহিলাটির উর্ধ্বাঙ্গেও,

অনাবৃত উরু পর্যন্ত। অপরূপ তার অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠবও। তার আকর্ণ বিস্তৃত মদিরালস নয়ন, যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত বক্ষ, হেলায়িত গ্রীবা বিভ্রম জাগায় মনে। তার নীবিবন্ধে শোভাপায় একটি ছাই রঙের শ্বেত ও নীল ডোরাকাটা শাড়ি, বিস্তৃত পা পর্যন্ত। তার বিন্যস্ত কবরীতে পুষ্পমাল্য, মস্তকে টায়রা, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার হার ও মণিবন্ধে জোড়া জড়োয়ার কঙ্কণ।

অনুরূপ দ্বিতীয় গায়িকার দলও। তারাও বেষ্টন করে আছে একটি নর্তকীকে, অনুরূপ বসনে আর ভূষণে। ছয়টি গায়িকার মধ্যে একটি মৃদঙ্গ বাজায়, দুইটি মঞ্জিরা, তিনটি দণ্ড। কেন্দ্রস্থলেরটির উধ্বাঙ্গে শোভা পায় একটি সবুজ বসন, কিন্তু পর্যাপ্ত নয় সেই বসন, পরিদৃশ্যমান তার অঙ্গসৌষ্ঠব তার অন্তরাল থেকে। তার পরিধানে একটি ডোরাকাটা শাড়ী। তার পার্শ্ববর্তীটির স্কন্ধে শোভা পায় একটি সবুজ ওড়্না, তার পার্শ্ববর্তীটির একটি হলুদ রঙের অঙ্গাবরণ। নিরাবরণ কটিদেশ পর্যন্ত অবশিষ্ট তিনটি মহিলা, পরিদৃশ্যমান তাদের পীনোন্নত চঞ্চল বক্ষ। সকলেরই কণ্ঠে শোভা পায় মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, মণিবন্ধে জড়োয়ার কঙ্কণ।

পঞ্চম দৃশ্যের সামনে উপস্থিত হই। পৃথক হয়ে আছে এই দৃশ্যটি চতুর্থ দৃশ্য থেকে একটি সবুজ বর্ণের প্রাচীরের চিত্র দিয়ে, উৎকীর্ণ তার পাদদেশে একটি গুপ্তযুগের শিলা লেখ। বাঘের চিত্রশিল্পী অঙ্কিত করেন এই দৃশ্যে অশ্বারোহীর শোভাযাত্রা। দেখি, অগ্রসর হন সপ্তদশ অশ্বারোহী, যান ছয় সারিতে দক্ষিণ থেকে বামে। কেন্দ্রস্থলের অশ্বারোহীর মস্তকের উপর শোভা পায় একটি ছত্র, প্রতীক নৃপতির। পরিধানে তাঁর হলুদ রঙের জমির উপর নীল বুটিদার পরিচ্ছদ। বাম হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন পিঙ্গল বর্ণ অশ্বের বল্গা। অশ্বের শিরে একটি চামর, দুইটি তার স্কন্ধের দুই পার্শ্বেও। অনুরূপ এই অশ্ব মূর্তিটি সাঁচীর অশ্ব মূর্তির, সমপর্যায়ে পড়ে অজন্তার গুহার প্রাচীরের গাত্রের চিত্রের অশ্বমূর্তিরও। নৃপতির পাশে ধূসর বর্ণের অশ্বে আরোহণ করে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অগ্রসর হন—খুব সম্ভব তিনিই সেনাপতি। তাঁর অঙ্গে শোভা পায় একটি সবুজ রঙের হলুদ বুটিদার পোশাক। তাঁর উপরে ঘন সবুজ বর্ণের অশ্ব পৃষ্ঠে অপর এক অশ্বারোহী

উপবিষ্ট। প্রক্ষিপ্ত তাঁর মস্তক প্রাচীরের উপর। তাঁর পরিধানে হলুদ রঙের পরিচ্ছদ। তাঁর অশ্বের শিরে বিরাজ করে একটি স্বর্ণছত্র। তিনি এক পাশে মুখ করে বসে আছেন। অপরূপ জীবন্ত এই মূর্তিটি, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

নৃপতির বাম পার্শ্বে, পাংশু বর্ণের অশ্ব পৃষ্ঠে পীতবর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বসে আছেন এক অশ্বারোহী। বাম হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন অশ্বের বলগা, প্রসারিত তাঁর দক্ষিণ হস্ত। অশ্বের পৃষ্ঠে একটি নীলবর্ণের জিন, আবৃত শ্বেত আবরণ দিয়ে।

তাঁর পাশে, একজন যান পদব্রজে, হারিয়েছেন তিনি তাঁর অশ্ব, পরিধানে তাঁর গিরিমাটি রঙের জামা ; শিরে পীতবর্ণের শিরস্ত্রাণ।

তাঁদের আগে আগে যান তিনটি অশ্বারোহী, নিশ্চিহ্ন হয়েছে তাদের অশ্ব কালের নির্মম হস্তে। দক্ষিণ প্রান্তের অগ্রগামীর হস্তে শোভা পায় একটি নীলবর্ণের ধনু, অঙ্গে পীতবর্ণের পরিচ্ছদ। অবনত দ্বিতীয়টির মস্তক, সজ্জিত তিনিও পীতবর্ণের পরিচ্ছদে, তাঁর শিরে শোভা পায় পক্ষীর আকার শিরোভূষণ, কর্ণে মণিমাণিক্য খচিত কুণ্ডল, শোভা পায় কুণ্ডল অন্য অশ্বারোহীদের কর্ণেও।

তৃতীয় সারিতে চারিটি অশ্বারোহী অগ্রসর হন, পুরোধায় রক্তবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী বসে আছেন। অশ্বের শিরে শোভা পায় চামর, পায় গলদেশের নীচেও। সজ্জিত তাঁর পার্শ্ববর্তী অশ্বারোহী নীল পরিচ্ছদে আর পীতবর্ণের পায়জামাতে। তিনি আকর্ষণ করে আছেন তাঁর ধূসর বর্ণের অশ্বের মুখ। অঙ্গে নিয়ে আছেন পীতবর্ণের বুটিদার পোশাক তৃতীয় অশ্বারোহী, চতুর্থ সজ্জিত নীলবর্ণের পোশাকে।

তাদের অনুগমন করেন তিন অশ্বারোহী, অনুগামী তাঁরা শোভাযাত্রার। ভূষিত প্রথম ও দ্বিতীয়টি পীতবর্ণের পোশাকে। তাঁরা বসে আছেন পাণ্ডু ও সবুজবর্ণের অশ্বপৃষ্ঠে। উপবিষ্ট তৃতীয়টি একটি পিঙ্গলবর্ণের অশ্বপৃষ্ঠে, ভূষিত তাঁর অঙ্গ নীল বসনে।

অঙ্গে নিয়ে আছেন তাঁরা সকলেই দীর্ঘ হাতযুক্ত পোশাক, বিস্তৃত জানু পর্যন্ত। তাঁদের শিরে শোভা পায় শিরোভূষণ—কারও শ্বেত, কারও পীত-

বর্ণের, কারও বুটিদার, বিলম্বিত সেই শিরোভূষণ, তাঁদের স্কন্ধ পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী এই অশ্বগুলিও—দুর্মদ, দুর্ধর্ষ, একেবারে জীবন্ত, অনুরূপ শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মন্দিরের শেষাগিরি রাও মণ্ডপমের প্রস্তরে নির্মিত অশ্বমূর্তির। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।*

ষষ্ঠ দৃশ্যে উপনীত হই। একটি প্রস্তরের প্রাচীরের চিত্র দিয়ে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ দৃশ্যকে পৃথক করা হয়েছে। অঙ্কিত হয়েছে এই দৃশ্যেও একটি শোভাযাত্রা,—শোভাযাত্রা ছয়টি হস্তীর ও তিনটি অশ্বের। অপরূপ এই হস্তীমূর্তিগুলি, মহিমময়, জীবন্ত, অনুরূপ অজন্তার চিত্রের হস্তীমূর্তির অঙ্গসৌষ্ঠবে আর প্রাণবন্তে, মহাপরাক্রমশালী অশ্বমূর্তিগুলিও। তারা শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাঘের চিত্রশিল্পীর, অনবদ্য সুন্দরতম দান।

নিশ্চিহ্ন হয়েছে পুরোধার হস্তীটি, অবশিষ্ট আছে শুধু তার মস্তকের রেখা। তার আরোহীকে দেখি। এক বিশালবপু কপিল বর্ণের পুরুষ, মস্তকে তাঁর দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ। তাঁর শিরে শোভা পায় একটি শ্বেত শিরোভূষণ। হবেন তিনি কোন নৃপতি তাই পুরোধা এই শোভাযাত্রার। কিন্তু অনাবৃত কটিদেশ পর্যন্ত, কটিদেশে শোভা পায় নীল ও সাদা ডোরাকাটা ধুতি। দক্ষিণহস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি পদ্মফুল, বসে আছেন গিরিমাটি রঙের হাওদার উপর। তাঁর পশ্চাতে আঁট পোশাকে সজ্জিত হয়ে বসে আছে কিঙ্কর—দক্ষিণ হস্তে সে আন্দোলিত করে একটি রক্তবর্ণ চামর, বাম হস্তে ধারণ করে আছে রাজছত্রের দণ্ড। ছত্রের অঙ্গ থেকে বিলম্বিত একটি মাল্য। অনুরূপ এই রাজছত্রটি সাঁচীর আর মথুরার স্তূপের অঙ্গের রাজছত্রের।

তাঁর পশ্চাতে একটি ধূসর বর্ণের অশ্ব, সজ্জিত জিন আর লাগাম দিয়ে। তার কানের পাশ দিয়ে বিলম্বিত একটি চামর। অদৃশ্য হয়েছে অশ্বারোহী কালের করালে, পরিদৃশ্যমান শুধু তার নাসিকার অগ্রভাগ আর দক্ষিণ চক্ষু। দেখি দুইটি হস্তও, এক হস্তে তিনি ধরে আছেন অশ্বের বল্গা। বলেন ডাঃ ইম্পে, তাঁর শিরে একটি পাগড়ি ছিল, নাই অপর কোন অশ্বারোহীর শিরে।

কেন্দ্রস্থলে চারিটি হস্তী দেখি, দুইটি অতিকায় মহিমময়, দুইটি ক্ষুদ্রতর।

---

* মন্দিরময় ভারত প্রথম পর্ব ৭০-১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তারা এক সারিতে অগ্রসর হয়ে, নৃপতিকে অনুগমন করে। দেখি সারি অতিক্রম করে একটি ক্ষুদ্র হস্তী, নিযুক্ত মাহুত অঙ্কুশের আঘাতে তাকে ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায়। দেখি, দুই আরোহী উপবিষ্ট দুইটি বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, হস্তে নিয়ে দণ্ড।

কেন্দ্রস্থলের বৃহৎ হস্তীটির সুবিশাল মুখ থেকে নির্গত হয় দুইটি গজদন্ত, নীল তাদের অগ্রভাগ। সম্মুখের ক্ষুদ্র হস্তীর পৃষ্ঠের উপর একটি মাহুত বসে আছে, উপবিষ্ট শোভাযাত্রার সবশেষের হস্তীর পৃষ্ঠের উপরও একজন মাহুত। হস্তে নিয়ে আছে মাহুত দুইটি করে অঙ্কুশ। নাই কোন আবরণ মাহুতদের উর্ধ্বাঙ্গে, কটিদেশে শোভা পায় নীল ও শ্বেত ডোরাকাটা ধুতি। উপবিষ্টা হস্তীর পৃষ্ঠের উপর তিনজন পরমা রূপবতী নারীও। প্রসারিত তাদের মধ্যে দু জনের পদযুগল। অবনত তৃতীয়টি, দুই হস্ত দিয়ে বেষ্টন করে আছে সঙ্গিনীকে। তাদের পরিধানে ডুরে শাড়ী। নাই কোন বসন প্রথম ও তৃতীয়টির উর্ধ্বাঙ্গে—উলঙ্গ কটিদেশ পর্যন্ত। পরিদৃশ্যমান তাদের পীনোন্নত যৌবনপুষ্ট স্তন যুগল। দ্বিতীয়টির অঙ্গে একটি অঙ্গাবরণ, উন্মুক্ত বক্ষের সামনে, পরিস্ফুট তার আভাস, ইঙ্গিত এক সুস্পষ্ট কামনার। তাদের কর্ণে শোভা পায় হীরের কুণ্ডল, কণ্ঠে পান্নাখচিত মুক্তার হার, মস্তকে টিকলি, মণিবন্ধে জড়োয়ার কঙ্কণ আর পায়ে মল। অলঙ্কৃত তাদের হস্তীর পৃষ্ঠ ফুলের বুটি দেওয়া গৈরিক হাওদা দিয়ে।

সপ্তম দৃশ্যে উপস্থিত হই। দেখি পৃথক করা হয়েছে এই দৃশ্যটিকে ষষ্ঠ দৃশ্য থেকে একটি অট্টালিকা ও প্রবেশ দ্বারের চিত্র দিয়ে। অনুরূপ অট্টালিকা আর প্রবেশ দ্বারের চিত্র দিয়ে পৃথক করা হয়েছে অজন্তার গুহার প্রাচীরের অঙ্গের চিত্রকেও। বাঘ গুহামন্দিরের শেষ দৃশ্য, পরিদৃশ্যমান ছিল এই দৃশ্যটি যখন ডাঃ ইম্পে দর্শন করেন এই গুহামন্দির। উল্লিখিত আছে তাঁর গ্রন্থে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই দৃশ্যে চারিটি হস্তী ও তিনটি অশ্ব। এইখানে এসেই পরিসমাপ্তি হয়েছিল তাদের যাত্রার। হস্তীর মস্তকের উপর, হস্তের উপর মস্তক স্থাপন করে মাহুতেরা নীরবে বিশ্রাম করছিল। নিবদ্ধ ছিল হস্তীগুলির দৃষ্টি সম্মুখের দিকে, পলকহীন অশ্ব তিনটির দৃষ্টিও, প্রসারিত সম্মুখ পানে। বেষ্টন করা ছিল একটি হস্তীর শুণ্ড ডোরাকাটা বসন দিয়ে। দাঁড়িয়েছিল দুই

সহিস হস্তে নিয়ে অসি আর বল্লম। নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টিও সম্মুখ পানে। কিছুদূরে একটি আম্রবৃক্ষের নীচে তুইটি আধারের মধ্যে স্থাপিত ছিল জলের কলস ও ফল। আম্রশাখা থেকে বিলম্বিত একটি শ্বেত বসন, নীল তার তুই প্রান্তদেশ। ছিল তার পাশে একটি চক্র।

আরও দূরে, একটি কদলী বৃক্ষের নীচে, পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ। তিনি বাম হস্ত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ। তাঁর পাশে বসে এক শিষ্য তাঁর বাণী শ্রবণ করছিলেন। তার পর একটি দ্বার, দ্বারের পশ্চাতে একটি ভগ্ন প্রাচীর।

আছে এখনও কিছু অবশিষ্ট সেই দৃশ্যের। দেখি, একটি বিশালকায় হস্তী, নীল তার তুইটি বৃহৎ দন্তের অগ্রভাগ। পৃষ্ঠে নিয়ে আছে হস্তীটি হাওদা। দেখি হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট তুজন আরোহী, মাহুতও বসে আছে, হস্তে নিয়ে অঙ্কুশ। তার পিছনে উপবিষ্ট দ্বিতীয় আরোহী। দেখা যায় তুইটি অস্পষ্ট হস্তীও, কিছুদূরে একটি অশ্বের মস্তক। অপরূপ শোভন গঠন এই মস্তকটি, পরিচায়ক পূর্ব গৌরবের।

কিছু দূরে একটি বৃক্ষের কাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে লতাগুল্ম। আরও দূরে পরিদৃশ্যমান তুইটি মূর্তি, একটি শ্বেত বসনে ভূষিত হয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, উর্ধ্বে উত্তোলিত তাঁর দক্ষিণ হস্ত। তিনিই ডাঃ ইস্পের বর্ণিত বুদ্ধ। দৃশ্যমান দ্বিতীয়টির শুধু মুখের কিছু অংশ। একটি প্রবেশ দ্বারও দেখি।

দেখি চতুর্থ গুহার কেন্দ্রস্থলের প্রবেশ পথের উত্তরেও অঙ্কিত ছিল চিত্র। কিন্তু পরিদৃশ্যমান নয় সেই চিত্রগুলি, সম্ভব নয় তাদের স্বরূপ জানাও, তাই অবর্ণনীয় এই চিত্রগুলি।

ভিতরের মন্দিরের প্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকেও কয়েকটি মহিমময় চিত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখি। দেখি শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে, নিমীলিত নেত্রে একটি পরমা সুন্দরী নারী দাঁড়িয়ে আছে। তার কর্ণে শোভা পায় বৃহৎ কুণ্ডল। অপরূপ এই নারী মূর্তিটি, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। কেন্দ্রস্থলে একটি পুরুষ মূর্তি। দৃশ্যমান শুধু তার স্কন্ধ আর হস্ত তুইটি, অবলুপ্ত অবশিষ্ট অংশ কালের নির্মম হস্তে। দেখি, পশ্চাতেও অঙ্কিত ছিল একটি বৃহৎ যক্ষমূর্তি, অবশিষ্ট আছে শুধু তার ধড়, চিহ্ন নাই হস্তপদের, নিশ্চিহ্ন হয়েছে মস্তক।

দেখি প্রাচীরের গাত্রের লতা-পল্লব আর পুষ্পের সম্ভারও। দেখি, তরঙ্গায়িত পদ্মের বৃন্ত, অঙ্গে নিয়ে পদ্মপত্র, পদ্মফুল আর পদ্মের কোরক শোভা করে আছে প্রাচীরের অঙ্গের শীর্ষদেশ, অলঙ্কৃত হয়েছে কার্নিসের নীচের অংশও। তাদের মাঝে মাঝে অঙ্কিত কত বিভিন্ন পুষ্প, কত বিচিত্র পক্ষী, কত বিভিন্ন জন্তু, মূর্তি কত মানুষেরও। দেখি অলঙ্কৃত লতাগুল্ম, আর বিভিন্ন পুষ্পের সম্ভার দিয়ে পিছনের স্তম্ভের অঙ্গও। অনুপম, সূক্ষ্মতম অনবদ্য সুরুচি-সম্পন্ন এই চিত্রগুলি, বুকে নিয়ে আছে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পের নিদর্শন, প্রতীক এক মহা গৌরবময় যুগের। দুর্ভাগ্য ভারতের নিশ্চিহ্ন হয়েছে ছাদের অঙ্গের চিত্রগুলি, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে।

তৃতীয় গুহা মন্দিরে ফিরে আসি। দেখি, অঙ্কিত ছিল বুদ্ধ আর বোধি সত্ত্বের মূর্তি, বাইরের পাঁচটি প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের গাত্রে। চিহ্ন নাই মূর্তির, বিলুপ্ত হয়েছে কালের করালে, অবশিষ্ট আছে শুধু তাদের জ্যোতি। একটি মস্তক আর স্কন্ধের পরিচ্ছদও দেখি। দেখি, অলঙ্কৃত পিছনের প্রাচীরের গাত্র শ্বেত পুষ্প দিয়ে।

ভিতরের কেন্দ্রস্থলের প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের গাত্রেও অঙ্কিত দেখি কয়েকটি বুদ্ধ মূর্তি। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন বুদ্ধেরা, তাঁদের মস্তকের উপর অঙ্কিত বৃত্তাকার জ্যোতির্মণ্ডল। দেখি, এক বুদ্ধের পদপ্রান্তে জানুপেতে বসে আছেন এক অপরূপ পরমারূপবতী নারী পূজারিণী, তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় জ্বলন্ত প্রদীপ, বাম হস্তে পূজার উপকরণ।

দেখি এক মহামহিমময় পরিকল্পনার সুন্দরতম আর অনবদ্য রূপদান। দেখি বাঘের বৌদ্ধ স্থপতির আর ভাস্করের—দেখি গুপ্ত যুগের স্থপতির আর ভাস্করের মহামহিমময়, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম সৃষ্টি, কীর্তি এক মহা গৌরবময় যুগের। তাঁরা বিন্ধ্যার জীবন্ত অঙ্গ কেটে নির্মাণ করেন নয়টি গুহা মন্দির, অলঙ্কৃত করেন তাদের প্রাচীরের গাত্র কত অনবদ্য মূর্তি সম্ভার দিয়ে। রচনা করেন স্তম্ভ ভূষিত করেন তাদের অঙ্গ সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভার দিয়ে, অলঙ্কৃত করেন তাদের শীর্ষদেশ আর বন্ধনীর অঙ্গ কত শোভন গঠন, জীবন্ত মূর্তি-সম্ভার দিয়ে, পরিণত হয় তারা শ্রেষ্ঠ স্তম্ভে। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বাঘের গুহা মন্দির বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে।

আসেন বাঘের চিত্র শিল্পী, শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী গুপ্ত যুগের—ভারতেরও, তাঁরা অলঙ্কৃত করেন তাদের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ অনবদ্য সুন্দরতম চিত্র-সম্ভার দিয়ে। তাই দেখি রাজস্থানের এক মহা ঐশ্বর্যশালী নৃপতির শোভা যাত্রা, শোভাযাত্রা হস্তীর আর অশ্বেরও। আছেন তার মধ্যে সেনাপতি, মন্ত্রী, সভাসদ, পাত্র, মিত্র, নর্তকীরাও। সজ্জিত তাঁরা বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে। অঙ্কিত হয়, প্রাচীরের গাত্রে, কার্নিসের নীচে, স্তম্ভের আর ছাদের অঙ্গে, অপরূপ লতাপল্লব আর পুষ্প-সম্ভার, সঙ্গে নিয়ে অনবদ্য পশু-পক্ষী আর মূর্তির সম্ভারও। দেখি, কি অপরূপ সুষমা দিয়ে তাদের রূপ দান করেন বাঘের মহা অভিজ্ঞ চিত্র শিল্পী, উজাড় করে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দেন মনের অপরিসীম মাধুর্য, রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে এক মহা সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক স্বপ্নলোক, এক স্বপ্নপুরী, এক মহা রহস্যলোকে পরিণত হয় বাঘ। সমপর্যায়ে পড়ে এই চিত্রগুলি অজন্তার গুহা মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের আর ছাদের অঙ্গের চিত্রের, অনুপম বর্ণসুষমায়, অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গীতে; নিখুঁত গতির ছন্দে আর তুলনাহীন অঙ্গ বিন্যাসের বিভিন্নতায়। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা, সুন্দরের পূজারী, মহা অভিজ্ঞ চিত্র শিল্পী, সৌন্দর্যের সৃষ্টিই তাঁদের মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য, গৌন অন্য সব। তাই রচনা করেন তাঁরা প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে এক মহা সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক নন্দন কানন। বস্তু তাঁদের ভিত্তি, তাই অঙ্কিত করেন সাংসারিক জীবনের চিত্রাবলী, দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী, কাহিনী তাদের সুখ দুঃখের, আনন্দ উৎসবের। সীমাহীন কল্পনার রসে রঞ্জিত হয় বস্তু, হয় সেই সব কাহিনীও। রচিত হয় এক মহাকাব্য প্রাচীরের গাত্রে, রচনা করেন ছাদের অঙ্গেও। অতিক্রম করে সেই কাব্য বাস্তবের সীমা, হয় অলোকসুন্দর। তাই লাভ করেন বাঘের চিত্র শিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্রশিল্পের দরবারে, হন বিশ্বজিৎ। লাভ করেন অমরত্ব, অমরত্ব লাভ করে ভারতবর্ষও।

ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মন্দিরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুহামন্দির নির্মাণ

স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের ক্রম বিকাশ

দেশের ও জাতির সভ্যতার মাপকাঠি তার স্থাপত্য, তার মূর্ত বিকাশ, পরিচায়ক তার প্রতিভার ক্রমোন্নতির, নির্দেশক তার আশা আকাঙ্খার, তার সাফল্যের, তার শ্রেষ্ঠত্বেরও। প্রতিফলিত হয় দেশের ও জাতির সংস্কৃতি আর সভ্যতা তার স্থাপত্যে। বাড়ে সভ্যতা, উপনীত হয় দেশের ও জাতির সংস্কৃতি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, উন্নততর হয় তার স্থাপত্য, হয় উন্নততম, প্রকৃষ্টতমও, লাভ করে সুন্দরতম রূপ, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ভারত যুগে যুগে—পরিণত হয় সংস্কৃতি আর সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল হয় কৃষ্টিরও, গড়ে ওঠে অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মৌর্য, চালুক্য, সুঙ্গ, রাষ্ট্রকূট ও কুষাণ স্থাপত্য ভারতের দিকে দিকে, গড়ে ওঠে দ্রাবিড় ও আর্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। রূপ লাভ করে তাদের যুক্ত ভাবধারা, সম্মিলিত সভ্যতা আর সংস্কৃতি, মূর্ত হয় তাদের স্থাপত্যে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, হয় অপরূপ।

নির্মিত হয় কত রাজ প্রাসাদ, কত হিন্দু মন্দির, কত বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, কত জৈন বস্তি, কত বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন গুহামন্দির, নির্মিত হয় দক্ষিণ ভারতে, দাক্ষিণাত্যে, মালবে, রাজস্থানে, আর্যাবর্তে, কলিঙ্গদেশে আর বাংলায় বুকে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার, প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ। রচনা করেন ভারতের মহাপারদর্শী স্থপতি; করেন সুনিপুণ ভাস্কর, বাদ যান না মহা অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্পীও, রেখে যান তাঁদের অমূল্য দান। সাজান তাদের সম্মুখভাগ, ছাদের অঙ্গ, প্রাচীরের গাত্র আর শীর্ষদেশ কত অনুপম বিভিন্ন লতাপল্লব আর পুষ্প দিয়ে, অলঙ্কৃত করেন কত সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত মূর্তি-সম্ভার দিয়েও, মিশিয়ে দেন মনের অপরিসীম মাধুরী, ঢেলে দেন হৃদয়ের

সবখানি ঐশ্বর্য দেন যুগের পর যুগ। রচিত হয় কত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, কত স্বপ্নলোক, কত রহস্যপুরী ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের। লাভ করে ভারত শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও চিত্র-শিল্পের দরবারে। সৌভাগ্যশালী হয় ভারত, গৌরবান্বিত হয় ভারতবাসী, অমর হন ভারতের স্থপতি, ভারতের ভাস্কর আর তার চিত্রশিল্পী, অমরত্ব লাভ করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা নৃপতিরাও ইতিহাসের পাতায়।

বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি দেশের স্থাপত্য তার নিজস্বরূপ, তার আপন বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয় তার স্থাপত্যে, বিকশিত হয় তার শ্রেষ্ঠ, মহাঅভিজ্ঞ আর সুনিপুণ স্থপতির সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ সভায়। তাই বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গ্রীক স্থপতির বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ পূর্ণতা, রোমের অমলিন, নিখুঁত স্থাপত্য বিজ্ঞান, ফরাসী গথিকের প্রগাঢ় অমিত শক্তি আর ইটালীর স্থাপত্য অগাধ, সীমাহীন পাণ্ডিত্য।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, বাসস্থান দ্রাবিড় মনীষীর আর আর্য-ঋষির, ধ্বনিত হয় তার বেদের মন্ত্রে, তার সাম গানে আর মনীষীদের বাণীতে মোক্ষলাভের উপায়, ছড়িয়ে পড়ে সেই বাণী ভারতের দিকে দিকে, প্রকম্পিত হয় তার আকাশ বাতাস, তাই বুকে নিয়ে আছে ভারতের স্থাপত্য, তার চিত্রশিল্প আধ্যাত্মিক জীবনের মূর্ত প্রতীক।

ধ্যান করেন ভারতের মুনি ঋষিরা, নিমগ্ন থাকেন ধ্যানে, নিযুক্ত থাকেন কঠোর তপস্যায়ও নিভৃতে, নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে, জানতে পারেন ভগবানের স্বরূপ, রূপ পরিগ্রহ করে সেই ধ্যান দেব দেবীর মূর্তিতে, বর্ণিত হয় সেই মূর্তি তাঁদের বাণীতে, ধ্বনিত হয় পূজার মন্ত্রে। অবহিত হয় ভারতবাসী তাদের স্বরূপ—রূপ প্রতিটি দেবতার আর দেবীর অবগত হয় পূজার পদ্ধতিও, নিযুক্ত হয় তাঁদের পূজায় প্রতিমা গড়িয়ে। পূজা করে মুক্তির কামনায়; করে জ্ঞানাতীতকে লাভ করবার জন্য। তারা উপলব্ধি করে—নাই সুখ সাংসারিক জীবনে, নাই শান্তি, অনিত্য এ জীবন নিত্য শুধু ব্রহ্ম সনাতন, জ্ঞানাতীত, শাশ্বত, আনন্দময়। লাভ করতে হবে জীবকে সেই পরম ব্রহ্ম-জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে তবেই হবে মুক্তি। থাকবে না অহঙ্কার, দূর হবে

স্নেহ-মমতা, ঘুচে যাবে মোহ, হবে এক মহাপ্রশান্তি, হবে মোক্ষ লাভ। তাই যাপন করতে হবে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন—সমন্বয় করতে হবে আধ্যাত্মিক আর সাংসারিক জীবনের—তাই এই পূজা।

পূজিত হন দেবদেবী গৃহকোণে, হন মন্দিরেও। গড়ে ওঠে মন্দির, বুকে নিয়ে ধর্মের মূর্ত প্রতীক। বিকশিত হয় ধর্মের বাণী, বাণী মুনিঋষিদের, বর্ণিত হয় পুরাণের কাহিনীও—কাঠের, প্রস্তরের আর ইষ্টকের অঙ্গে, হয় বাঙ্ময় মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, করে মূর্তি পরিগ্রহ, করে যুগে যুগে। খোদিত হয় দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, মূর্তি কত শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর, মূর্তি তাঁর দশাবতারের, মূর্তি কত শিবের বিভিন্ন রূপের, মূর্তি মহেশ্বরের, ভৈরবের, নটরাজের, মূর্তি কত পার্বতীর, দুর্গার, কালীর, মহালক্ষ্মীর আর গজলক্ষ্মীরও, মূর্তি কার্তিকের, গণেশের আরও কত দেবতার আর দেবীর। মূর্তি দিয়েই প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয় কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী কত রামায়ণের আর মহাভারতেরও, দৃশ্য কত যাগযজ্ঞেরও, অলঙ্কৃত হয় তার সর্বাঙ্গ, পরিণত হয় মন্দিরের প্রাচীর এক বিরাট ধর্মগ্রন্থে। রচিত হয় মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে কত বহু বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চও, অভিনয় করেন সেই রঙ্গমঞ্চে কত রাজা, কত রাণী, কত সভাসদ, কত সঙ্গীতজ্ঞ, কত রাজ-নর্তকী, বাদ যান না দেবদেবী আর মুনিঋষিরাও। শোভা পায় কত বন আর উপবনও, বিচরণ করে সেই সব বনে আর উপবনে কত পশু, কত পক্ষী, কত হিংস্র ব্যাঘ্র, কত জীবন্ত হস্তী, কত ভয়াল সর্পও। অতিক্রম করে বস্তু আর বাস্তব উপনীত হয় জ্ঞানাতীতে। অনবদ্য এই মূর্তির সম্ভার, মহিমময় পরিকল্পনায়, সুন্দরতম রূপদানে, জীবন্ত ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, মনের মাধুরীতে আর হৃদয়ের ঐশ্বর্যে। নির্ভুল কাহিনীও, পরিচায়ক ভাস্করের অতুলনীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের, তার অগাধ পাণ্ডিত্যেরও। তাই লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

বৌদ্ধরা প্রবল হন ভারতে, প্রবল থাকেন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত, দীর্ঘ সহস্র বৎসর, গড়ে ওঠে স্তূপ, চৈত্য আর বিহার ভারতের দিকে দিকে, যুক্ত হয় প্রাচীরের গাত্রে বুদ্ধের জীবনের কাহিনী, কাহিনী জাতকেরও, বুদ্ধের পূর্ব জীবনের। রচিত হয় কত

মহামহিমময় বুদ্ধ মূর্তি, মূর্তি কত বোধিসত্ত্বেরও, মূর্তি পদ্মপাণির আর বজ্রপাণির, তাঁরাও মহিমময় পরিকল্পনায়; অনবদ্য রূপ দানে লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎসভায়।

আদিতে খড় আর বাঁশ দিয়ে তৈরী হয় মন্দির, নির্মিত হয় বৈদিক যুগে। বাড়ে সভ্যতা আর সংস্কৃতি, রচিত হয় কাঠ দিয়ে মন্দির, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্র বৎসরের মধ্যভাগে। শেষে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রবর্তন করেন প্রস্তরে তৈরী মন্দির, নির্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি, তাতে থাকে কিছু কাঠের কাজও। অবশেষে চতুর্থ আর পঞ্চম শতাব্দীতে সম্পূর্ণ বর্জিত হয় কাঠের ব্যবহার মন্দির নির্মাণে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে বাঁশের আর কাঠের তৈরী মন্দির, বুকে নিয়ে অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, কত শত বৎসরের স্থপতির প্রকৃষ্টতম দান, কত অমূল্য সম্পদ কালের নির্মম হস্তে। কিন্তু আজও দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তরে তৈরী মন্দির, স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, প্রতীক হয়ে আছে তাদের পূর্ব গৌরবের, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ কীর্তি কত মহাগৌরবময় যুগের, দাঁড়িয়ে আছে অক্ষয় হয়ে, দুহাজার বছরের প্রকৃতির অত্যাচার অগ্রাহ্য করে।

প্রিয়তম পর্বতের গুহা ভারতের মুনিঋষিদের, নিভৃততম, প্রকৃষ্টতম স্থান ধ্যান ধারণার আর কঠোর তপশ্চারণের, তাই রচিত হয় গুহামন্দির ও জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে বরাবর আর নাগার্জুনি পর্বতে, পশ্চিমঘাট শৈলমালায়, সালসেটি দ্বীপে, এলোরায়, অজন্তায়, আর মালবে—বিন্ধ্যর অঙ্গে, বাঘে। নির্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি, নির্মিত হয় চৈত্য আর বিহার। উপাসনা করেন সেই সব চৈত্যে বা বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরে, বৌদ্ধ শ্রমণ আর বৌদ্ধ পুরোহিত, বাস করেন তাঁরা বিহারে। অতিবাহিত হয় তাঁদের জীবন নিভৃতে নির্জনে, মহাজ্ঞানী বুদ্ধের পূজায় আর তথাগতের অর্চনায়।

অস্তমিত হয় বৌদ্ধ ক্ষমতা, বৌদ্ধ প্রভাব ভারতে, হিন্দুরা আবার প্রবল হন, নির্মিত হয় হিন্দু গুহামন্দিরও ভারতে, বাদামীতে, এলোরাতে, সালসেটি দ্বীপে আর এলিফ্যাণ্টাতে। তাঁদের অনুগমন করেন জৈনরা, রচিত হয় ভারতে জৈন গুহামন্দিরও খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে, এলোরাতে, আর জুনারে।

বিভক্ত এই গুহামন্দির নির্মাণ স্থাপত্য চারিযুগে ঃ
আদি বা মৌর্যযুগ ঃ

বিস্তৃত এই যুগ খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ পর্যন্ত। খ্রীষ্টের জন্মের দু'শ চুয়াত্তর বৎসর পূর্বে, মৌর্য প্রিয়দর্শী অশোক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। তিনি কলিঙ্গ জয় করেন, হন ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। বিস্তৃত তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে কাবুল উপত্যকা থেকে দক্ষিণে তামিল নাদের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রের রাজ্যের সীমা পর্যন্ত। পশ্চিমে গির্ণার শৈলমালা থেকে পূর্বে ধাউলি পর্বত পর্যন্ত। কাম্বোজ, গান্ধার, অন্ধ্র, মহীশূর, কাশ্মীর, নেপাল, পুণ্ড্রবর্ধন আর সমতট তাঁর অধিকারে আসে। দীক্ষিত হন তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ২৫৫ খ্রীষ্টপূর্বে, রাজধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধ ধর্ম হয় ভারত সম্রাট অশোকের ধর্মে। প্রেরিত হন বৌদ্ধ প্রচারক ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, গুজরাটে, কটকে, মহারাষ্ট্রদেশে, আর গগ্রামে। প্রচারক যায় কাবুলে, আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে, পেগুতে আর আলেকজেন্দ্রিয়াতেও। সিংহলে প্রেরিত হন পুত্র মহেন্দ্র আর কন্যা সঙ্ঘমিত্রা। প্রচারিত হয় বুদ্ধের বাণী—বাণী সাম্যের, অহিংসা আর শান্তির ভারতের দিকে দিকে, হয় বৃহত্তর ভারতে আর ভারতের বাইরেও। পৃথিবীর ধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধ ধর্ম। খোদিত হয় বুদ্ধের বাণী শৈলমালার অঙ্গে আর প্রস্তরের স্তম্ভে। নির্মিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ এক একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে, অঙ্গে নিয়ে উজ্জ্বল, মসৃণ স্তম্ভ দণ্ড। ঘণ্টার আকারে রচিত তাদের শীর্ষদেশ, শীর্ষদেশে, মঞ্চের উপর শোভা পায় সিংহ, হস্তী অথবা বৃষ, কারও শীর্ষদেশে একটি, কারও একাধিক। প্রতীক তারা, আছে তাদের পৌরাণিক মর্ম। সুন্দরতম প্রকৃষ্টতম তাদের মধ্যে কাশীর নিকটে সারনাথের স্তম্ভ। শীর্ষে নিয়ে আছে এই স্তম্ভটি তিনটি সিংহ, কেশর ফুলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। শিরে ধারণ করে আছে সিংহ একটি সুবিশাল চক্র, বিশ্বের ধর্মের প্রতীক।

রচিত হয় পাথরের স্তূপ, বুকে নিয়ে বুদ্ধের স্মৃতির প্রতীক। সম্রাট অশোকই নির্মাণ করেন চুরাশি হাজার স্তূপ ভারতে। পূজিত হয় বুদ্ধের স্মৃতি বা প্রতীক সেই সব স্তূপে। নির্মিত হয় প্রস্তর দিয়ে চৈত্যও—বৌদ্ধ উপাসনা মন্দির রাজগৃহে ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বে। রাজগৃহেই রচিত হয় প্রথম প্রস্তর

দিয়ে একটি সঙ্ঘারাম বা বিহার বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের স্থান মিলনেরও। ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বে মহারাজ অশোকই নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই সব চৈত্য আর বিহার অনবদ্য স্তম্ভ, অলঙ্কৃত হয়ে আছে অনুপম রেল বা গরাদে দিয়েও। সুন্দরতম রেল দিয়ে শোভিত করা হয় স্তূপের শীর্ষদেশও। নির্মিত হয় শৈলমালার অঙ্গে জীবন্ত পাহাড় কেটে চৈত্য আর বিহারও, মহারাজ অশোকই খ্রীষ্টের জন্মের দু'শ পঞ্চাশ বছর পূর্বে নির্মাণ করেন।

সবগুলিই পরমাশ্চর্য দান ভারতীয় স্থাপত্যে, নির্ধারক তার ভবিষ্যৎ স্থাপত্যের ধারারও। স্তূপ নির্দেশক অনবদ্য গঠন গরিমার, স্তম্ভ অনুপম শৈল্পিক সৌন্দর্যের আর পাহাড়ের অঙ্গের চৈত্য আর বিহার পরিচায়ক বিশিষ্ট সুনিপুণ স্থাপত্যজ্ঞানের। মহা সমৃদ্ধিশালী হয় ভারত স্থাপত্যে, হয় রাজর্ষি মহারাজ অশোকের অন্তরের অন্তরতম প্রেরণায় আর বৌদ্ধ স্থপতির সীমাহীন অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আর উদ্যমে। উপ্ত হয় স্থাপত্যের অঙ্কুর বুদ্ধ গয়ায়, রাজগৃহে; বরাবর পর্বতে আর সারনাথে, রোপণ করেন, বৌদ্ধ রাজর্ষি আর মৌর্য স্থপতি, পরিণত হয় পত্র পুষ্পে সেই অঙ্কুর খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে, রূপ পরিগ্রহ করে মহীরুহের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে।

গয়া থেকে উনিশ মাইল উত্তরে দাঁড়িয়ে আছে বরাবর শৈলমালা প্রকৃতির এক নিভৃততম ভয়ঙ্কর পরিবেশে, তার অর্ধ মাইল উত্তরে নাগার্জুনি। বুকে নিয়ে আছে বরাবর আর নাগার্জুনি ঘন বনানী আর সবুজ অরণ্য, বাসস্থান হিংস্র জন্তুর আর শ্বাপদের। নির্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি তাদের অঙ্গে সাতটি গুহা মন্দির, চারিটি—কর্ণকৌপর, সুদামা, লোমশ ঋষি আর বিশ্ব ঝোপড়ি বরাবরের অঙ্গে, তিনটি—গোপিকা, বহিজকা আর বদলিকা নাগার্জুনির বুকে। আদি বৌদ্ধ গুহা মন্দির ভারতের, নির্মিত হয় এই মন্দিরগুলি সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে, তাঁরই আদেশে, জৈন আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধুদের বসবাসের জন্য। লেখা আছে তাদের অঙ্গের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে। রচিত হয় প্রথম গুহা মন্দির জীবন্ত পর্বতের অঙ্গ কেটে, কাঠ ও খড় দিয়ে তৈরী মন্দিরের অনুকরণে।

প্রসিদ্ধ তাদের মধ্যে লোমশ ঋষি আর সুদামা, দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি বরাবর শৈলমালার অঙ্গে। সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ কিন্তু লোমশ ঋষি, অলঙ্কৃত তার প্রবেশ পথের সম্মুখ ভাগ সুন্দরতম অলঙ্করণে। নাই এই শিল্প সম্ভার

অন্য ছয়টি গুহা মন্দিরের সম্মুখ ভাগে। রচনা করেন স্থপতি পাহাড় কেটে, পাহাড়ের অঙ্গে ছুতোরের রচিত কাঠের তৈরী গৃহের প্রান্তবর্তী ত্রিকোণাগ্র প্রাচীরের অনুকরণে মন্দিরের সম্মুখ ভাগ। নিখুঁত এই অনুকরণ, নির্ভুলও, পরিচায়ক তাঁর অগাধ স্থাপত্য-জ্ঞানের। দুই প্রান্তে, রচিত হয় তের ফুট উঁচু দুইটি স্থূল স্তম্ভদণ্ড, ঈষৎ অবনত তাদের শীর্ষদেশ সামনের দিকে। তারা প্রধান আশ্রয় মন্দিরের ছাদের। যুক্তহয় তাদের শীর্ষদেশ দুইটি প্রধান বরগা দিয়ে, রচিত হয় অন্য বরগাগুলি তাদের সমান্তরালে। বরগার সঙ্গে যুক্ত হয় মন্দিরের অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ, রচিত হয় তিনটি স্তরে, তিনটি সুপ্রশস্ত কাষ্ঠ খণ্ড দিয়ে। বৃত্তাকার বন্ধনী দিয়ে আবদ্ধ হয় প্রস্তরের গাত্রে তাদের নিম্ন প্রান্তদেশ। নির্মিত হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি তোরণ, তার নীচে সাড়ে সাত ফুট উঁচু অর্ধচন্দ্রাকৃতি মন্দিরের প্রবেশ পথ। তোরণের শীর্ষদেশেও শোভা পায় দুইটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ ছিদ্র, গবাক্ষ মন্দিরের, প্রবেশ পথ আলো বাতাসেরও। খোদিত হয় নীচে বাতায়নের অঙ্গে সারি সারি হস্তী মূর্তি। অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত এই হস্তী মূর্তিগুলি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। তারা শুঁড় উঁচু করে স্তূপকে প্রণতি জানায়। রচিত হয় জাফরি উপরের বাতায়নে, কাঠের তৈরী জাফরি সুষ্ঠু অনুকরণে। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম কিন্তু সম্মুখ ভাগের শিল্পসম্ভার, প্রকৃষ্টতম তাদের অঙ্গের পালিশও; অত্যুজ্জ্বল, মসৃণ; অম্লান, দেখে মনে হয় কালকের তৈরী সেগুলি—শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য মহারাজ অশোকের স্থপতির।

অনুরূপ লোমশ ঋষি আর সুদামার অভ্যন্তর ভাগও। অনুরূপ গঠনে আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে। রচিত হয় একটি বত্রিশ ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ, সাড়ে উনিশ ফুট প্রস্থ আর বারো ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু কক্ষ বা খিলানযুক্ত সভাগৃহ, তার প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি বৃত্তাকার উনিশ ফুট ব্যাসের অর্ধ-গোলাকৃতি গর্ভগৃহ। গম্বুজের আকারে তার ছাদ নির্মিত হয়। ছাদের কেন্দ্রস্থলের উচ্চতা বারো ফুট তিন ইঞ্চি। যুক্ত হয় এই প্রকোষ্ঠটি সভাগৃহের সঙ্গে একটি প্রবেশপথ দিয়ে। অনবদ্য, সুন্দরতম, মন্দিরের ভিতরের প্রতিটি অংশের পালিশও, উজ্জ্বলতম, সমপর্যায়ে পড়ে কাঁচের উজ্জ্বলতার, বৈশিষ্ট্য মহারাজ অশোকের স্থাপত্যেরও।

নাগার্জুনি পর্বতের অঙ্গের গোপিকাই বৃহত্তম এই সপ্ত গুহামন্দিরের মধ্যে। এই মন্দিরটি পর্বতের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গের আকারে নির্মিত, বৃত্তাকার এর দুই প্রান্তদেশ। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি চুয়াল্লিশ ফুট দীর্ঘ আর উনিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, শীর্ষে নিয়ে আছে দশ ফুট উঁচু ছাদ। প্রবেশপথের শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় মহারাজ অশোকের পৌত্র দশরথের আদেশে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়, তাঁর মগধের সিংহাসনে আরোহণের বছরে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে।

এইখানেই পরিসমাপ্তি হয় মৌর্য গুহামন্দির নির্মাণ, মৌর্য স্থাপত্যেরও হয়। নির্মিত হয় নাই আর কোন গুহামন্দির মৌর্যযুগে, রচিত হয় নাই স্তূপ, চৈত্য আর বিহারও সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরে, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। নির্মাণ করেন নাই বৌদ্ধ স্থপতি শোভন, সুষ্ঠুগঠন নিখুঁত স্তম্ভও, শীর্ষে নিয়ে জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, ধর্মের প্রতীক। গড়ে ওঠে পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক মহিমময় প্রস্তর স্থাপত্য। প্রস্তর দিয়ে নির্মিত হয় স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, অঙ্গে নিয়ে অনুপম অলঙ্করণ, রচিত হয় এক একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে এক প্রস্তর স্তম্ভ, উজ্জ্বল, মসৃণ, অম্লান তার দণ্ড, ঘণ্টার আকারে রচিত শীর্ষদেশ। শিরে শোভা পায় এক বা একাধিক জীবন্ত, সুষ্ঠু গঠন হস্তী, দাঁড়িয়ে আছে শুঁড় নীচু করে, সিংহ দাঁড়িয়ে আছে কেশর ফুলিয়ে। নির্মিত হয় গুহামন্দিরও অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-জ্ঞানের পরিচয়। পরিসমাপ্তি হয় সেই স্থাপত্য খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে।

হীনযান যুগ

অতিক্রম করে অর্ধ-শতাব্দী। শেষ হয় বৌদ্ধ স্থপতির মহারাজ অশোকের নির্মিত স্তূপের অঙ্গের অলঙ্করণ, তাঁদের অনবদ্য স্তম্ভ তোরণ আর রেল নির্মাণ বুদ্ধগয়াতে, সাঁচীতে ভারহুতে, সারনাথে ও আরও অনেক বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে, বুকে নিয়ে বুদ্ধের জীবনের কাহিনী, কাহিনী কত সাংসারিক সুখদুঃখের আর উৎসবের, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার আর সুষ্ঠুগঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভার। নির্মাণ শুরু হয় জীবন্ত পশ্চিমঘাট শৈলমালার

অঙ্গ কেটে চৈত্য, স্তূপ আর বিহার। হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ স্থপতি নির্মাণ করেন, রচনা করেন কুঠার আর বাটালি দিয়ে এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য সুন্দরতম রূপদান। পল্লবিত হয়, শোভিত হয় পত্রপুষ্প, বরাবর পর্বতমালার অঙ্কুর। লাভ করে গুহামন্দির স্থাপত্য এক বিশিষ্ট স্থান ভারতের সৃজন শিল্পে। নির্মিত হয় একে একে ছোট বড় বারশ' গুহামন্দির, বুকে নিয়ে অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে জীবন্ত মূর্তিসম্ভার—এক পরমাশ্চর্য দান ভারতের স্থাপত্যে—বিশ্বের স্থাপত্যেও। রচনা করেন গ্রীক স্থপতি লিসিয়াতে, রোমান স্থপতি পেট্রাতে, পার্শিয়াতে রচনা করেন একিমেণ্ডিসরাও, নির্মাণ করেন গুহামন্দির। কিন্তু সামান্য তাঁদের দান, সীমাবদ্ধও, নাই তাতে ভারতীয় স্থপতির পরিকল্পনার মহিমত্ব, নাই তাঁর কল্পনার অসীমতা, নাই সে বিস্তৃতি। তারা সমৃদ্ধিশালী নয় স্থপতির মনের মাধুরী আর হৃদয়ের ঐশ্বর্য দিয়ে। নাই তাতে ভারতীয় স্থপতির সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম রূপদানও। মহা-মহিমময় ভারতীয় স্থপতির নির্মিত গুহামন্দির অপরূপ, সুন্দরতম। রচিত হয় শৈলমালার অন্তরতম প্রদেশে কত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, কত নন্দন কানন, কত রহস্যলোক, কত স্বপ্নপুরী, রচনা করেন স্থপতি যুগের পর যুগ, মিশিয়ে দিয়ে অন্তরের সবখানি মাধুরী, উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য—তাই তাঁরা লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎসভায়, হন বিশ্বজিৎ।

মহাপরাক্রমশালী হন শুঙ্গ পুষ্যমিত্র মগধে। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, তিনি ছিলেন শেষ মৌর্য সম্রাটের সেনাপতি। অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে খ্রীষ্টের জন্মের একশ' সাতাশি বছর পূর্বে, রাজত্ব করেন খ্রীষ্টপূর্ব ১৫১ পর্যন্ত, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর, হন সার্বভৌম সম্রাট ভারতের। বিস্তৃত তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তর-পশ্চিমে জালন্ধর আর দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত। স্থাপিত হয় রাজধানী পাটলিপুত্রে, দ্বিতীয় রাজধানী পূর্ব মালবে—বিদিশাতে। উল্লিখিত আছে তাঁর কীর্তির কাহিনী ভারহুতের শিলালিপিতে, বর্ণিত হয় অযোধ্যায় প্রাপ্ত উদ্ধৃত বাক্যেও।

মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্রও, অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে পিতার মৃত্যুর পর। পরাজিত হন তাঁর কাছে বিদর্ভ নৃপতি,

'বিদর্ভ মগধের অধিকারে আসে, অধীনস্থ হয় শুঙ্গদের। তিনিই মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক।

পরিণত হয় রাজধানী পাটলিপুত্র আর বিদিশা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে—কেন্দ্রস্থল হয় কৃষ্টিরও। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা শুঙ্গ রাজারাও, নির্মাণ করেন কত মন্দির। নির্মিত হয় বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহারও—বিদিশাতে, ভারহুতে, বুদ্ধগয়ায় আর সাঁচীতে।

রচিত হয় গুহামন্দিরও নাসিকে আর ভাজাতে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই সব স্তূপ, চৈত্য বিহার আর গুহামন্দিরগুলি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যেরও, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের, এক অমর কীর্তি।

অস্তমিত হয় শুঙ্গ ক্ষমতা, কাণ্বরা রাজত্ব করেন মগধে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩ থেকে ২৮ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত। কীর্তিহীন তাঁরা।

পরাজিত হন শেষ কাণ্বরাজ অন্ধ্র সিমুকের হাতে। অধিবাসী তাঁরা দ্রাবিড় স্থানের, তেলেগু ভাষাভাষী, জাতিতে হিন্দু-ব্রাহ্মণ। অন্যতম প্রাচীন জাতি ভারতের, বাস করেন তাঁরা এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী ভূভাগে। স্বাধীন তাঁরা মহারাজ অশোকের রাজত্বকালেও, মহা সমৃদ্ধিশালীও, অধিকর্তা ত্রিশটি প্রাচীরে বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী নগরের।

সিমুক স্থাপন করেন অন্ধ্র সাতবাহন রাজ্য। গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠানে তার রাজধানী। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র শাতকরণী সাতবাহন, বাড়ে রাজ্যের সীমানা, অনুষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র গৌতমীপুত্র শাতকরণী, শ্রেষ্ঠ রাজা অন্ধ্র সাতবাহন বংশের। হন তিনি সার্বভৌম সম্রাট দাক্ষিণাত্যের। তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন শক ক্ষত্রপেরা, যবনরা, আর পহ্লবরা। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা সারা দাক্ষিণাত্যে—দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করে পূর্ব মালবে আর দক্ষিণে, কানেরিজদের দেশে। নাসিক আর উজ্জয়িনী তাঁর অধিকারে আসে। স্থাপিত হয় দ্বিতীয় রাজধানী উত্তর কানাড়ায় বৈজয়ন্তীতে, তৃতীয় গুণ্টুর জেলায় অমরাবতীতে। শ্রীযজ্ঞ শাতকরণী শেষ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা এই বংশের।

রাজত্ব করেন সাতবাহনরা প্রবল বিক্রমে দীর্ঘ সাড়ে চারিশত বৎসর। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে অস্তমিত হয় তাঁদের ক্ষমতা। পূর্বদেশে প্রবল হন কলিঙ্গ নৃপতি খারবেল। মহারাষ্ট্র দেশে, অভীররা অধিকার করেন নাসিক, বাকাটকেরা বিদর্ভ (বেরার)। প্রবল হন কৃষ্ণা গোদাবরী জেলায় কাঞ্চীপুরমে পল্লবেরা, বৈজয়ন্তীর কদম্বরা উত্তর কানাড়াতে।

পরিণত হয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠান, অমরাবতী আর বৈজয়ন্তী। শ্রেষ্ঠ-স্রষ্টা তাঁরাও, গড়ে ওঠে অসংখ্য মন্দির ভারতের দিকে দিকে। হিন্দু-ব্রাহ্মণ তাঁরা, কিন্তু সীমাহীন তাঁদের দান বৌদ্ধ স্থাপত্যেও। নির্মিত হয় স্তূপ চৈত্য আর বিহার ঘণ্টাশালাতে, যজ্ঞপেটাতে, ভাট্টি প্রলুতে, গুণ্টু পল্লীতে আর অমরাবতীতে। রচিত হয় সাঁচীর অনবদ্য তোরণ, সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ তোরণ ভারতের, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম রেল, রেলের বুকে মূর্তি দিয়ে জাতকের গল্প, কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব জীবনের, কাহিনী কত সাংসারিক জীবনের—তাদের সুখ দুঃখের, আশা আকাঙ্ক্ষার কথাও।

রচিত হয় অনবদ্য গুহামন্দিরও পশ্চিম ঘাট শৈলমালার অঙ্গ কেটে, ভাজাতে, নাসিকে, কার্লিতে, বিদিশাতে, অজন্তাতে ও আরও অনেক স্থানে। বুকে নিয়ে আছে এই সমস্ত গুহামন্দিরও শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের প্রতীকও, নিদর্শন সৃষ্টির এক মহা গৌরবময় যুগের, তাই তারাও লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ।

প্রাচীনতম তাদের মধ্যে ভাজার বিহার-বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। রচিত হয় একটি স্তম্ভ যুক্ত অলিন্দ, যুক্ত হয় স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের সঙ্গে একটি প্রবেশ পথ দিয়ে। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দিয়ে বেষ্টিত হয় সভাগৃহ। প্রাচীনতম নির্মাণের সময়ে, প্রাচীনতম অঙ্গের মূর্তিসম্ভারেও, নির্মিত হয় এই বিহারটি খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। সুঙ্গ রাজারা নির্মাণ করেন। দাঁড়িয়ে আছে এই বিহারটি পুণার নিকটে, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার অঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম মূর্তিসম্ভার। অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রে মূর্তি দিয়ে রচিত হয় কত দৃশ্য, দৃশ্য কত পুরাণের, দৃশ্য রাজার, দৃশ্য প্রকৃতিরও। এক মহিমময় সুন্দরতম কীর্তি এক গৌরবময় যুগের। অনুরূপ এই মূর্তিগুলি সাঁচীর তোরণের অঙ্গের

মূর্তিসম্ভারের, সমপর্যায়ে পড়ে ভারহুতের রেলিংয়ের পদকের অঙ্গের মূর্তির। তাই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

সমসাময়িক ভাজার চৈত্য বা উপাসনামন্দির। সুঙ্গ রাজারাই নির্মাণ করেন এই চৈত্যটিও। নির্মিত হয় শৈলমালার অঙ্গ কেটে চৈত্যের সম্মুখ ভাগ, রচিত হয় খিলানযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবেশ পথ, তার উপরে অর্ধ-গোলাকৃতি চৈত্য গবাক্ষ, প্রবেশপথ আলোবাতাসের। অলঙ্কৃত করেন ভাস্কর চৈত্যের সম্মুখ ভাগ অপরূপ, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়ে। স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক করা হয় চৈত্যের ভিতরের সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলকে চারিদিকের গলিপথ থেকে। নির্মিত হয় স্তম্ভের শীর্ষদেশে খিলানযুক্ত অর্ধগোলাকৃতি ছাদ, ছাদের অঙ্গে শিরার আকারে বরগা। সভাগৃহের প্রান্তদেশে রচিত হয় স্তূপ। তাই বুকে নিয়ে আছে ভাজা প্রাচীনতম স্তূপ, চৈত্য আর বিহার হীনযান যুগের। নির্মিত হয় একে একে আরও ষোলটি বিহার ভাজাতে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, সুঙ্গরাজাদের রাজত্বকালে। নির্মিত হয় পরবর্তী কালের বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, ভাজার স্তূপ, চৈত্য আর বিহারের অনুকরণে। ভাজাই পথনির্দেশক পরবর্তী হীনযান বৌদ্ধ স্থপতির, তাই এই বৈশিষ্ট্য ভাজার গুহামন্দিরের।

ভাজার পরেই, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গে, কন্‌ডেনের চৈত্য নির্মিত হয়, সুঙ্গ নৃপতিরা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। বিস্তৃততর এই চৈত্যের সম্মুখ ভাগের পরিকল্পনা, সুন্দরতর, উন্নততরও। রচিত হয় অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি খিলানযুক্ত প্রবেশপথের দুই পাশে আচ্ছাদিত তোরণ। তার অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শোভা পায় সুন্দরতম আর অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রাতপ, সুন্দরতম তার পরিকল্পনা, অনবদ্য রূপদান। অলঙ্কৃত হয় তোরণের অঙ্গ অনবদ্য, অনুপম রেলিং দিয়েও। কাঠের পরিবর্তে রচিত হয় পাহাড়ের অঙ্গ কেটে সম্মুখ ভাগের তোরণের দু'পাশের কড়ি। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে চৈত্যের ভিতরের অংশ। বৃহত্তর এই চৈত্যের পরিধি—দৈর্ঘ্যে ছেষট্টি ফুট, প্রস্থে সাড়ে ছাব্বিশ আর উচ্চতায় আটাশ ফুট। অগ্রসর হয় বৌদ্ধ গুহামন্দির স্থাপত্য হয় উন্নততর।

নির্মিত হয় কন্‌ডেনের পর পিটালখোরার চৈত্য, হয় অজন্তার দশম গুহা-

মন্দিরও। সমসাময়িক কন্‌ডেনের, নির্মিত হয় এই দুইটি গুহামন্দিরও, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, সুঙ্গরাজাদের আমলের স্থপতি পিটালখোরার চৈত্যের সভাগৃহের দুই পাশের গলিপথের ছাদের নীচের বরগা, পাহাড়ের অঙ্গ কেটে নির্মাণ করেন। বিবর্জিত হয় কাঠ, ব্যবহৃত হয় প্রস্তর তার পরিবর্তে, বাড়ে ছাদের স্থায়িত্ব, হয় অক্ষয়। ছিল এই চৈত্যটিও পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে চৌত্রিশ ফুট প্রস্থ আর একত্রিশ ফুট উচ্চ। বৃহত্তম এই গোষ্ঠীর অজন্তার দশম ও প্রাচীনতম গুহামন্দির, দৈর্ঘ্যে একশ', প্রস্থে চল্লিশ ও উচ্চতায় তেত্রিশ ফুট। বাড়ে বৌদ্ধ স্থপতির সাহস, বাড়ে অভিজ্ঞতা আর নির্মাণকুশলতা, বর্ধিত হয় চৈত্যের আকার, বর্ধিত হয় কাঠের কাজও। রচিত হয় পাহাড়ের অঙ্গ কেটে গলিপথের ছাদের অঙ্গের শিরাকৃতি বরগা, বিস্তৃত হয় বরগা দুই পাশের স্তম্ভের শীর্ষদেশ পর্যন্ত। দুই থাকে রচিত হয় স্তূপের অঙ্গও, হয় উচ্চতরও।

বিভিন্ন সম্মুখভাগের নির্মাণপদ্ধতি নাসিকের পাণ্ডুলেনার আর অজন্তার নবম গুহামন্দিরের, তারাও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত। বিভিন্ন পুণা জেলার জুনারের মানমোদা গোষ্ঠীর সম্মুখ ভাগও। এই গুহামন্দিরটি অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। নাই তাদের সম্মুখভাগে কোন কাঠের কাজ, নির্মিত তারা পাহাড়ের অঙ্গ কেটে। অপরূপ সুন্দরতম, সুষ্ঠু গঠন তাদের মধ্যে অজন্তার চৈত্য। তার কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় প্রবেশ পথ—তার দুই পাশে দুই গবাক্ষ, দাঁড়িয়ে আছে গবাক্ষ কানিসের উপর, বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে আছে কানিস নীচু অলিন্দের সঙ্গে। শোভা পায় তার উপর পুরোহিতের বসবার জন্য মঞ্চ। সবার উপরে রচিত হয় চৈত্য-গবাক্ষ, অর্ধ-গোলাকৃতি তোরণের ভিতরে। অনবদ্য এই গবাক্ষের গঠন-গরিমা, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-বিদ্যার। জাফ্‌রির কাজ দিয়ে অলঙ্কৃত হয় প্রবেশপথের দুই পাশের প্রাচীরের অঙ্গ। আয়তক্ষেত্র এই চৈত্যের অভ্যন্তরের সভাগৃহ, অর্ধ-গোলাকৃতি নয় ছাদের আকারও। দাঁড়িয়ে আছে সমতল ছাদ দীর্ঘ স্তম্ভের উপর। অপসারিত হয় স্তম্ভের শীর্ষদেশের ছাদের অঙ্গের কাঠের তৈরী বরগা, অলঙ্কৃত করা হয় সেই শূন্য স্থান অনবদ্য চিত্রসম্ভার দিয়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

সমপর্যায়ে পড়ে অজন্তার নবম গুহামন্দিরের, নাসিকের পাণ্ডুলেনা আর

জুনারের মানমদা চৈত্য, সম্মুখভাগের পরিকল্পনায় আর নির্মাণ কুশলতায়। কিন্তু পাণ্ডুলেনাতেই প্রথম শুরু হয় স্তম্ভের অঙ্গের অলঙ্করণ। রচিত হয় মঞ্চ স্তম্ভের শীর্ষদেশে। হাঁড়ির আকারে প্রথম রচিত হয় তার পাদদেশও এই পাণ্ডুলেনাতেই। মসৃণতর হয় স্তম্ভের অঙ্গ। সুন্দরতর আর উচ্চতর হয় প্রান্তদেশের স্তূপও। উন্নততর হয় বৌদ্ধ স্থাপত্য, লাভ করে অগ্রগতি।

বিদিশাতে আর কার্লিতেই হীনযান বৌদ্ধ চৈত্য পায় পূর্ণ পরিণতি, লাভ করে চরম উৎকর্ষ, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। জ্যেষ্ঠ তাদের মধ্যে বিদিশার চৈত্য, নির্মিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে, সুঙ্গ রাজারা নির্মাণ করেন। অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা নির্মাণ করেন কার্লির চৈত্য খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। তুলনাহীন, কল্পনাতীত তাদের সম্মুখ ভাগের পরিকল্পনা, অনুপম তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ, সুন্দরতম আর উন্নততমও, পরাজয় স্বীকার করে তাদের কাছে সমস্ত অগ্রবর্তী চৈত্যের সম্মুখ ভাগের নির্মাণকুশলতা, হীনপ্রভ হয় তাদের পরিকল্পনা আর অঙ্গের শিল্পসম্ভার।

অনবদ্য বিদিশার সম্মুখ ভাগের অলিন্দের প্রবেশ পথের দুই পাশের স্তম্ভ দুইটি, দাঁড়িয়ে আছে দুইটি অপরূপ উদ্গত স্তম্ভের কেন্দ্রস্থলে। রচিত তারা পাহাড়ের অঙ্গ কেটে, প্রধান আশ্রয় ছাদের কড়িরও। সূচিত হয় এক মহান অগ্রগতি চৈত্যের সম্মুখভাগের নির্মাণে।

অনুপম চৈত্যের ভিতরের স্তম্ভগুলিও, সুন্দরতম তাদের পাদদেশের পাত্রের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, অভিনব অষ্টকোণ স্তম্ভ দণ্ড, মহিমময় স্তম্ভের শীর্ষদেশের মূর্তি সম্ভার। দাঁড়িয়ে আছে কারও শীর্ষদেশে মঞ্চের উপর জোড়া হস্তী, কারও শীর্ষদেশে শোভা পায় জোড়া সিংহ, কেউ শীর্ষে নিয়ে আছে জোড়া বৃষ, প্রতীক তারা। তাদের পৃষ্ঠে বসে আছে একটি নর ও একটি নারী, বিলম্বিত তাদের পদদ্বয়। শোভন, সুন্দর তাদের গঠন সৌষ্ঠব, জীবন্ত, হস্তী, সিংহ আর বৃষগুলিও। সূচিত হয় এক অসামান্য সীমাহীন অগ্রগতি স্তম্ভের পরিকল্পনায় আর নির্মাণ কুশলতায়ও। অতিক্রম করে দুশ' বছর, মহারাজ অশোকের নির্মিত স্তম্ভ পায় পূর্ণ পরিণতি, লাভ করে চরম উৎকর্ষ গঠন সৌষ্ঠবে আর শীর্ষদেশের মূর্তিসম্ভারে। চরম উৎকর্ষ লাভ করে অর্ধ-গোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদের নির্মাণ কুশলতাও, পরিচয় দেয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানের।

সুন্দরতম, হৃদয়স্পর্শী কিন্তু কার্লির চৈত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ চৈত্য বৌদ্ধ স্থপতির ভারতে, মহামহিমময় পরিকল্পনায়, অনবদ্য রূপদানে। দাঁড়িয়ে আছে পৃথক হয়ে দুইটি পঞ্চাশ ফুট উঁচু, সিংহ স্তম্ভ। ষোল কোণ তাদের দণ্ড, বাঁশীর আকারে রচিত শীর্ষদেশ। শীর্ষদেশে, মঞ্চের আকার হারমিকার উপর শোভা পায় জোড়া সিংহ। সিংহের শিরের উপর চক্র। অভিনব এই স্তম্ভ দুইটি বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্তম্ভের, নাই এই সিংহ স্তম্ভ, অন্যতম বৈশিষ্ট্য কার্লির গুহামন্দিরের, অন্য কোন গুহামন্দিরের সামনে।

অনবদ্য এই চৈত্যের সম্মুখভাগের নির্মাণকৌশল, নিখুঁত তার অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রের মূর্তিসম্ভার, মহিমময়, সুন্দরতম তার অঙ্গের শিল্পসম্ভারও, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক মহাগৌরবময় যুগের। বুকে নিয়ে আছে অলিন্দ তিনটি দ্বার, প্রবেশপথ চৈত্যের ভিতরের, তার অন্তরতম প্রদেশের—আয়তন তার একশ চব্বিশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে ছেচল্লিশ ফুট প্রস্থ আর পঁয়তাল্লিশ ফুট উচ্চ—বৃহত্তম বৌদ্ধ চৈত্য ভারতের।

অভিনব এই চৈত্যের ভিতরের সভাগৃহ—তার অন্তরতম প্রদেশ—শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কার্লির চৈত্যের, সম্মিলিত বিকাশ কেন্দ্রস্থলের অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানযুক্ত প্রবেশপথের উপরে নির্মিত অশ্বক্ষুরাকৃতি সুমহান চৈত্য গবাক্ষের, ভিতরের অনুপম স্তম্ভ শ্রেণীর আর চৈত্যের খিলানযুক্ত অর্ধ-গোলাকৃতি ছাদের—তাদের অনবদ্য, নিখুঁত অপরূপ সমন্বয়ের। দাঁড়িয়ে আছে ঘন সন্নিবিষ্ট সাঁই-ত্রিশটি স্তম্ভের শ্রেণী—নাই এত স্তম্ভ অন্য কোন চৈত্যের অভ্যন্তরে, নয় তারা এমন ঘন সন্নিবিষ্টও। শোভন, সুষ্ঠু গঠন তাদের মধ্যে ত্রিশটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে এক এক পাশে পনরটি করে, পৃথক করে আছে চারদিকের গলিপথকে মন্দিরের সুপ্রশস্ত কেন্দ্রস্থল থেকে। পাত্রের আকারে নির্মিত তাদের পাদদেশ, অষ্টকোণ স্তম্ভ দণ্ড, শীর্ষদেশে, বিস্তৃত মঞ্চের উপর জানু পেতে বসে আছে জোড়া হস্তী, বিপরীত দিকে জোড়া অশ্ব, আরোহণ করে আছে তাদের পৃষ্ঠে একটি নর ও নারী। অনবদ্য, সুন্দরতম গঠন এই হস্তী আর অশ্বগুলির, নিখুঁত নর ও নারীরাও, জীবন্ত, সজ্জিত বহুমূল্য শিরোভূষণে আর মূল্যবান অলঙ্কারে। প্রতীক তাঁরা রাজন্যবর্গের—আসেন তাঁরা দেশ-বিদেশ থেকে, পূজা করেন মহা পবিত্র এই স্তূপকে, পূজিত হন বুদ্ধের স্মৃতি—পূজিত হন বুদ্ধ।

রচিত হয় এই মূর্তির সারির উপর, সুউচ্চ খিলানযুক্ত অর্ধ-গোলাকৃতি চৈত্যের ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন সন্নিবিষ্ট শিরার আকার কাঠের বরগা।

সভাগৃহের প্রান্তদেশে, মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে, বৃত্তাংশে দাঁড়িয়ে আছে স্তূপ, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা আর ছত্র মহামহিমময় মূর্তিতে।

সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই চৈত্যের কিন্তু তার সম্মুখ ভাগের চৈত্য গবাক্ষটি—তার আকৃতি আর পরিস্থিতি, অবস্থান আর সমন্বয়, সুবিশাল মহিমময় চৈত্য গবাক্ষের, ভিতরের অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভের শ্রেণীর, সুউচ্চ অর্ধ-গোলাকৃতি ছাদের আর নাভিতে অবস্থিত মহামহিমময় বিরাট স্তূপের। এই গবাক্ষ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয় চৈত্যের ভিতরে সূর্য-কিরণের প্রবেশ, নিরুদ্ধ হয় তার প্রখর রশ্মির গতি, প্রশমিত হয় তেজ, পরিবর্তিত হয় দীপ্তিতে, ছড়িয়ে পড়ে সেই দীপ্তি মন্দিরের সর্বত্র, পড়ে স্তম্ভের আর স্তূপের বুকেও। ছায়াচ্ছন্ন হয় স্তম্ভের পাদদেশ আর গলিপথ, সৃষ্টি হয় এক অলোকসুন্দর পরিবেশ এক রহস্যলোক, এক স্বপ্নপুরী চৈত্যের অন্তরতম প্রদেশে, মহাপবিত্র হয় চৈত্য, পরিণত হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থে। লাভ করেও কার্লির চৈত্য শ্রেষ্ঠ আসন জগৎসভায়, হয় বিশ্বজিৎ। নির্মিত হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তাতেও তিনটি প্রাচীনতম সঙ্ঘারামও, সমসাময়িক তারা অজন্তার প্রাচীনতম চৈত্য নবম আর দশম গুহামন্দিরের। সবগুলিই একতলা, নাই তাদের অঙ্গেও কোন শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় তারা ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে।

নির্মিত হয় কন্ডেনেও একটি একতলা বিহার, সমসাময়িক কন্ডেনের চৈত্যের। অনবদ্য এই বিহারের সম্মুখভাগ, বুকে নিয়ে আছে একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। আছে এই অলিন্দের কেন্দ্রস্থলে একটি প্রবেশ পথ, তার দুই পাশে দুইটি গবাক্ষ। ভিতরে রচিত হয় একটি তেইশ ফুট প্রস্থ, উনত্রিশ ফুট দীর্ঘ কক্ষ বা সভাগৃহ, বেষ্টিত কক্ষটি স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে।

পিটাল-খোরাতেও একটি একতলা বিহার নির্মিত হয়, সমসাময়িক তার চৈত্যের। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটি প্রকোষ্ঠ, খিলানযুক্ত তাদের ছাদ, শোভা পায় ছাদের অঙ্গে শিরা, রচিত হয় জালির গবাক্ষও। প্রকোষ্ঠের বাইরেও, প্রবেশ পথের দুই পাশে, তোরণের ভিতর নির্মিত হয় উদ্গত স্তম্ভ, অলঙ্কৃত তাদের শীর্ষদেশ কত বিভিন্ন, সুষ্ঠু-গঠন জন্তুর মূর্তি দিয়ে। ব্যতিক্রম

অন্য হীনযান বিহারের প্রকোষ্ঠের সঙ্গে, নাই সেই সব প্রকোষ্ঠে মূর্তির সম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় তারা কারুকার্য সমন্বিত খিলানযুক্ত ছাদ দিয়েও।

নাসিকেও অনেকগুলি বিহার নির্মিত হয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি সমসাময়িক তার চৈত্যের, কয়েকটি নির্মিত হয় প্রথম শতাব্দীতে (খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে গৌতমীপুত্র (তৃতীয় গুহামন্দির) নাহাপনা (অষ্টম) আর শ্রীজ্ঞান (পঞ্চদশ গুহামন্দির) অন্ধ্র সাতবাহন রাজারাই এই গুহামন্দিরগুলি নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে তিনটি শ্রেষ্ঠ বিহারই একটি করে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, একটি কেন্দ্রস্থলের প্রশস্ত সভাগৃহ, স্তম্ভ বিহীন। বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের শ্রেণী দিয়ে, যুক্ত হয়ে আছে প্রবেশপথ দিয়ে সভাগৃহের সঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ একটি করে প্রস্তর-শয্যা।

অনুরূপ অলিন্দগুলি নির্মাণ পদ্ধতিতে, কিন্তু বিভিন্ন তাদের অঙ্গের স্তম্ভগুলি, গঠনে আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে, বিভিন্ন শীর্ষদেশের মূর্তিসম্ভারেও।

রচিত হয় নাহাপনার সম্মুখভাগের দুই দিকে চারিটি করে স্তম্ভ, সঙ্গে নিয়ে দুই প্রান্তে দুইটি অর্ধ স্তম্ভ, জুনারের গণেশ লেনা চৈত্যের অনুকরণে। নির্মিত হয় জুনারের স্তম্ভ বিদিশার অলিন্দের স্তম্ভের অনুকরণে, অঙ্গে নিয়ে স্তম্ভমূল। অলঙ্কৃত স্তম্ভমূল প্রস্ফুটিত পদ্ম দিয়ে। স্তম্ভের শীর্ষদেশে, মঞ্চের উপর জন্তুর মূর্তি। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারগুলিও অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, শোভিত হয়ে আছে জীবন্ত সুষ্ঠু গঠন মূর্তিসম্ভার দিয়েও, নিদর্শন এক মহামহিমময়, সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক মহাগৌরবময় যুগের। লাভ করে হীনযান বিহারও পূর্ণ পরিণতি, সম্পূর্ণরূপ, হয় অপরূপ।

দাঁড়িয়ে আছে কানেরির শৈলমালা, প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, এক মনোরম লীলা নিকেতনে, নিভৃতে, নির্জনে। বুকে নিয়ে আছে শৈলমালা সবুজ ঘন বনানী, তার বক্ষ ভেদ করে প্রবাহিত হয় কত কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, সর্পিল গতিতে, নৃত্যের ছন্দে, অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। তাই বেছে নেন বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধিকর্তা আর বৌদ্ধ শ্রমণরা এই স্থান ধ্যান ধারণার জন্য। মহাতীর্থে পরিণত হয় কানেরিও।

এইখানেই নির্মিত হয় শেষ হীনযান বৌদ্ধচৈত্য, শতাধিক বিহারও নির্মিত

হয়—হয় শেষ হীনযান বিহারও। বৌদ্ধস্থপতি নির্মাণ করেন অন্ধ্র সাতবাহনদের রাজত্বকালে, ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে। তাই এই বৈশিষ্ট্য কানেরির।

নিকৃষ্ট অনুকরণ কার্লির চৈত্যের, ক্ষুদ্রতরও, কানেরির চৈত্য থেকে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়—লাভ করে না সম্পূর্ণরূপ। অস্তমিত হয় অন্ধ্র সাতবাহন রাজাদের ক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে, হীনবল হয় হীনযান বৌদ্ধধর্মও, পরিত্যক্ত হয় কানেরি, পরিণত হয় মহারণ্যে—বাসস্থান হিংস্রজন্তুর আর শ্বাপদের। পরিত্যক্ত থাকে দীর্ঘ তিন শত বৎসর। আসে পঞ্চম শতাব্দী, প্রবল হন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতে, হন গুপ্ত রাজারাও আর্যাবর্তে, মালবে আর দাক্ষিণাত্যে, কানেরি ফিরে পায় তার লুপ্ত গৌরব। অলঙ্কৃত হয় তার চৈত্যের সম্মুখ ভাগ অনবদ্য মূর্তিসম্ভার দিয়ে, রচিত হয় অলিন্দের দুই প্রান্তে দুইটি পঁচিশ ফুট উঁচু মহা-মহিমময় বুদ্ধমূর্তিও। আবার মুখর হয় কানেরি, লক্ষ শত পীত বসনে ভূষিত বৌদ্ধ শ্রমণের চরণধ্বনিতে, প্রকম্পিত হয় তার আকাশ বাতাস সকাল সন্ধ্যায় তাদের কলরোল আর বৌদ্ধ পুরোহিতের উদাত্তকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে।

মহাযান যুগ

বিস্তৃত এই যুগ ৪৫০ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পতন হয় অন্ধ্র সাতবাহনদের দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে। অস্তমিত হয় শক পশ্চিম ক্ষত্রপদের ক্ষমতাও, রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল পরাক্রমে সৌরাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে, মালবে উজ্জয়িনীতে, আর উত্তর কঙ্কণে অন্ধ্রদের পতনের পরে। ইউচি তাঁরা, বাস করতেন মধ্য এসিয়ার শির-দরিয়া নদীর উত্তর পারে।

অবসান হয় কুষাণদের ক্ষমতাও ভারতে। চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তের কান-সুর অধিবাসী তাঁরাও, জাতিতে ইউচি, রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে, মগধের সুঙ্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর আর্যাবর্তের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে। বিস্তৃত তাঁদের রাজত্ব পশ্চিমে গান্ধার থেকে, পূর্বে-অযোধ্যা ও বারাণসী পর্যন্ত। কাশ্মীর তাঁদের অধিকারে আসে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ-স্রষ্টা তাঁরা ভারতের, গড়ে ওঠে গান্ধার স্থাপত্য ভারতের দিকে দিকে। নির্মিত হয় অনবদ্য চৈত্য আর বিহার রাজধানী পুরুষপুরে (পেশোয়ারে)। নির্মিত

হয় প্রস্তর দিয়ে কত অসংখ্য মহিমময়, সুন্দরতম বুদ্ধ মূর্তি, মূর্তি বোধি-সত্ত্বদেরও, সারা পশ্চিম ভারতে, মথুরাতে ও আরও অনেক স্থানে। নির্মিত হয় কত সঙ্ঘারামও বৌদ্ধ শ্রমণদের বাসের জন্য। নির্মাণ করেন কণিষ্ক, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অধিরোহণ করেন তিনি পুরুষপুরের সিংহাসনে খুব সম্ভব ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রবল পরাক্রান্ত হন মগধে গুপ্তরাজারা, স্থাপিত হয় এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য আর্যাবর্তে। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত স্থাপন করেন এই রাজ্য, বিবাহ করেন তিনি লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীকে, বাড়ে রাজ্যের সীমানা। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত, এক দিগ্বিজয়ী বীর, অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন ৩৩০ থেকে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর কাছে পরাজিত হন একে একে রুদ্রদেব, মাতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দী ও বলবর্মণ। সারা আর্যাবর্ত তাঁর অধিকারে আসে, হন তিনি সার্বভৌম, সম্রাট সারা আর্যাবর্তের। সমাপ্ত হয় তাঁর উত্তর পথ বিজয় অভিযান, তাঁর বিজয়বাহিনী প্রবেশ করে দাক্ষিণাত্যে। বিজিত হন একে একে কোশলরাজ মহেন্দ্র, কাঞ্চীরাজ বিষ্ণুগোপ, এরণ্ডপল্লীর অধিপতি দমন, বেঙ্গীরাজ হস্তীবর্মণ, কট্টরাজ স্বামীদত্ত, হন মহাকাণ্ডারের অধিপতি ব্যাঘ্র রাজও।

মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যও, রাজত্ব করেন তিনি ৩৮০ থেকে ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি পরাজিত করেন পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপদের। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত, পশ্চিম উপকূলের সমস্ত পোতাশ্রয় ও বাণিজ্যকেন্দ্র তাঁর অধিকারে আসে। পণ্য বয়ে নিয়ে যায় গুপ্তরাজাদের বাণিজ্যপোত সুদূর বিদেশে, আসে বিদেশ থেকেও পণ্যে ভরতি বাণিজ্যপোত, মিলন হয় পূরবে আর পশ্চিমে, বিনিময় হয় পণ্যে পণ্যে, পণ্যে স্বর্ণে, হয় সভ্যতায় সংস্কৃতি আর কৃষ্টিতেও। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় গুপ্তসাম্রাজ্য অর্থে, কৃষ্টিতে আর সভ্যতায়। বিকশিত হয় ভারতের মনীষা নিত্য নতুন ক্ষেত্রে, রচিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণযুগ ভারতে।

রাজত্ব করেন একে একে কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। স্কন্দগুপ্তই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের, রাজত্ব করেন ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর অস্তমিত হতে থাকে গুপ্ত ক্ষমতা, গুপ্ত প্রাধান্য, শেষে অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে।

সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা ভারতের, নির্মিত হয় কত হিন্দু মন্দির, কত বৌদ্ধ চৈত্য আর বিহার ভারতের দিকে দিকে।

মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের রাজত্ব কালেই মহাযান বৌদ্ধ মতবাদ প্রথম প্রাধান্য লাভ করে। ছিল না কোন মূর্তিপূজার অনুশাসন গৌতমবুদ্ধের বাণীতে, ছিল না রাজর্ষি অশোকের প্রচারিত পৃথিবীর বৌদ্ধধর্মেও। বুদ্ধ ছিলেন শুধু শিক্ষাগুরু, এক মহামানব, দেবতা নন। তাই পূজিত হতেন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম মন্দিরে, স্তূপে, বুকে নিয়ে তাঁর স্মৃতি, প্রতীক তথাগতের। তাঁরাই হীনযান বৌদ্ধ, স্বীকার করেন না বুদ্ধের দেবত্বে, নন তাঁরা মূর্তির পূজারীও।

ক্রমে বিস্তৃত হয় ভক্তিবাদ বৌদ্ধদের মধ্যেও, প্রচলিত হয় পূজা ও অর্চনা হিন্দুদের অনুকরণে, দেবত্বে আরোপিত হন বুদ্ধ—পরিণত হন দেবতায়। শুরু হয় মূর্তির পূজা বৌদ্ধ মন্দিরে। রচিত হয় কত মহামহিমময় বুদ্ধমূর্তি, সঙ্গে নিয়ে মূর্তি দুই বোধিসত্ত্বের, চৈত্যে আর বিহারে, মন্দিরে পূজিত হন বুদ্ধ। তারাই মহাযান বৌদ্ধ, বিশ্বাস করেন তাঁরা বুদ্ধের দেবত্বে, মূর্তির পূজারী তাঁরা।

সঙ্কলিত হয় মহাযান ধর্মমতের মূল নীতি একটি গ্রন্থে, সঙ্কলন করেন প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, অলঙ্কৃত করেন তিনি মহারাজ কণিষ্কের রাজসভা। অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা—বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি—একাধারে কবি, দার্শনিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও ধর্মাচার্য, বুদ্ধচরিত ও সূত্রালঙ্কার প্রণেতা অশ্বঘোষ, আর মহাবিভাষা প্রণেতা বৌদ্ধ দার্শনিক বসুমিত্রও, করেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা মহাজ্ঞানী চরকও।

মহাপ্রবল হন মহাযান সম্প্রদায় গুপ্তযুগে পঞ্চম শতাব্দীতে। আবার শুরু হয় গুহামন্দির নির্মাণ, নির্মিত হয় চৈত্য আর বিহার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গে, অজন্তায়, এলোরাতে, ঔরঙ্গাবাদে ও আরও অনেক স্থানে। পুনরুজ্জীবিত হয় বৌদ্ধ গুহামন্দির স্থাপত্য দীর্ঘ চারিশত বৎসর পরে। কোন পরিবর্তন হয় না চৈত্যের পরিকল্পনায়ও, রচিত হয় মহাযান চৈত্যও হীনযান পদ্ধতিতে, অঙ্গে নিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চৈত্য গবাক্ষ, কেন্দ্রস্থল, গলিপথ আর খিলানযুক্ত

অর্ধগোলাকৃতি ছাদ। শুধু দাগোবা বা স্তূপের অঙ্গে রচিত হয় মহামহিমময় মূর্তি, মূর্তি বুদ্ধের, অজন্তাতে দাঁড়িয়ে, এলোরাতে বসে।

সম্পূর্ণ বদলে যায় কিন্তু সঙ্ঘরাম বা বিহারের রূপ। রচিত হয় সুবিশাল বিহার, কোথাও একতল, কোথাও দ্বিতল, কোথাও বা ত্রিতল। অলঙ্কৃত করা হয় তার সর্বাঙ্গ সুন্দরতম, মহামহিমময় মূর্তি দিয়ে—মূর্তি বুদ্ধের মূর্তি বোধিসত্ত্বের, পূজিত হন বুদ্ধ মূর্তি সঙ্ঘারামে, পূজিত হন দেবতা বুদ্ধ; বিভিন্ন তাঁদের আকৃতি, বিভিন্ন তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, এক নয় হস্তের মুদ্রাও। পরিবর্জিত হয় হীনযান সম্প্রদায়ের স্মৃতির পূজা, শুরু হয় মূর্তির পূজা—মূর্তি বুদ্ধের, মূর্তি বোধিসত্ত্বেরও, বুদ্ধের পূর্বজন্মের স্বরূপের। পরিণত হয় বিহার সঙ্ঘারামে—হয় ধর্মমন্দিরেও। রচিত হয় বিহারের প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে মূর্তি দিয়ে জাতকের কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব জীবনের, কাহিনী তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাবলীরও। রচিত হয় হিন্দু দেব দেবীর মূর্তিও। অনুপ্রাণিত হন বৌদ্ধ স্থপতি হিন্দু মতবাদে, প্রতিফলিত হয় সেই মতবাদ তাঁর স্থাপত্যে, বিকশিত হয় মহা অভিজ্ঞ বৌদ্ধ স্থপতির মহিমময় পরিকল্পনায় আর অনবদ্য রূপদানে।

প্রসিদ্ধ তাদের মধ্যে অজন্তার চৈত্য আর বিহার। মহাতীর্থ অজন্তা, দাঁড়িয়ে আছে তার ধ্যান গম্ভীর শৈলমালা, বুকে নিয়ে সুউচ্চ ঋজু চূড়া, বিস্তৃত হয়ে আছে কাস্তের আকারে এক মাইল পরিধি নিয়ে, শীর্ষে নিয়ে আছে ঘন সবুজ বনানী। পদতলে তার গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। নেমে আসে শৈল-মালার অঙ্গ বেয়ে প্রপাত, আসে নৃত্যের ছন্দে, রূপ ধারণ করে এক কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর, প্রবাহিত হয় সেই সঙ্কীর্ণ গিরি সঙ্কট দিয়ে সর্পিল গতিতে। শোনা যায় তার অন্তরের ধ্বনি, কানে ভেসে আসে তার মৃদু গুঞ্জন। অজন্তাই প্রকৃষ্ট স্থান ধ্যান ধারণার, উপযুক্ত পূজা অর্চনারও, তাই বুকে নিয়ে আছে অজন্তার শৈলমালা আটাশটি গুহামন্দির। একটি দীর্ঘ মন্দিরের মঞ্চ দিয়ে অলঙ্কৃত হয়ে আছে অজন্তার ঋজু বুক, বিস্তৃত হয়ে আছে মঞ্চ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে।

তাদের মধ্যে চারিটি চৈত্য, বৌদ্ধ ধর্ম মন্দির, চব্বিশটি বিহার বা সঙ্ঘারাম। নির্মিত হয় তাদের মধ্যে পাঁচটি অষ্টম, নবম, দশম, দ্বাদশ ও

ত্রয়োদশ গুহা মন্দির খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে। নবম আর দশম চৈত্য, অবশিষ্ট বিহার। হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই গুহামন্দিরগুলি নির্মাণ করেন। নির্মাণ করেন অবশিষ্ট চব্বিশটি মহাযান সম্প্রদায় ৪৫০ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। বিভক্ত এই মন্দিরগুলি পাঁচটি গোষ্ঠীতে তাদের নির্মাণের বিন্যাস ও তারিখ অনুযায়ী।

আসে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ, বাস করেন এসে অজন্তাতে বৌদ্ধ শ্রমণ, মুখর হয়ে ওঠে অজন্তা তাঁদের চরণ ধ্বনিতে। তাঁরা পূজা সমাপন করেন হীনযানদের নির্মিত চৈত্যে নবম ও দশম গুহামন্দিরে। কিন্তু স্থান সঙ্কুলান হয় না তাঁদের নির্মিত বিহারে। প্রয়োজন হয় আরও স্থানের তাঁদের বাসের জন্য, নির্মিত হয় একে একে একাদশ, সপ্তম ও ষষ্ঠ গুহা মন্দির, সবগুলিই বিহার—বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। রচিত হয় অজন্তায় প্রথম মহাযান গোষ্ঠী ৪৫০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে।

অতিবাহিত হয় অর্ধ শতাব্দী, ছড়িয়ে পড়ে অজন্তার খ্যাতি দিকে দিকে, আসেন বৌদ্ধ শ্রমণ, উপনীত হন বৌদ্ধ পুরোহিতও বহু দূর থেকে, বাস করেন এসে অজন্তায়। প্রয়োজন হয় আরও বাসস্থানের, একটি উপযুক্ত ধর্ম মন্দিরেরও। নির্মিত হয় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ আর বিংশতি গুহামন্দির—দ্বিতীয় গোষ্ঠী অজন্তার। সবগুলিই বিহার তাঁদের থাকবার জন্য। নির্মিত হয় উনবিংশতি গুহামন্দিরও, একটি চৈত্য। পূজা করেন সেই চৈত্যে বৌদ্ধ শ্রমণ আর বৌদ্ধ পুরোহিত। সুন্দরতম গুহামন্দির এই গুলি অজন্তার, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহাযান বৌদ্ধ স্থপতির, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক মহা গৌরবময় যুগের।

অতিক্রম করে আরও কিছুদিন, প্রয়োজন হয় অজন্তায় আরও গুহামন্দিরের, নির্মিত হয় তৃতীয় গোষ্ঠী ৫৫০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। রচিত হয় পশ্চিম প্রান্তে, একটি স্রোতস্বিনীর অপর পারে, একবিংশতি, দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি, চতুর্বিংশতি আর পঞ্চবিংশতি গুহামন্দির, সবগুলিই বিহার—বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। নির্মিত হয় বিহারের সংলগ্ন ষষ্ঠবিংশতি গুহা-মন্দিরও, একটি চৈত্য, উপাসনা করেন সেখানে বৌদ্ধ শ্রমণ।

বাড়ে অজন্তার খ্যাতি, ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে, আসে শ্রমণ দলে দলে,

বাস করে এসে অজন্তায়, নির্মিত হয় চতুর্থ গোষ্ঠী ৬০০ থেকে ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, নির্মিত হয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দির, সবগুলিই বিহার, বাস করেন সেই সব বিহারে বাড়তি শ্রমণ।

সব শেষে, ৬২৫ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, নির্মাণ শুরু হয় আরও দুইটি বিহারের, নির্মিত হয় একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে, বিপরীত দিকে, সপ্তবিংশতি আর অষ্টাবিংশতি গুহামন্দির—পঞ্চম ও শেষ গোষ্ঠী অজন্তার।

মহা প্রবল হন কাঞ্চীর রাজা পল্লব শ্রেষ্ঠ প্রথম নরসিংহ বর্মণ দক্ষিণ ভারতে পরাজিত ও নিহত হন তাঁর হাতে চালুক্য শ্রেষ্ঠ পুলকেশী, শ্রেষ্ঠ রাজা দাক্ষিণাত্যেরও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ভারতের। রুদ্ধ হয় তাঁর বিজয় অভিযান। হিন্দু নরসিংহ বর্মণ, বৌদ্ধ বিদ্বেষী, তাই সম্ভব হয় না বৌদ্ধ স্থপতির মন্দির নির্মাণ অজন্তায়, নরসিংহ বর্মণের ভীতিতে। তাঁরা পলায়ন করেন, পরিত্যাগ করে যান বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তা সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে, পরিসমাপ্তি হয় না সপ্তবিংশতি আর অষ্টাবিংশতি গুহামন্দিরের নির্মাণ, থেকে যায় অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায়, পায় না সম্পূর্ণ রূপ, লাভ করে না পূর্ণ পরিণতি।

পুণ্যভূমি অজন্তা, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন ভারতের বৌদ্ধ-তীর্থের মধ্যে, পায় বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারেও।

অলঙ্কৃত করেন শতাধিক অনুপম ফ্রেস্কো চিত্রাবলী দিয়ে, ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীতে, মহা অভিজ্ঞ মহাযান বৌদ্ধ চিত্রশিল্পী একে একে অজন্তার ষোড়শ, সপ্তদশ, প্রথম আর দ্বিতীয় গুহামন্দিরের সম্মুখ ভাগ, প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গও। রচিত হয় চিত্রে জাতকের কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর, হয় কত পৌরাণিক কাহিনীও। অঙ্কিত হয় দৃশ্য কত রাজপ্রাসাদের, কত রাজসভার, কত রাজনর্তকীর। দৃশ্য অঙ্কিত হয় কত প্রান্তরের, কত বন আর উপবনেরও। বিচরণ করে সেই সব বনে কত পশু, কত পক্ষী, কত হিংস্র জন্তুও।

তাঁরা নারীকেই করেন মধ্যমণি, কোথাও তারা বিবসনা, নাই তাদের অঙ্গে কোন বসন। অঙ্কিত করেন শিল্পী তার প্রতিটি অঙ্গের সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম গঠন, তার বক্ষের প্রতিটি স্পন্দন, তার নয়নের প্রতিটি ভাষা, তার বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশবিন্যাসও। কোথাও তারা স্বল্পবসনা, কোথাও বা

অর্ধবসনা, ফুটে ওঠে স্বল্পবাসের ভিতর দিয়ে তাদের অপরূপ, অনবদ্য, লীলায়িত গঠনসৌষ্ঠব। দেখা যায় তাদের অঙ্গের ভূষণও, হয় নারী মহিমময়ী—মহামহিম হয় অজন্তার চিত্রও তাদের সাহায্যে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্রশিল্পের দরবারেও, হয় বিশ্বজিৎ। অমর হয় অজন্তা—গৌরব বাড়ে ভারতের।

অজন্তার প্রথম পর্যায়ের প্রথম তিনটি গুহামন্দির—একাদশ, সপ্তম, আর ষষ্ঠ—বুকে নিয়ে আছে হীনযান থেকে মহাযানে পরিবর্তনের প্রতীক, নিদর্শন তাঁদের বিহার নির্মাণের অভিজ্ঞতা অর্জনেরও। বৃহত্তম তাদের মধ্যে ষষ্ঠ গুহামন্দির, নির্মিত হয় সবার শেষেও। খুব সম্ভব এইটিই প্রাচীনতম দ্বিতল বৌদ্ধবিহার। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, নাই এই বৈশিষ্ট্য অজন্তার অন্য কোন গুহামন্দিরে।

ক্রমে অর্জিত হয় অভিজ্ঞতা, নির্মিত হয় একের পর এক অজন্তার বিহার, বুকে নিয়ে সুন্দরতম, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, অনবদ্য সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারও, শ্রেষ্ঠদান মহাযান বৌদ্ধস্থপতির আর ভাস্করের। বিভিন্ন প্রতিটি পরিকল্পনায়, বিভিন্ন নির্মাণ কুশলতায়, বিভিন্ন স্থপতির হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে। সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতম তাদের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, ষোড়শ, সপ্তদশ, একবিংশতি আর ত্রয়োবিংশতি বিহার, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বৌদ্ধস্থপতির, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এক মহা গৌরবময় যুগের। সর্বশ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে ষোড়শ গুহামন্দির, (বিহার) খুব সম্ভব ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। সমপর্যায়ে পড়ে এই বিহারটি প্রথম বিহারের, পরিকল্পনায়, নির্মাণকুশলতায় আর পরিধিতে। বুকে নিয়ে আছে এই দুইটি বিহারই, পঁয়ষট্টি ফুট চৌরস সভাগৃহ, তার সামনে একটি পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ অলিন্দ। বুকে নিয়ে আছে অলিন্দটি অপরূপ স্তম্ভ। রচিত হয় অনবদ্য সুন্দরতম কুড়িটি স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে বিহারের সভাগৃহের চারিদিকের গলিপথও।

রচিত হয় ষোড়শ গুহামন্দিরের অলিন্দের আর সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রে ষোলটি চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ, সভাগৃহের অন্তরতম প্রদেশে একটি গর্ভগৃহ, বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে। অনবদ্য, সুন্দরতম জীবন্ত এই মূর্তিটি। অনুপম, শোভন গঠন, স্তম্ভগুলিও, অলঙ্কৃত তাদের অঙ্গ আর

শীর্ষদেশ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধস্তম্ভ ভারতের তারা। নিরুপম অলিন্দের আর সম্মুখভাগের শিল্পসম্ভার। সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতম তার সম্মুখভাগের, প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্রসম্ভারও। তাই লাভ করে এই বিহারটি শ্রেষ্ঠত্বে আসন জগৎসভায়। বুকে নিয়ে আছে বিহারটি প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সৃষ্টির, নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, ভাস্করের আর চিত্রশিল্পীর চরম উৎকর্ষের, তাদের পূর্ণ পরিণতির।

সুন্দরতম আর মহামহিমময় কিন্তু অজন্তার মহাযান চৈত্য, মহামহিমময় পরিকল্পনায়, প্রকৃষ্টতম নির্মাণকৌশলে, অনবদ্য রূপদানে, অতিক্রম করে তারা অজন্তার বিহারদের, করে পরিকল্পনার মহিময়ত্বে, সুন্দরতম রূপদানে, করে মনের মাধুরীতে আর হৃদয়ের ঐশ্বর্যেও।

নির্মাণ করেন অজন্তার মহাযান বৌদ্ধস্থপতি শুধু দুইটি চৈত্য উনবিংশতি আর ষড়বিংশতি গুহামন্দির। জ্যেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে উনবিংশতি গুহামন্দির, ক্ষুদ্রতরও, আটত্রিশ ফুট তার বহিরঙ্গের উচ্চতা, প্রস্থে বত্রিশ ফুট, অভ্যন্তর ভাগের পরিধির দৈর্ঘ্য ছেচল্লিশ ফুট, প্রস্থ চব্বিশ ফুট, অনুরূপ অজন্তার হীনযান চৈত্যের (দশম গুহামন্দিরের) পরিধির।

ছিল এই চৈত্যের সামনে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রাঙ্গণ, তার দুই পাশে দুইটি উপাসনা মন্দির, চৈত্যের শোভাবর্ধক। রচিত হয় এই চৈত্যের সম্মুখভাগে একটি মাত্র প্রবেশপথ, তার সামনে একটি অনবদ্য, সুন্দরতম, রমণীয় স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রে, কুলুঙ্গির ভিতর, কারুকার্য-মণ্ডিত চন্দ্রাতপের নীচে অপরূপ বুদ্ধমূর্তি। অলঙ্কৃত সুন্দরতম বুদ্ধমূর্তি দিয়ে গবাক্ষের দুই পাশও। রচিত হয় বুদ্ধমূর্তি স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গেও। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিভিন্ন দাঁড়াবার ভঙ্গীও, মহিমময়। সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ দান তারা বৌদ্ধ ভাস্করের, তাদের অমরকীর্তি। নির্মিত হয় স্তম্ভযুক্ত বৃহৎ আচ্ছাদন অলিন্দের ছাদের উপর, এইখানেই থাকতো ধর্মযাজকদের মঞ্চ তার পিছনে মহামহিমময় চৈত্য গবাক্ষ। এক অপরূপ সমন্বয় হয় চৈত্যের— সম্মুখভাগের সঙ্গে, সামনের স্তম্ভযুক্ত অলিন্দের সঙ্গে আর চৈত্য গবাক্ষের সঙ্গে।

পনরটি ঘনসন্নিবিষ্ট এগার ফুট উঁচু অনবদ্য স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয়

মন্দিরের সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলকে চারিপাশের গলিপথ থেকে। দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশপথের দুই পাশেও দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ। অনুপম, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম বিভিন্ন আর বিচিত্র শিল্পসম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত তাদের দণ্ড, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভ গদি (কুশান) আর বিশাল বন্ধনী, শোভিত বন্ধনীর অঙ্গ অনুপম, রমনীয়, মূর্তিসম্ভার দিয়ে, মূর্তি বুদ্ধের, মূর্তি বোধিসত্ত্বদেরও—পদ্মপাণি আর বজ্রপাণির। রচিত হয় বন্ধনীর শীর্ষদেশে আর কানিসের নীচে পাঁচ ফুট প্রস্থ অপরূপ পাড় (ফ্রিজ)। বিভক্ত সেই পাড় অসংখ্য কপাটে (প্যানেলে)। রচিত হয় কুলুঙ্গি প্যানেলের অঙ্গে, খোদিত হয় বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বদের মূর্তি, কুলুঙ্গির ভিতরে, অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপের নীচে, মূর্তি কত উড়ন্ত দেবতার আর দেবীর, মূর্তি কত বিশিষ্ট জন্তুপৃষ্ঠে আরোহিত দেবদেবীরও। অপরূপ এই মূর্তিগুলিও, জীবন্ত, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভাস্কর্যের। পাড়ের উপর নির্মিত হয় অর্ধ-গোলাকৃতি, খিলানযুক্ত মহিমময় ছাদ, ছাদের অঙ্গে, পাহাড় কেটে শিরাকৃতি, অর্ধচন্দ্রাকার ঘনসন্নিবিষ্ট বরগা। যেমন মহিমময় পরিকল্পনা, তেমনই সুন্দরতম নিখুঁত রূপদান।

এই সুন্দরতম, অলোকসুন্দর পটভূমিকাতে, নির্মাণ করেন মহা অভিজ্ঞ বৌদ্ধ ভাস্কর একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে, সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে, মঞ্চের উপর বাইশ ফুট উঁচু মহামহিমময় স্তূপ—আরাধ্য দেবতা মন্দিরের। স্পর্শ করে স্তূপের শীর্ষদেশ মন্দিরের ছাদ। রচিত হয় মঞ্চের দুই দিকে, সোপানশ্রেণীর পাশে, দুইটি সুবিশাল মূর্তি, মৃত স্তূপের অভিভাবকের। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই মূর্তি দুইটি, কিন্তু পরিচায়ক তারা এক মহামহিমময় পরিকল্পনার। অর্ধ-গোলাকার এই স্তূপটি, রচিত হয় তার শীর্ষদেশ গম্বুজের আকারে, শীর্ষদেশে সুউচ্চ হারমিকা, তার উপরে তিনটি ছত্র, ছত্রের উপরে একটি পাত্র, মিশে আছে পাত্রটি ছাদের সঙ্গে, অদৃশ্য হ'য়ে আছে তার অন্ধকার, তমসাবৃত, রহস্যময় অঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছেন একটি মহামহিমময় বুদ্ধ, স্তূপের সম্মুখভাগে, দু পাশের অনবদ্য স্তম্ভ দিয়ে অলঙ্কৃত কুলুঙ্গির ভিতরে, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে শোভিত চন্দ্রাতপের নীচে। অপরূপ, মহামহিমময় এই মূর্তিটি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অজন্তার বৌদ্ধ ভাস্করের, অমর কীর্তি এক মহা-গৌরবময় যুগের।

অতিবাহিত হয় অর্ধ শতাব্দী, নির্মাণ করেন বৌদ্ধ মহাযান স্থপতি দ্বিতীয়

চৈত্য অজন্তায়, নির্মিত হয় ষষ্ঠ বিংশতি গুহামন্দির, বুকে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার আর অনবদ্য জীবন্ত মূর্তিসম্ভার। বৃহত্তর এই চৈত্যটি, আয়তন তার আটষট্টি ফুট দীর্ঘ, ছত্রিশ ফুট প্রস্থ আর একত্রিশ ফুট উচ্চ। রচিত হয় এই চৈত্যের প্রবেশপথে, দুইটি নিখুঁত, সুষ্ঠু গঠন বার ফুট উঁচু স্তম্ভ। শোভিত হয় সুন্দরতম ছাব্বিশটি বার ফুট উঁচু, ঘন সন্নিবিষ্ট স্তম্ভ দিয়ে, চৈত্যের ভিতরের গর্ভগৃহ, পৃথকীকৃত হয় গলিপথ আর কেন্দ্রস্থল। অনুরূপ এই স্তম্ভগুলিও উনবিংশ গুহামন্দিরের স্তম্ভের, গঠনে, অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারের আর মূর্তিসম্ভারের মহিমময়ত্বে। কিন্তু বিস্তৃততর এই চৈত্যের বন্ধনীর অঙ্গের মূর্তিসম্ভার, সুন্দরতর প্যানেলের অঙ্গের অলঙ্করণ, বিস্তৃততর কার্নিসের নীচের মূর্তি দিয়ে তৈরী পাড়ের মূর্তিসম্ভারও। সুন্দরতর আর মহত্তর স্তূপের গঠনও। মহা সমৃদ্ধিশালী হয় মহাযান চৈত্য স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে।

সম্পূর্ণ বর্জিত হয় কাঠের কাজ, চৈত্যের নির্মাণে, পরিত্যক্ত হয় অনুকরণ পদ্ধতিও গুহামন্দির নির্মাণে। সুন্দরের লীলা নিকেতন অজন্তা, প্রকৃতির নন্দনকানন, সুন্দরের পূজারী অজন্তার মহাযান স্থপতি, ভাস্কর, আর তার চিত্র শিল্পীও, মহা-অভিজ্ঞ প্রস্তরের কাজেও, রচনা করেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, নির্মাণ করেন শৈলমালার অঙ্গ কেটে চৈত্য আর বিহার, বুকে নিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সাজান তাদের সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়ে, শোভিত করেন অনুপম চিত্রসম্ভার দিয়েও, ঢেলে দেন মনের অপরিসীম মাধুর্য, উজাড় করে দেন হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্য, পূর্ণ পরিণতি লাভ করে মহাযান স্তম্ভ, চৈত্য আর বিহার, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ-সভায়; হয় বিশ্বজিৎ।

নির্মিত হয় প্রায় একই সময়ে বৌদ্ধ গুহামন্দির—চৈত্য আর বিহার, নির্মাণ করেন মহাযান স্থপতি আর ভাস্কর এলোরাতে, অজন্তা থেকে ষাট মাইল দূরে, ৪৫০ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁদের অনুগমন করেন হিন্দু আর জৈন স্থপতি আর ভাস্কর, নির্মিত হয় হিন্দু আর জৈন গুহামন্দিরও এলোরাতে।

বুকে নিয়ে আছে এলোরার বৌদ্ধ গুহা মন্দির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তাই বিভিন্ন তাদের পরিকল্পনা, বিভিন্ন গঠনপদ্ধতি, সমপর্যায়ে পড়ে না তারা অজন্তার মহাযান বৌদ্ধ গুহামন্দিরের। বিভিন্ন এলোরার পশ্চিম ঘাটের আকৃতিও, ঋজু নয় তার বুক, উচ্চ নয় তার চূড়াও, অজন্তার শৈলমালার মত। দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার বক্ষ ভেদ করে, দাঁড়িয়ে আছে এলোরার অনুচ্চ শৈলমালা, নির্মিত হয় তার অঙ্গে বারটি বৌদ্ধ গুহামন্দির, চৈত্য আর বিহার, দক্ষিণ প্রান্তে, মহাযান স্থপতি নির্মাণ করেন। বিভক্ত এই মন্দির নির্মাণও দুইটি পর্যায়ে। প্রথম থেকে পঞ্চম গুহামন্দির প্রথম পর্যায়ে নির্মিত হয়, পরিচিত দেড়বাড়া গোষ্ঠী নামে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ গুহামন্দির পড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

অনুরূপ প্রথম পর্যায়ের বিহারগুলি, অজন্তার বিহারের পরিকল্পনায়। রচিত হয় একটি অলিন্দ। অলিন্দ থেকে প্রবেশপথ দিয়ে কেন্দ্রস্থলের সভাগৃহে প্রবেশ করতে হয়। সভাগৃহের প্রান্তদেশে মন্দিরের গর্ভগৃহে। বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে দেবতা বুদ্ধ, আরাধ্য দেবতা মন্দিরের, মহামহিমময় মূর্তিতে। প্রকৃষ্টতম তাদের মধ্যে দ্বিতীয় গুহামন্দির। রচিত হয় এই বিহারে একটি আটচল্লিশ ফুট চতুষ্কোণ সভাগৃহ, শোভিত বারটি সুবিশাল স্তম্ভ দিয়ে। পৃথক করা হয় এই স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে বিহারের কেন্দ্রস্থলকে চারিদিকের গলিপথ থেকে। চারিদিকের প্রকোষ্ঠের পরিবর্তে, নির্মিত হয় চারিটি করে স্তম্ভের সারি দিয়ে দুই পাশে দুইটি মঞ্চ (গ্যালারি)। খোদিত হয় প্রকোষ্ঠ সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রে, সুবিশাল, মহিমময় মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয় সেই সব প্রকোষ্ঠ, মূর্তি বুদ্ধের, মূর্তি বোধিসত্ত্বদেরও—বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের।

এইখানে এসেই পরিবর্তিত হয় স্তম্ভের গঠনের প্রকৃতি, আকৃতি তার শীর্ষদেশেরও। লাভ করে পাহাড় কাটা স্তম্ভের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রচিত হয় ভারী স্তম্ভ, চতুষ্কোণ, মসৃণ, "প্রিসমের" আকার তার নিম্নার্ধ, উল্লম্ব, বৃত্তাকার তার উর্ধ্বার্ধ, বাঁশিতে পর্যবসিত হয়। স্তম্ভের শীর্ষদেশে শোভা পায় সঙ্কুচিত গদি, পরিচিত কুষাণ শীর্ষস্তম্ভ নামে, অন্যতম সুন্দরতম স্তম্ভ বৌদ্ধস্থপতির।

ব্যতিক্রম শুধু পঞ্চম গুহামন্দির—মহানবাড়া—ব্যতিক্রম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যে, নির্মাণ কুশলতার মহিমময়ত্বে। তুলনাহীন "মহানবাড়া", প্রতীক সে

শুধু তার নিজের। বৃহত্তমও, একশত সতের ফুট গভীর এই মন্দিরের সভাগৃহ, প্রস্থে সাড়ে আটান্ন ফুট। সভাগৃহের দুই পাশে দুইটি বৃহৎ নিভৃত বাস রচিত হয়। রচিত হয় সভাগৃহের ভিতরে দুই সারিতে চব্বিশটি অনবদ্য "কুশাণশীর্ষ" স্তম্ভ, তৈরী হয় কেন্দ্রস্থলের দুই পাশে দুইটি গলিপথ। বেষ্টিত করা হয় সভা-গৃহকে তেইশটি প্রকোষ্ঠ দিয়ে, যুক্ত হয় প্রকোষ্ঠগুলি প্রবেশপথ দিয়ে সভাগৃহের সঙ্গে। প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি তির্যক অলিন্দ রচিত হয়। তার পিছনে, একটি চতুষ্কোণ গর্ভগৃহে সিংহাসনে উপবিষ্ট এক মহামহিমময় বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে অনুচরবর্গ। তৈরী হয় কেন্দ্রস্থলে দুইটি নীচু, অপ্রশস্ত, সমান্তরাল মঞ্চ। বিস্তৃত হয় মঞ্চ কেন্দ্রস্থলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। অনুরূপ এই মঞ্চ দুইটি কানেরির দরবারগৃহ "মহারাজার" মঞ্চের। নাই এই মঞ্চ অন্য কোন গুহামন্দিরের সভাগৃহে। মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে, সভাগৃহে, বিরাজ করেন মন্দিরের আরাধ্য দেবতা—বুদ্ধ, তাঁর সামনে, অলিন্দে, উচ্চাসনে উপবেশন করে, বৌদ্ধ পুরোহিত, ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেন, শোনান ধর্মের বাণী। মঞ্চের উপর মুখোমুখি হয়ে বসে, সেই বাণী বৌদ্ধ শ্রমণেরা শ্রবণ করেন।

বৃহত্তর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাতটি গুহামন্দিরই, বৃহত্তম তাদের মধ্যে দ্বাদশ গুহামন্দির—"তিন তল", সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতমও। আছে এই গুহামন্দিরে তিনটি তলা, অনেকগুলি প্রকোষ্ঠও আছে, বাস করতেন সেই সব প্রকোষ্ঠে চল্লিশ জন বৌদ্ধ শ্রমণ। মিলন হত এই মন্দিরের সুপ্রস্থ সভাগৃহে বহুশত শ্রমণের, পরিণত হত বৌদ্ধ সম্মেলনে এই মন্দিরটি।

রচিত হয় একটি সিংহদ্বার, প্রবেশপথ এই বিহারের সম্মুখের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের। প্রাঙ্গণের প্রত্যন্ত দেশে, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের সম্মুখভাগ, রচিত তিনটি স্তরে। নির্মিত হয় প্রতিটি তলায়, মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি করে অলিন্দ। দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি অলিন্দ আটটি চতুষ্কোণ উত্তরণ মঞ্চের উপর। নাই কোন অলঙ্করণ বিহারের সম্মুখ ভাগে, সমৃদ্ধিশালী নয় ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে। অপরূপ, সুন্দরতম মূর্তির সম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত বিহারের অন্তরতম প্রদেশ—তার সর্বাঙ্গ। বিভিন্ন প্রতিটি তলার নির্মাণপদ্ধতি, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, বিভিন্ন মূর্তিসম্ভারও। একটি একশত বার

ফুট প্রস্থ ও তেতাল্লিশ ফুট গভীর স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ অতিক্রম করে, বিহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। অলিন্দের সমকোণে রচিত হয় একটি পঁয়ত্রিশ ফুট প্রস্থ ও চুয়াল্লিশ ফুট গভীর সুপ্রশস্ত স্তম্ভযুক্ত কক্ষ। তিনটি করে স্তম্ভের সারি দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত এই কক্ষটি, কক্ষের প্রত্যন্তপ্রদেশে গর্ভগৃহ। উপবিষ্ট সেই গর্ভগৃহে মন্দিরের আরাধ্য দেবতা বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে। অলঙ্কৃত মহিমময় বুদ্ধমূর্তি দিয়ে প্রাচীরের গাত্রও, অনবদ্য এই মূর্তিগুলি, সুন্দরতম। সভাগৃহের দক্ষিণে, প্রকোষ্ঠের ভিতরে, দ্বিতলে উঠবার সোপানের শ্রেণী।

রচিত হয় দ্বিতলে একটি একশত বার ফুট প্রস্থ, বাহাত্তর ফুট গভীর আর সাড়ে এগার ফুট উঁচু সভাগৃহ। দাঁড়িয়ে আছে এই সভাগৃহটি চল্লিশটি অনবদ্য, শোভন গঠন স্তম্ভের উপর, বিভক্ত হয়ে আছে এক এক সারিতে আটটি স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে পাঁচটি তির্যক গলিপথে। রচিত হয় সভাগৃহের প্রান্তদেশেও দুইটি স্তম্ভ দিয়ে একটি তোরণ, পরিধি তার প্রস্থে ত্রিশ, গভীরতায় সতের ফুট। তোরণের পিছনে গর্ভগৃহ, বসে আছেন সেই গর্ভগৃহে দেবতা বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে। মহিমময় বুদ্ধ মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয় সভাগৃহের প্রাচীরের সর্বাঙ্গ, অলঙ্কৃত করা হয় তোরণের অঙ্গও।

সভাগৃহের দুই পাশে, তিনতলায় যাওয়ার দুইটি সিঁড়ি রচিত হয়। তিনতলার সম্মুখ ভাগে একটি আটটি সুষ্ঠু গঠন, সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। অলিন্দের পশ্চাতে একটি ক্রুশের আকার আয়ত ক্ষেত্র, আটাত্তর ফুট গভীর ছত্রিশ ফুট প্রস্থ সভাগৃহ, দুইভাগে বিভক্ত তার কেন্দ্রস্থলটি, পাঁচটি করে স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। দুই স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে তির্যক ভাগে বিভক্ত দুই পাশের গলিপথও। নির্মিত হয় গলিপথে আঠারটি প্রকোষ্ঠ, সভাগৃহের প্রত্যন্ত প্রদেশে কুড়ি ফুট প্রস্থ, মন্দিরের গর্ভগৃহ, বিরাজ করেন একটি উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তি সেই গর্ভগৃহে, মহামহিমময় মূর্তিতে। অলঙ্কৃত প্রাচীরের সর্বগাত্র ও মহিমময় বুদ্ধ মূর্তি দিয়ে।

ত্রিতল একাদশ গুহামন্দিরও, আবিষ্কৃত হয় এই বিহারের প্রথম তলটি, লুকিয়ে ছিল মাটির স্তূপের অন্তরালে, কিছুদিন আগে, তাই পরিচিত এই মন্দিরটি "দুতলা" নামে। অনুরূপ "তিনতলার" পরিকল্পনায় আর নির্মাণ

পদ্ধতিতে, নিম্নতর এই বিহারের সভাগৃহের ছাদ। নাই কোন প্রকোষ্ঠও শ্রমণদের বাসের জন্য।

সুন্দরতম ষষ্ঠ গুহামন্দিরও, রচিত হয় তির্যক পদ্ধতিতে, অনুরূপ "তিন-তলা"র তৃতীয় তলের। কিন্তু নাই এই বিহারে স্তম্ভের শ্রেণী, দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভবিহীন হয়ে।

বুকে নিয়ে আছে "তিনতলাই" এলোরার মহাযান বৌদ্ধ স্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাঁদের মহামহিমময়, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম সৃষ্টি। নির্ভুল, অনবদ্য তার পরিকল্পনা, নিখুঁত ত্রুটীহীন রূপদান। এক মহামহিমময় সুন্দরতম কীর্তি, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময়, যুগের। তাই এইখানেই মহাযান বিহার লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, হয় বিশ্বজিৎ।

শ্রেষ্ঠতম আর সুন্দরতম কিন্তু, এলোরার মহাযান বৌদ্ধ স্থপতির নির্মিত দশম গুহামন্দির, একটি চৈত্য পরিচিত বিশ্বকর্মা নামে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, তাঁরই নামে উৎসৃষ্ট এই মন্দিরটি, আসেন এখানে শিল্পী, আসেন স্থপতি, ভাস্করও আসেন, উপনীত হন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, আসেন সুদূর বিদেশ থেকেও, নিবেদন করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে, দেন ডালি উজাড় করে। সমসাময়িক অজন্তার মহাযান চৈত্যের, কিন্তু বৃহত্তর আয়তনে এই চৈত্যটি, দৈর্ঘ্যে পঁচাশি ফুট, প্রস্থে চুয়াল্লিশ আর উচ্চতায় চৌত্রিশ ফুট তার অভ্যন্তর ভাগ, বুকে নিয়ে আছে আটাশটি অনবদ্য, সুন্দরতম "পাত্র ও পল্লবে"র প্রতীক স্তম্ভ, অন্যতম সুন্দরতম ও প্রকৃষ্টতম স্তম্ভ বৌদ্ধ স্থপতির, বিভক্ত হ'য়ে আছে কেন্দ্রস্থলে আর গলিপথে। খোদিত তার প্রাচীরের সর্বাঙ্গেও মহামহিমময় বুদ্ধ মূর্তি, অনবদ্য সুন্দরতম এই মূর্তিগুলিও, অঙ্গে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রতীক এক অমর কীর্তির, সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের।

অপরূপ এই চৈত্যের স্তূপও, পরিচায়ক মহা অগ্রগতির। রচিত হয় এক সুন্দরতম, অর্ধবৃত্তাকার স্মৃতির আধার শীর্ষে নিয়ে হারমিকা। তার সম্মুখভাগে, সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপের নীচে, সিংহাসনে উপবিষ্ট এক মহামহিমময় বুদ্ধ, বিলম্বিত তাঁর পদদ্বয়। তাঁর দুই পাশে দুই গন্ধর্ব দাঁড়িয়ে আছেন।

দাঁড়িয়ে আছে চৈত্যটি একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের ভিতরে, নির্মিত হয় তার চারিদিকে, স্তম্ভযুক্ত অনবদ্য সুন্দরতম তোরণ। নাই এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন মহাযান বৌদ্ধ চৈত্যে। প্রাঙ্গণের প্রত্যন্ত প্রদেশে দাঁড়িয়ে আছে চৈত্যের সম্মুখভাগ, এক মহা মহিমময় মূর্তিতে। অভিনব এই সম্মুখ ভাগের পরিকল্পনা, বিভিন্নও, অনুরূপ নয় অন্য বৌদ্ধ চৈত্যের সম্মুখ ভাগের। বর্জিত হয় যুগ যুগান্তরের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ চৈত্য গবাক্ষ, হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবেশ পথও, বৌদ্ধ চৈত্যের শ্রেষ্ঠ আর অপরিহার্য অঙ্গ, রচিত হয় চৈত্য গবাক্ষের পরিবর্তে একটি ক্ষুদ্রতর বৃত্ত, তার নীচে একটি অপরূপ তীর্ধক তোরণ। দাঁড়িয়ে আছে তোরণটি দুইটি অনবদ্য, শোভন গঠন, সুন্দরতম শিল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ, স্তম্ভের উপর। শেষ বৌদ্ধ চৈত্য বিশ্বকর্মা, ব্যতিক্রম অন্য বৌদ্ধ চৈত্যের, অঙ্গে নিয়ে আছে অমঙ্গলের প্রতীক।

আছে ঔরঙ্গাবাদ শহর থেকে এক মাইল উত্তরে, একফালি উঁচু ও ঋজু পাহাড়ের সানুদেশেও তিনটি গুহামন্দিরের সমষ্টি। প্রথমটিতে আছে চারিটি বিহার ও একটি চৈত্য, দ্বিতীয়টিতে চারিটি বিহার, তৃতীয়টিতে শুধু তিনটি বৈশিষ্ট্যহীন গুহামন্দির, নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্প সম্ভার, কোন অলঙ্করণ নাই।

বুকে নিয়ে আছে চৈত্যটি, (চতুর্থ গুহামন্দির) একটি স্তূপ। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের স্তূপের এই স্তূপটি, নির্মিত হয় চৈত্যের অর্ধ-গোলাকৃতি শিরাযুক্ত ছাদও। তাই মনে হয় নির্মাণ করেন এই চৈত্যটি হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে। অন্য বিহারগুলি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। খুব সম্ভব এইগুলিই সর্বশেষ দান বৌদ্ধস্থপতির, তাই বুকে নিয়ে আছে এই বিহারগুলি বৌদ্ধ থেকে হিন্দুস্থাপত্যে পরিবর্তনের নিদর্শন, প্রতীক এক মহান যুগ-সন্ধিক্ষণের।

সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতম ঔরঙ্গাবাদের তৃতীয় ও সপ্তম গুহামন্দির, বিহার, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শেষ বৌদ্ধস্থপতির, নিদর্শন বৌদ্ধ ভাস্করের চরম ও শেষ পরিণতিরও। এইখানেই, তৃতীয় ও সপ্তম গুহামন্দিরেই, লাভ করে বৌদ্ধ ভাস্কর্য শ্রেষ্ঠত্বের আসন, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। চরম উন্নতি লাভ করে বৌদ্ধস্তম্ভও, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম

গুহামন্দিরে। রচিত হয় ক্ষুদ্র মূর্তি, হয় স্তম্ভের দণ্ডে আর শীর্ষদেশে, ক্ষুদ্র মূর্তি দিয়েই নির্মিত হয় স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীও। অনুরূপ বাদামীর সুন্দরতম স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর, শোভাপায় ক্ষুদ্র মূর্তির সম্ভার বন্ধনীর অঙ্গে, রচিত হয় এক মহাসৌন্দর্যের প্রস্রবণ।

রচিত হয় বৃহৎ, সুবিশাল, মহামহিমময় মূর্তিও, মূর্তি বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের, মূর্তি কত হিন্দু দেবতা আর দেবীরও, বিভিন্ন তাদের ভঙ্গী, বিচিত্র তাদের অঙ্গের বসন আর ভূষণ। মহামহিমময় মূর্তি দিয়ে শোভিত হয় মন্দিরের প্রাচীরের সর্বাঙ্গও। অনবদ্য, সুষ্ঠুগঠন জীবন্ত এই মূর্তির সম্ভার, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ মহাযান বৌদ্ধ ভাস্কর্যের।

অপরূপ, সুন্দরতম, অনবদ্য তাদের মধ্যে তৃতীয় গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের মূর্তির সম্ভার। সিংহাসনে উপবিষ্ট এক অতিকায় বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্তিতে। তাঁর সামনে জানুগতিতে মুখোমুখি হয়ে আছেন দুই দল প্রমাণ আকৃতির পূজারী, আছেন তাদের মধ্যে সুন্দর দর্শন নর, পরমা রূপবতী নারীও আছেন। সজ্জিত তাঁরা বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে। তাঁদের শিরে শোভা পায় মূল্যবান শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার হার, মণিবন্ধে জড়োয়ার কঙ্কণ। নিযুক্ত তাঁরা গর্ভগৃহে বিরাজিত, মন্দিরের আরাধ্য দেবতা, ভগবান বুদ্ধের পূজায়, শ্রদ্ধাবনত তাঁদের মস্তক, ভক্তিপ্রণত তাঁদের আনন, প্রতিফলিত হয় তাঁদের অন্তর্নিহিত প্রগাঢ় আর অপরিসীম ভক্তি, তাঁদের অন্তরের ভাষা তাঁদের চোখে মুখে, উদ্ভাসিত হয় তাঁদের আনন, প্রদীপ্ত হয় তাঁদের নয়ন, বিকশিত হয় তাঁদের সর্বাঙ্গ। অপরূপ, সুন্দরতম, মহামহিমময়, জীবন্ত এই মূর্তিগুলি, প্রাণময় মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, বাঙ্ময় তাঁর হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে আর অন্তরের সীমাহীন মাধুর্যে। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মূর্তির সম্ভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্যের, প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির এক মহাগৌরবময় যুগের, লাভ করেও সর্বশ্রেষ্ঠ আসন বিশ্বের ভাস্করের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ।

নির্মিত হয় খুব সম্ভব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই, গুপ্তযুগে, মালবে, বাঘ শহর থেকে তিন মাইল দূরে, পুণ্যতোয়া নর্মদার উপনদী বাঘের বাম তীরে, প্রকৃতির এক রমণীয় পরিবেশে, এক লীলানিকেতনে, পবিত্র আত্মা বিন্ধ্য শৈলমালার

অঙ্গ কেটে নয়টি গুহামন্দির, পরিচিত বাঘ গুহামন্দির নামে। বৌদ্ধ মহাযান স্থপতি নির্মাণ করেন। দেখা যায় বাঘ শহরের দুই মাইল দূরে, বাঘ নদীর পাড়েও কয়েকটি গুহামন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

বিন্ধ্যর অঙ্গের নয়টি গুহামন্দিরের মধ্যে প্রথমটিই প্রাচীনতম গুহামন্দির বাঘের। তারপর, একে একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুহামন্দির নির্মিত হয়। সমসাময়িক তারা অজন্তার দ্বাদশ গুহামন্দিরের। শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম গুহা-গুহামন্দির বাঘের, চতুর্থ গুহামন্দির, পরিচিত "রঙমহল" নামে। অজন্তার চতুর্থ গুহামন্দিরের সমসাময়িক এই গুহামন্দিরটি। অলঙ্কৃত করেন চিত্রশিল্পী তার প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ অনবদ্য, সুন্দরতম, মহামহিমময় চিত্র-সম্ভার দিয়ে। তাই সমপর্যায়ে পড়ে এই গুহামন্দিরটি অজন্তার ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহামন্দিরের, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও চিত্রশিল্পের দরবারে। নাই এমন চিত্রসম্ভার ভারতের অন্য কোন গুহামন্দিরে। সমসাময়িক পঞ্চম আর ষষ্ঠ গুহামন্দির, নির্মিত হয় সবার শেষেও।

পরবর্তী যুগ ঃ

বিস্তৃত এই যুগ ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পতন হয় গুপ্ত সম্রাটদের মগধে, প্রতিযোগিতা হয় হর্ষবর্ধনে, শশাঙ্কে আর যশোবর্মণে, উত্তর ভারতে সার্বভৌম রাজ্যপ্রতিষ্ঠা নিয়ে। মহাপরাক্রমশালী হন, দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্র-দেশে, বাতাপির চালুক্যরা। উদ্ভূত তাঁরা অযোধ্যার ক্ষত্রিয় রাজবংশ থেকে, বসতি স্থাপন করেন দাক্ষিণাত্যে।

প্রথম পুলকেশী স্থাপন করেন এই রাজত্ব ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে, বাতাপিতে, বর্তমান বাদামীতে স্থাপিত হয় রাজধানী। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় পুলকেশী, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন চালুক্য সিংহাসন ৬০৯ থেকে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাড়ে রাজ্যের সীমানা, বর্ধিত হয় চালুক্য প্রতিপত্তিও, উত্তর কানাড়ায়, কোঙ্কণে, মহীশূরে আর মালবে। প্রবল পরাক্রান্ত তার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্যও, অধিকার করেন কাঞ্চী, পরাজিত হন তাঁর কাছে চোল, কেরল আর পাণ্ড্য নৃপতি। হন তিনি সার্বভৌম সম্রাট দক্ষিণ ভারতের। পরাক্রমশালী দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যও, তিনি অধিরোহণ

করেন চালুক্য সিংহাসনে ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজত্ব করেন চালুক্য নৃপতিরা প্রবল প্রতাপে। শেষে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ চালুক্য রাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ, রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গের হাতে পরাজিত হন।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও, নির্মিত হয় শৈ.মালার অঙ্গ কেটে গুহামন্দির রাজধানী বাদামীতে। রচিত হয় প্রস্তর দিয়ে তৈরী মন্দিরও, রাজধানী বাদামীতে, আইহোলে আর পট্টদকলে। অজন্তা আর এলোরাতেও গুহামন্দির নির্মিত হয়, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যেরও।

মহাপরাক্রমশালী হন রাষ্ট্রকূট রাজারাও। কেউ বলেন, মহাভারতের যদুবংশের বংশধর তাঁরা, কেউ বলেন প্রাচীন রাষ্ট্রিকদের। কারও মতে তাঁরা তেলেগু কৃষিজীবী। রাজধানী স্থাপন করেন তাঁরা মান্যকেটে, রাজত্ব করেন প্রবল পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, দীর্ঘ দুই শত বৎসর। প্রবল পরাক্রান্ত দন্তিদুর্গের ভ্রাতা, প্রথম কৃষ্ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রকূট সিংহাসন ৭৬৮ থেকে ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাড়ে রাজ্যের সীমা, বিস্তৃত হয় মহীশূর পর্যন্ত। তিনিই নির্মাণ করেন এলোরাতে "কৈলাস"—শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতের। মহাশক্তিশালী ধ্রুব নিরুপম, তৃতীয় গোবিন্দ, প্রথম অমোঘ বর্ষ আর তৃতীয় ইন্দ্র, অলঙ্কৃত করেন তাঁরা রাষ্ট্রকূট সিংহাসন ৭৭৯ থেকে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাড়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমানা, বর্ধিত হয় তাঁদের প্রতিপত্তিও দাক্ষিণাত্যে। ক্রমে হীনবল হন রাষ্ট্রকূট নৃপতিরা। শেষে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, পরাজিত হন দ্বিতীয় কক্ক, শেষ নৃপতি এই বংশের, চালুক্য তৈলপের হাতে। আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য রাজ্য দাক্ষিণাত্যে, ফিরে পায় চালুক্য তাদের লুপ্ত গৌরব। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা রাষ্ট্রকূটরাও, গড়ে ওঠে কত হিন্দু মন্দির দাক্ষিণাত্যে, নির্মিত হয় গুহামন্দিরও এলোরাতে আর এলিফ্যাণ্টাতে। বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ দান স্থপতির আর ভাস্করের। নিবদ্ধ থাকে এই পরবর্তী বা শেষ যুগের গুহামন্দির নির্মাণও, দাক্ষিণাত্যে, এলোরাতে, বোম্বাইয়ের নিকটের এলিফ্যাণ্টা ও সালসেটি দ্বীপে। নির্মাণ করেন কয়েকটি গুহামন্দির, দক্ষিণ ভারতের, দ্রাবিড়স্থানে, পল্লব রাজারাও, রাজত্ব করেন তাঁরা কাঞ্চীপুরমে প্রবল প্রতাপে, অন্ধ্র সাতবাহনের পতনের পর। পূর্বাভাষ এই গুহামন্দিরগুলি দ্রাবিড়স্থানের

মন্দির নির্মাণের, বীজ এক মহামহিম, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম স্থাপত্যের, পরিচিত বিশ্বজয়ী দ্রাবিড়-স্থাপত্য নামে, স্বপ্ন এক ভবিষ্যৎ মহামহিমময় আর সুন্দরতম রূপ-পরিগ্রহের এক বিশ্বজয়ের।

পরিসমাপ্তি হয় মহাযান বৌদ্ধ গুহামন্দির নির্মাণ, শুরু হয় হিন্দু গুহামন্দির নির্মাণ এলোরাতে। নির্মিত হয় শৈলমালার পশ্চিম অঙ্গে একে একে, সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে ত্রয়োদশ থেকে উনত্রিংশৎ গুহামন্দির। যদিও নির্মিত এই মন্দিরগুলি বৌদ্ধ গুহামন্দিরের অনুকরণে, কিন্তু বিভিন্ন এই মন্দিরগুলি, বিভিন্ন পরিকল্পনায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেও। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে 'রাবণ কা কাই'—লঙ্কাধীপ রাবণের গৃহ (চতুর্দশ), দশাবতার (পঞ্চদশ), "শিবের স্বর্গ কৈলাস" (ষোড়শ), 'রামেশ্বর' (একবিংশতি) আর "ডুমার লেনা" (উনত্রিংশৎ) পরিচিত সীতার নাহানি নামেও।

প্রথমে একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ ও তার সংলগ্ন একটি গর্ভগৃহ নির্মিত হয়। ক্রমে রচিত হয় গর্ভগৃহের চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ। রচিত হয় গর্ভগৃহ ক্রুশাকৃতি সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে, বেষ্টিত হয় চতুর্দিকের প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে। একাধিক প্রবেশ পথও থাকে, অনুরূপ এলিফ্যাণ্টার আর যোগেশ্বরীর মন্দিরের। সবার শেষে, একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে, নির্মিত হয় একটি মহা-সমৃদ্ধিশালী, মহামহিমময় মন্দির, অনুরূপ পাথর দিয়ে তৈরী মন্দিরের, পরিকল্পনার মহানত্বে আর নির্মাণ পদ্ধতির বিস্তৃতিতে, নির্মিত হয় স্বর্গপুরী কৈলাস—শিবের স্বর্গ—সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতের, শ্রেষ্ঠ দান ভারতের মহা অভিজ্ঞ স্থপতির আর সুনিপুণ ভাস্করের, দান তার মহাপারদর্শী চিত্র শিল্পীরও।

বৃহত্তম আর সুন্দরতম, প্রথম শ্রেণীর দশাবতার, দ্বিতলও, নির্মিত অষ্টম শতাব্দীতে, একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের একেবারে প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের দ্বিতল সম্মুখ ভাগ, সামনে নিয়ে অপরূপ চন্দ্রাতপ, চন্দ্রাতপ একতলায়, আছে দ্বিতলেও। দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রাতপ চারিটি করে, অনবদ্য, সুন্দরতম চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর। একটি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে, উপনীত হতে হয় মন্দিরের সুপ্রশস্ত সভাগৃহে, পরিধি তার সাতানব্বই ফুট প্রস্থ, পঞ্চাশ ফুট গভীর। শোভিত হয়ে আছে কক্ষটি চুয়াল্লিশটি অনবদ্য চতুষ্কোণ স্তম্ভ দিয়ে। বামে দ্বিতলে উঠবার সোপানের শ্রেণী রচিত হয়। নির্মিত হয় দ্বিতলেও একটি একশ পঁচিশ

ফুট দীর্ঘ, পঁচানব্বই ফুট প্রস্থ আয়ত ক্ষেত্র, সুন্দরতম আর মহিমময় সভাগৃহ, বুকে নিয়ে অনবদ্য সুন্দরতম চুয়াল্লিশটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ। বিভক্ত হয়ে আছে স্তম্ভগুলি চার সারিতে। নির্মিত হয় সভাগৃহের প্রান্ত দেশেও দুইটি স্তম্ভ। স্তম্ভ দিয়ে রচিত হয় মন্দিরের গর্ভগৃহের তোরণ। বিরাজ করেন একটি শিব লিঙ্গ সেই গর্ভগৃহে। দু পাশে উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে রচিত হয় বৃহৎ গভীর কুলুঙ্গি, সভাগৃহের প্রাচীরের সর্বাঙ্গে দূরত্বের সমতা বজায় রেখে। রচিত হয় কুলুঙ্গির ভিতর মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার; মূর্তি শিবের বিভিন্ন রূপের, মূর্তি বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারেরও। মূর্তি দিয়েই রচিত হয় কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতেরও, প্রাচীরের গাত্রে। পরিণত হয় সভাগৃহ এক বিশাল মহামহিমময় রঙ্গ মঞ্চে।

অপরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর সুন্দরতম গুহামন্দির, রামেশ্বরের মূর্তি-সম্ভারও, মহামহিমময়, জীবন্ত, পর্যাপ্তও, বিস্তৃত হয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে অলিন্দের প্রবেশ পথ। শোভা পায় অলিন্দে কুশান-শীর্ষ স্তম্ভ। রচিত হয় স্তম্ভ গাত্রও পল্লবের প্রতীক বুকে নিয়ে অলিন্দের বুকে, স্তম্ভের বন্ধনীর অঙ্গে অপরূপ লাস্যময়ী নারী মূর্তি—বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের। অলঙ্কৃত অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রও অনবদ্য সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত মূর্তি সম্ভার দিয়ে। নির্মিত হয় এই মন্দিরটিও সপ্তম শতাব্দীতে।

মহিমময় তৃতীয় শ্রেণীর ডুমার লেনাও, নির্মিত হয় সপ্তম শতাব্দীতে। নাই অন্য কোন মন্দির এলোরাতে বুকে নিয়ে ডুমার লেনার পরিকল্পনা তাই এই বৈশিষ্ট্য ডুমার লেনার। পরে নির্মিত হয় গুহামন্দির এলিফ্যাণ্টাতে, আর বোম্বাইয়ে, যোগেশ্বরীতে, অঙ্গে নিয়ে ডুমার লেনার পরিকল্পনা। রচিত হয় এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দিরে তিনটি দ্বার, প্রবেশ পথ মন্দিরে আলোর, একটি কেন্দ্রস্থলে ও দুইটি দুই প্রান্তে।

বৃহত্তম এলোরার গুহামন্দিরের মধ্যে, সুন্দরতমও, বুকে নিয়ে আছে ডুমার লেনা তিনটি মহিমময়, অনবদ্য স্তম্ভযুক্ত, সুপ্রশস্ত প্রবেশ দ্বার। রচিত হয় প্রবেশ দ্বারের সংলগ্ন সোপানের শ্রেণী, তার দুই পাশে দণ্ডায়মান দুইটি জীবন্ত সিংহ, বিস্তৃত তাদের দক্ষিণ পদ। সোপান শ্রেণীর শীর্ষদেশে, বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন পনর ফুট উঁচু, এক দেবতা, মহামহিমময় মূর্তিতে। রচিত হয় পনর ফুট

উঁচু আর পাঁচ ফুট প্রস্থ সুবিশাল কুশান-শীর্ষ স্তম্ভের শ্রেণী, অন্তর্হিত হয় স্তম্ভের শ্রেণী মন্দিরের ভিতরের আলো ছায়ায়, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে এক মহা রহস্যময় পরিবেশে। মহামহিমময় এই পরিকল্পনা, অনবদ্য রূপদান, অতুলনীয় দান হিন্দু স্থপতির নাই এমন সুন্দরতম প্রবেশ পথ ভারতের অন্য গুহামন্দিরে।

মহামহিমময় ডুমার লেনার অভ্যন্তরভাগের পরিকল্পনাও। রচিত হয় একটি মহিমময়, সুপ্রশস্ত গর্ভগৃহ, বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গর্ভগৃহের চারিদিকে, চারিটি দ্বার, দাঁড়িয়ে আছেন প্রতিটি দ্বারের সম্মুখে, সোপানশ্রেণীর শীর্ষদেশে, এক একটি অতিকায় দেবতা, মহামহিমময় মূর্তিতে, একটি অতিকায় দেবীও আছেন। প্রহরী তাঁরা গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত দেবতার। বেষ্টিত হয়ে আছে গর্ভগৃহ একটি স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ দিয়েও, সংযুক্ত হয়ে আছে একটি একশত পঞ্চাশ ফুট গভীর মঞ্চ (গ্যালারি দিয়ে) মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথের সঙ্গে। বিভক্ত হয়ে আছে মঞ্চ স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে গলিপথে আর কেন্দ্রস্থলে। সভাগৃহের পিছনেও রচিত হয় স্তম্ভযুক্ত প্রাঙ্গণ, সংযুক্ত হয় প্রাঙ্গণ সভাগৃহের সঙ্গে। আছে এই প্রাঙ্গণেও দুইটি প্রবেশদ্বার।

সবশেষের শ্রেণীতে আছে "কৈলাস"—শিবের স্বর্গ, পৃথিবীর অমরাবতী, স্বর্গপুরী বিশ্বের, অমর কীর্তি ভারতের ভাস্করের, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভারতের স্থপতির, দাঁড়িয়ে আছে অদ্বিতীয় হয়ে। নাই এমন মহামহিমময় সুন্দরতম গুহামন্দির ভারতের অন্য কোন স্থানে, সারা বিশ্বেও নাই। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে, ৭৫৭ থেকে ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাষ্ট্রকূট শ্রেষ্ঠ প্রথম কৃষ্ণ নির্মাণ করেন।

বর্ধিত হয় পূর্বেকার শৈলমালার অঙ্গ কেটে, পাহাড়ের অন্তরতম প্রদেশে গুহামন্দির নির্মাণপদ্ধতি, নির্মিত হয় এক পূর্ণাঙ্গ মন্দির, চালুক্য স্থপতির রচিত ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মন্দির পট্টদকলের "বিরূপাক্ষের" অনুকরণে, একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত পাহাড় কেটে এক অসম্ভব, দুঃসাধ্য, কল্পনাতীত প্রচেষ্টা ভারতের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির। নির্মাণ করেন রাষ্ট্রকূট স্থপতি; তাঁদের রাজার অর্থে ও প্রেরণায় নির্মিত হয়। কিন্তু বৃহত্তর এই মন্দিরটি আয়তনে বিরূপাক্ষের দ্বিগুণেরও বেশী, বুকে নিয়ে আছে দ্রাবিড় স্থাপত্যের শেষ পরিণতি, চরম উৎকর্ষ, অঙ্গে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম দান, এক সুমহান অমর কীর্তি

দ্রাবিড় ভাস্করেরও। রূপপরিগ্রহ করে নাই অন্য কোন ভারতীয় স্থপতির এমন সুমহান প্রচেষ্টা, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় নাই এমন অনবদ্য, অনুপম, সূক্ষ্মতম রূপদানেও। তাই অদ্বিতীয়, তুলনাহীন "কৈলাস", লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের, আসন জগৎসভায়, হয় বিশ্বজিৎ।

চারিটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত হয়ে আছে কৈলাস—মূলমন্দির, প্রবেশপথ, নন্দীমণ্ডপ আর প্রাঙ্গণের চতুর্দিকের প্রকোষ্ঠ বা মঠ।

মহামহিমময় মূলমন্দির, দাঁড়িয়ে আছে পঁচিশ ফুট উঁচু ভিত্তির উপর, বিস্তৃত হয়ে আছে একশত পঞ্চাশ ফুট গভীর ও একশত ফুট প্রস্থ সামন্তরিক পরিধি নিয়ে। পৃষ্ঠে নিয়ে আছে ভিত্তিটিকে বৃহৎ, সুষ্ঠুগঠন, জীবন্ত হস্তীযূথ, আর সিংহের সারি, যুক্ত হয়ে আছে সোপানের শ্রেণী দিয়ে ভিত্তির আর প্রাঙ্গণের সঙ্গে। মন্দিরের পশ্চিম গায়ে, একটি অপরূপ স্তম্ভযুক্ত তোরণ রচিত হয়, হয় মণ্ডপ আর বিমানও। এইখানেই কৈলাসের স্থপতি, রেখে যান স্থাপত্যজ্ঞানের সুষ্ঠু ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়, রচনা করেন কত অনুপম কার্ণিশ, কত সুন্দরতম উদ্গাত স্তম্ভ, কত অনবদ্য, মহিমময়, জীবন্ত মূর্তি সম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত বৃহৎ কুলুঙ্গি আর কত সুষ্ঠুগঠন, সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। করেন তাদের অপরূপ সমন্বয়। রচিত হয় পঁচানব্বই ফুট উঁচু মন্দিরের সুমহান শিখর বা শিখারাও, বিভক্ত তিনটি স্তরে, অঙ্গে নিয়ে অঙ্গ শিখর। দাঁড়িয়ে আছে শিখর, ঊর্ধ্বে তুলে তার উন্নত শির। বিমানের সম্মুখদেশে, মঞ্চের উপর, পর্বতের অঙ্গ কেটে, নির্মিত হয় পাঁচটি পিরামিড-শীর্ষ ক্ষুদ্র মন্দিরও। বিরাজ করেন সেই সব মন্দিরে অপ্রধান দেবতা, সঙ্গী তাঁরা মূল মন্দিরের বিগ্রহের, মন্দিরের আরাধ্য দেবতার। অপরূপ, সুন্দরতম, এই ক্ষুদ্র মন্দিরগুলিও, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, সহায়ক তারা মূল মন্দিরের শোভাবর্ধনেরও। রচিত হয় ভিতরেও একটি স্তম্ভযুক্ত মহিমময় মণ্ডপ, দৈর্ঘ্যে সত্তর আর বাষট্টি ফুট। মণ্ডপের প্রান্তদেশে একটি অপরূপ তোরণ, অঙ্গে নিয়ে আছে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। তোরণের সংলগ্ন গর্ভগৃহ। বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে মন্দিরের আরাধ্য দেবতা—বিগ্রহ মূল মন্দিরের।

রচিত হয় কুড়ি ফুট চৌরস পঞ্চাশ ফুট উঁচু মঞ্চ, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। সেই মঞ্চে দেবতার বাহন নন্দী (বৃষ) বিরাজ

'করেন। নির্মিত হয় নন্দী মণ্ডপের দুই পাশে দুইটি অপরূপ, শোভন গঠন-ধ্বজ স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার আর ত্রিশূল, দেবতার প্রতীক। নির্মিত হয় দ্বিতল সুউচ্চ প্রবেশপথও, সিংহদ্বার মন্দিরের, প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের শ্রেণী, রচিত স্তম্ভের সারি দিয়ে। নির্মিত হয় উত্তরের প্রাচীরের সংলগ্ন লঙ্কেশ্বর, একটি স্তম্ভযুক্ত, সুপ্রশস্ত সভাগৃহ।

মহামহিমময় কৈলাস, অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত করেন স্থপতি তার সর্বাঙ্গ, বৃহৎ, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়ে রচনা করেন ভাস্কর তার সর্বাঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতেরও, পরিণত হয় কৈলাস এক বিরাট ধর্মগ্রন্থে, পরিচায়ক তাঁদের অপরিসীম ধর্মজ্ঞানের, তাঁদের সীমাহীন আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও। রচিত হয় এক স্বর্গপুরী, ইন্দ্রলোক, নির্মিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতের।

বাদ যান না জৈনরাও, তাঁরাও শুরু করেন গুহামন্দির নির্মাণ এলোরাতে নবম শতাব্দীতে। নির্মাণ করেন একে একে পাঁচটি গুহামন্দির ত্রিংশৎ থেকে চতুস্ত্রিংশৎ নবম আর দশম শতাব্দীতে। নির্মিত হয় ছোট কৈলাস সম্পূর্ণ পাহাড়ের অঙ্গ কেটে কৈলাসের অনুকরণে, ক্ষুদ্র সংস্করণ কৈলাসের। রচিত হয় ইন্দ্রসভা আর জগন্নাথ সভাও।

বৃহত্তম আর সুন্দরতম ইন্দ্রসভা, আদি জৈন গুহামন্দিরও এলোরার, তার নির্মাণ শুরু হয় ৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে! রচিত হয় একটি প্রবেশপথ, সিংহদ্বার, শৈলমালার অঙ্গ কেটে। উপনীত হতে হয় সেই প্রবেশপথ দিয়ে একটি পঞ্চাশ ফুট পাশ প্রাঙ্গণে। তার কেন্দ্রস্থলে, একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে, একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হয়, দ্রাবিড়স্থানের মন্দিরের অনুকরণে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, পূর্বাভাষ মূল মন্দিরের। মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসনে উপবিষ্ট চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর, মহাবীর। তার এক দিকে একটি সুবিশাল ত্রিশ ফুট উঁচু ধ্বজস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, উন্নত করে শির, অন্য দিকে একটি অতিকায় জীবন্ত হস্তী। বিভিন্ন আর বিচিত্র অসংখ্য বৃহৎ মূর্তির সম্ভার দিয়ে শোভিত প্রাঙ্গণের তিন দিকও।

অসংখ্য, বৃহৎ, অনবদ্য মূর্তির সম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত মূল মন্দিরের দ্বিতলের সম্মুখ ভাগও। দ্বিতলে, প্রাচীরের গাত্রে, বৃহৎ কুলুঙ্গির ভিতর, মন্দিরে

বিরাজ করেন, মহাবীর, পার্শ্বনাথ, গোমতেশ্বর, মাতঙ্গা আর সিদ্ধাইকি। মাতঙ্গা একটি হস্তীর পৃষ্ঠে বসে আছেন, সিদ্ধাইকি সিংহবাহনে, অপরূপ তার কেশবিন্যাস। মহামহিমময়, সুন্দরতম এই মূর্তিগুলি। একতলে, উদ্গত স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে পর্যায়ক্রমে হস্তী আর সিংহ। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি চল্লিশ ফুট স্কোয়ার, চতুষ্কোণ স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ নির্মিত হয়, তার সামনে একটি গভীর স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, সভাগৃহের প্রান্তদেশে, একটি স্তম্ভযুক্ত তোরণের সংলগ্ন মন্দিরের গর্ভগৃহ। বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে মন্দিরের আরাধ্য দেবতা মহাবীর, মহামহিমময় মূর্তিতে। চতুষ্কোণ এই সব স্তম্ভের দণ্ড, নাই তাদের অঙ্গে কোন অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী নয় কোন শিল্পসম্ভার দিয়ে স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গও।

একটি সোপানের শ্রেণী দিয়ে দ্বিতলে উপনীত হতে হয়। রচিত হয় দ্বিতলের কেন্দ্রস্থলে, পঞ্চাশ ফুট স্কোয়ার মন্দিরের প্রধান সভাগৃহ, তার দুই প্রান্তে, দুইটি ধর্ম মন্দির, সামনে একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। সভাগৃহের তিন দিকে তিনটি সুন্দরতম ব্যালকনিও রচিত হয়, পরিদৃশ্যমান সেখান থেকে মন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বারটি অনুপম, সুন্দরতম স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহ। সভাগৃহের কেন্দ্র স্থলে রচিত হয় একটি বেদী, সেই বেদীর উপর চতুর্মুখ বিরাজ করতেন। বেদীর শীর্ষদেশে, ছাদের অঙ্গে খোদিত একটি বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম। সভা গৃহের প্রান্তদেশে, গর্ভগৃহে, মহাবীরের মহামহিমময় মূর্তি। অঙ্গে নিয়ে আছে গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বারও অনুপম, সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণে।

অনুরূপ, কেন্দ্রস্থলের সভাগৃহের দুই প্রান্তের ধর্ম মন্দির দুইটিও, অনুরূপ পরিকল্পনায় আর শিল্প-সম্ভারে, বুকে নিয়ে আছে একটি স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ, সঙ্গে নিয়ে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ আর তিন দিকে ব্যালকনি। রচনা করেন ভাস্কর দ্বিতলে, প্রাচীরের সর্বাঙ্গে, দুই পাশে উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে তৈরী, বৃহৎ গভীর, কুলুঙ্গির ভিতর মূর্তির সম্ভার, মূর্তি মহাবীরের, মূর্তি জৈন তীর্থঙ্করদের, মূর্তি গোমতেশ্বরেরও। অপরূপ, শোভন গঠন স্তম্ভগুলিও, সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত, সুসামঞ্জস্যও, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, তাই সুন্দরতম এই স্তম্ভগুলি এলোরার মন্দিরের স্তম্ভের মধ্যে, পায় সম্পূর্ণ

রূপও। অনুরূপ পরিকল্পনায় আর নির্মাণ পদ্ধতিতে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ জৈন গুহা মন্দির, জগন্নাথ সভাও। কিন্তু নাই তাতে ইন্দ্রসভার মাহাত্ম্য, সমৃদ্ধিশালী নয় ইন্দ্রসভার মতও, তাই পড়ে না সমপর্যায়েও। নির্মিত হয় নীচের তলায় তিনটি পৃথক ধর্মমন্দির, সামনে নিয়ে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ক্ষুদ্রতর এই ধর্ম-মন্দিরগুলি, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের মধ্যে বৃহত্তম ধর্মমন্দিরটি বুকে নিয়ে আছেএকটি ছাব্বিশ ফুট পাশ স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ। আছে তাদের সামনেও একটি করে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। সভাগৃহের প্রান্তদেশে, গর্ভগৃহ, সেই গর্ভগৃহে মহাবীর বিরাজ করেন।

বৃহত্তর কিন্তু দ্বিতল, রচিত হয় ইন্দ্রসভার অনুকরণে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর ইন্দ্রসভার তুলনায়, বিস্তৃত হয়ে আছে তার প্রধান সভাগৃহটি সাতান্ন ফুট গভীর আর চল্লিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, শোভিত হয়ে আছে বারটি স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। রচিত হয় গর্ভগৃহ সভাগৃহের প্রান্তদেশে। তার প্রাচীরের গাত্রে, খোদিত হয় কত মহামহিমময় মূর্তি, মূর্তি জৈন তীর্থঙ্করদের।

একটি ধর্মমন্দিরও নির্মিত হয়, যুক্ত হয় প্রধান সভাগৃহের সঙ্গে একটি প্রকোষ্ঠ দিয়ে। অনুরূপ এই ধর্মমন্দিরটি, নীচের তলার ধর্মমন্দিরের, অনুরূপ অঙ্গের শিল্পসম্ভারে আর মূর্তিসম্ভারে, সম্পূর্ণও। অনবদ্য, সুন্দরতম, জীবন্ত তার প্রাচীরের গাত্রের মূর্তিসম্ভার, মহিমময়। অনুপম, সুষ্ঠুগঠন, নিখুঁত তার স্তম্ভের শ্রেণীও। কুশান-শীর্ষ এই স্তম্ভগুলি, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জৈনশিল্পীর সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, মনের অন্তহীন মাধুরীতে আর হৃদয়ের সীমাহীন ঐশ্বর্যে, হয় বিশ্বজিৎ।

শেষ হয় এলোরায় জৈনদের গুহামন্দির নির্মাণ দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে, পরিসমাপ্তি হয় ভারতে গুহামন্দির নির্মাণও। অবসান হয় সহস্র বৎসরের ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গের, এক অসাধ্য সাধনার, এক বহু বিস্তৃত সুদূর প্রসারী মহাদুঃসাহসী অবদানের, পরিসমাপ্তি হয় এক মহাগৌরবময় যুগের। গড়ে ওঠে পাথর দিয়ে তৈরী মন্দির ভারতের দিকে দিকে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের নিদর্শন, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার আর জীবন্ত অনবদ্য মূর্তিসম্ভার।

সমাপ্ত

যে যে পুস্তক থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের ও তাদের রচয়িতার নাম

	রচয়িতার নাম	পুস্তকের নাম
১।	Fergusson, J.	History of Indian & Eastern Architecture, Vol. I & II.
২।	Percy Brown	Indian Architecture, Vol. I.
৩।	Kramrisch, Stella	The Art of India, Through the Ages.
৪।	Fergusson, J. & Burgess, Dr. J.	Cave Temples of India.
৫।	Gangoly, M.	Orissa & Her Remains Ancient & Medieval.
৬।	Mittra, Rajendra Lala	Antiquities of Orissa.
৭।	Coomarswamy, A. K.	Hist. of Indian & Indonesian Art.
৮।	Burgess, Dr. J.	A Guide to Elura Cave Temples.
৯।	Archaeological Dept. Hyderabad Government.	A Guide to Ajanta Frescoes.
১০।	Ramchandran, T. N. & Jain Chhotelal	Khandagiri & Udaygiri Caves.
১১।	Marshall, Sir John, Vogel, Dr. J. Ph, Havell, E.B.	The Bagh Cave Temples in the Gwalior state.
১২।	Majumdar R. C.; Raychaudhuri H. C. & Dutta Kali Kinkar	An Advanced Hist. of India.
১৩।	Smith, V. A.	A History of Fine Art in Ind.
১৪।	স্কন্দপুরাণ	উৎকল খণ্ড

মন্দিরময় ভারত (প্রথম ভাগ)

বহু প্রশংসিত ও আকাশবাণী কলিকাতা কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী প্রণীত ও এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, কর্তৃক প্রকাশিত মন্দিরময় ভারত, (১ম ভাগ) সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

দৈনিক বসুমতী : 'মন্দিরময় ভারত' নামটি বড় মনোরম হৃদয়স্পর্শী। সত্যই ভারত মন্দিরময় এবং দেবস্থানে আকীর্ণ। স্থাপত্যশিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন হিসাবে ভ্রমণকারীর সাধারণ কৌতূহল নিরসন ও আনন্দ উপভোগে, ভক্তের ভক্তিভাবের চরিতার্থতায়, ভারতের সর্বত্র যে মন্দিরগুলি বিস্তীর্ণ হয়ে আছে, তা আমাদের বিশিষ্ট শিল্প, সভ্যতা ও ঐতিহ্যেরই প্রকাশ। আলোচিত গ্রন্থের গ্রন্থকার ভ্রাম্যমাণ হিসাবে ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন এবং এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছেন ভারতের মন্দিরগুলি। এই খণ্ডে তিনি অন্ধ্র, দ্রাবিড়স্থান, চালুক্যভূমি ও মহীশূরের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির বর্ণনা প্রদান করেছেন। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীরের মন্দিরগুলিও আছে এর মধ্যে। স্থাপত্য হিসাবে তিনি এগুলিকে ভাগ করেছেন বিভিন্ন অংশে, যথা—অন্ধ্র, দ্রাবিড়, চালুক্য, হোয়সল ও কাশ্মীর স্থাপত্যে। এই বিভিন্ন স্থানীয় মন্দিরগুলির পরিচয় সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ স্থাপত্য ধারার ইতিহাস, জনসাধারণের জীবনধারা প্রণালী, রীতিনীতি ও প্রাকৃতিক পরিচয়ের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম অধ্যায় অন্ধ্র দেশের মধ্যে সীমাচলমের মন্দির, সর্পভয়মের মন্দির। দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্রাবিড়স্থানের মধ্যে কাপালির মন্দির, পার্থসারথির মন্দির, একাম্বরনাথের মন্দির প্রভৃতি। তৃতীয় অধ্যায়, চালুক্যভূমের মধ্যে আছে নববৃন্দাবন, চামুণ্ডার মন্দির, কেদারেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি। এবং শেষ চতুর্থ অধ্যায়ে কারকোটা ও উৎপল রাষ্ট্রের মধ্যে রঘুনাথজী, ক্ষীরভবানী, শঙ্করাচার্য, অবন্তীশ্বর, মার্তণ্ড, কুন্তী, সুগন্ধেশা প্রভৃতিদের মন্দির। সর্বসমেত আর্ট কাগজে ১৪ খানি হাফটোন চিত্রের দ্বারা কতকগুলি বিশিষ্ট মন্দিরকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই চিত্রগুলি পর্যাপ্ত বলে মনে হয় নি। আরও কতকগুলি চিত্র এরূপ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। লেখকের বর্ণনা ভঙ্গী সুন্দর এবং ভাষা প্রাঞ্জল। বহিরাবরণ আকর্ষণীয় চিত্রশোভিত।

যুগান্তর : আধ্যাত্মিকতার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—এর পথে-প্রান্তরে, মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে ধর্মভাব। ভারতে মন্দিরের সংখ্যা তাই অগণ্য। এর মধ্যে সবগুলির পরিচয় দেওয়া অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'মন্দিরময় ভারতে' লেখক এই দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। লেখক চারিটি অধ্যায়ে ভারতের চারটি স্থানের বিশিষ্ট মন্দিরগুলির পরিচয় এতে দিয়েছেন। এ প্রচেষ্টার পিছনে লেখকের একাগ্রতা এবং গবেষণাসুলভ পরিশ্রমের পরিচয় মেলে। কেবলমাত্র মন্দিরগুলির পরিচয় বা সৌন্দর্য বর্ণনাই নয়, লেখক সেই সঙ্গে মন্দিরগুলির সঙ্গে জড়িত পৌরাণিক ইতিহাস এবং সেগুলির স্থাপনকালীন দেশের রাজা ও রাজত্বের আভ্যন্তরীণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরিচয়, তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণের আভাষ এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করেছেন। সেদিক দিয়ে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান হয়েছে। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর ও সহজ, মন্দির প্রভৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা সহজেই মন স্পর্শ করে। এছাড়া পরিব্রাজকের পথ চলার ধারাবাহিক পথে মন্দিরগুলির বিবরণ দেওয়ায় লেখকের সঙ্গে পাঠকও পথে পথে মন্দির পরিদর্শনের আনন্দটুকু উপভোগ করতে পারে। বইয়ে কয়েকটি মন্দিরের আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। ছবিগুলি মন্দির সৌন্দর্যের মর্মগ্রাহী নিদর্শন। বইখানি শেষ করবার পর বর্ণিত মন্দিরগুলির চাক্ষুষ পরিচয় লাভের আগ্রহ পাঠক মনে জাগে, সে হিসাবে লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক। বইটির বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

আনন্দবাজার পত্রিকা : রূপময় ভারতের বহুবিধ রূপ আছে। তন্মধ্যে ধর্মাচরণের মাধ্যমে ভারতের মানুষ তাহার শিল্পমনের পরিচয় দিবার জন্য উত্তুঙ্গ হিমালয়ের কোণ হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার সাগরের বুকেও নানা মন্দির দেউল গড়িয়া তুলিয়াছে, বহু শতাব্দী ধরিয়া। লেখক বর্তমান গ্রন্থে অন্ধ্র, দ্রাবিড়স্থান, চালুক্যভূমি, মহীশূর ও কাশ্মীরের মন্দিরগুলির বিবরণ ও উহাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে দিয়া পুস্তকটি সকলেরই ভাল লাগিবে। পুস্তকের প্রচ্ছদপটও ভাল।

প্রবাসী : (রায়বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র) মন্দিরময় ভারত পড়িয়া আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার লেখক শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী এম. এ.।

প্রত্যেকটি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া এবং নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া যে অপূর্ব গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন তাহা পরম আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়াই এই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি 'মন্দিরময় ভারতে'র বহুল প্রচার কামনা করি।

দেশ : (সাহিত্য সংখ্যা)—২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫ :—"গত এক বছরে বাংলা ভাষায় যে সব উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হ'য়েছে, নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল। প্রতি বছরে বাংলা ভাষায় নতুন যে সব বই প্রকাশিত হয় তার থেকে অনুমোদনযোগ্য বইগুলি নির্বাচিত করে দেওয়ার কাজটি যে অতি দুরূহ তা আশা করি সকলেই উপলব্ধি করেন।...

বাংলাদেশে সাহিত্য পাঠকের অভাব নেই, প্রকাশিত গ্রন্থও সংখ্যায় অনেক। সুতরাং বৈশিষ্ট্য, গুণ এবং গুরুত্ব অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরী করে, পাঠক সাধারণের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন রয়েছে, প্রতি বছরই। সুতরাং এই বিশেষ সংখ্যাটিতে এক বছরের উল্লেখযোগ্য বইয়ের একটি তালিকা প্রকাশিত হ'ল। পাঠক-সাধারণ এবং সাধারণ পাঠাগারগুলির যদি তাতে কিছুমাত্র উপকার হয়।"
—সম্পাদক দেশ .

ভ্রমণ

মন্দিরময় ভারত—শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স।

●

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ শ্রীগোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত ও ডি. এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত "ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে" নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'নাসিক' সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত :

মোটামুটি দুই শ্রেণীতে রচনাগুলিকে ভাগ করা যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর রচনা ইতিহাস-বিখ্যাত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পীঠভূমি সম্বন্ধীয়, এবং স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস ও তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধীয় রম্যকাহিনীগুলিকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের লেখার মধ্যে অধ্যাপক অজিত ঘোষের দেবভূমি খাজুরাহো, হরিচন্দন মুখোপাধ্যায়ের 'নালন্দা মহাবিহার' বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষের 'নিজাম সাহীর দেশে' এবং শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ীর 'গুহামন্দির নাসিক' উল্লেখযোগ্য। নাসিক-চৈত্যের বিবরণটিতে ঐতিহাসিক পটভূমির যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, তাতে রচনাটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান হয়েছে।